Quintus Septimius Florens Tertullianus

De Præscriptione Hæreticorum (ভ্রান্তমতপন্থীদের খারিজ-নির্দেশ)

De Baptismo - De Pœnitentia - De Oratione

(বাপ্তিস্ম প্রসঙ্গ - অনুতাপ প্রসঙ্গ - প্রার্থনা প্রসঙ্গ)

লাতিন পাঠ্য : ভ্রান্তমতপন্থীদের খারিজ-নির্দেশ, বাপ্তিস্ম প্রসঙ্গ, অনুতাপ প্রসঙ্গ, প্রার্থনা প্রসঙ্গ

Translation : Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2023

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ

AsramSoftware - Donations

Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition : May 31, 2022

Version 1.0.7 (June 14, 2023)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক'রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন।

তের্তুল্লিয়ানুস

ভ্রান্তমতপন্থীদের খারিজ-নির্দেশ

বাপ্তিস্ম প্রসঙ্গ

অনুতাপ প্রসঙ্গ

প্রার্থনা প্রসঙ্গ

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

ভূমিকা

তের্তুল্লিয়ানুসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

লেখক হিসাবে তের্তুল্লিয়ানুস

তের্তুল্লিয়ানুসের লেখায় বাইবেল উদ্ধৃতি

ভ্রান্তমতপন্থীদের খারিজ-নির্দেশ

বাপ্তিস্ম প্রসঙ্গ

অনুতাপ প্রসঙ্গ

প্রার্থনা প্রসঙ্গ

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)
যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)
লেবীয় (লেবীয় পুস্তক)
দ্বিঃবিঃ (দ্বিতীয় বিবরণ)
১ শামু (শামুয়েল ১ম পুস্তক)
২ শামু (শামুয়ের ২য় পুস্তক)
১ রাজা (রাজাবলি ১ম পুস্তক)
২ রাজা (রাজাবলি ২য় পুস্তক)
সাম (সামসঙ্গীত-মালা)
প্রবচন (প্রবচনমালা)
প্রজ্ঞা (প্রজ্ঞা পুস্তক)
সিরা (বেন-সিরা)
উপ (উপদেশক)
ইশা (ইশাইয়া)
যেরে (যেরেমিয়া)
এজে (এজেকিয়েল)
দা (দানিয়েল)
হো (হোশেয়া)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)
মার্ক (মার্ক-রচিত সুসমাচার)
লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)
যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)
প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)
রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)

১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)
২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)
গা (গালাতীয়দের কাছে পলের পত্র)
এফে (এফেসীয়দের কাছে পলের পত্র)
কল (কলসীয়দের কাছে পলের পত্র)
১ তি (তিমথির কাছে পলের ১ম পত্র)
২ তি (তিমথির কাছে পলের ২য় পত্র)
তীত (তীতের কাছে পলের পত্র)
হিব্রু (হিব্রুদের কাছে পত্র)
১ পি (পিতরের ১ম পত্র)
১ যোহন (যোহনের ১ম পত্র)
প্রকাশ (ঐশপ্রকাশ পুস্তক)

ভূমিকা

তের্তুল্লিয়ানুসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

কুইন্তুস সেপ্তিমিউস ফ্লোরেন্স তের্তুল্লিয়ানুস রোম-সাম্রাজ্যের নুমিদিয়া প্রদেশের, (বর্তমানকালীন তুনিসিয়া দেশের) কার্থাগো শহরে, আনুমানিক ১৫৫ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টিয়ান নয় এমন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

কথিত আছে, তিনি একজন শতপতির সন্তান, কার্থাগোতে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন; যৌবনকালে রোমে গিয়ে আইনবিদ্যা অধ্যয়ন করে আইনজীবী হিসাবে পেশা গ্রহণ করেন, যে পর্যন্ত, সম্ভবত ১৯৭ অথবা ১৯৮ সালে হঠাৎ করে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন ও স্বদেশে, সেই আফ্রিকায়, ফিরে যান; অন্য কেউ বলে, দেশে ফিরে গিয়েই তিনি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন।

চরিত্রগত দিক থেকে তিনি ছিলেন অধিক সৃজনশীল, আবেগপ্রবণ ও তর্কযুক্তি প্রিয়। তাঁর নিজের লেখা থেকে জানা যায়, তাঁর স্ত্রী ছিলেন খ্রিষ্টিয়ান, কিন্তু তিনি যে কোন্ সালে বিবাহ করেন, তা অজানা বিষয়।

কেউ না কেউ বলে, তিনি পৌরোহিত্ব সেবাকর্মে যুক্ত হন, যদিও এব্যাপারে তিনি কিছুই বলেন না। যাই হোক, তিনি নিজে বলেন, খ্রিষ্টধর্ম গভীরভাবে আবিষ্কার করার পর তিনি নিজের আগেকার উচ্ছৃঙ্খল জীবনধারণ ত্যাগ করে আমূল মনপরিবর্তন করেন ও খ্রিষ্টধর্মের সমর্থনে লিখতে শুরু করেন, কেননা সেসময় পৌত্তলিক রোম সাম্রাজ্যে খ্রিষ্টবিশ্বাস-বিরোধী যথেষ্ট ধারণা ও লেখা বিরাজ করছিল; তাছাড়া খোদ খ্রিষ্টমণ্ডলীর মধ্যেও যথেষ্ট ভ্রান্তমত প্রচলিত ছিল।

২০৭ বা ২০৮ সাল থেকে তিনি খ্রিষ্টীয় জীবনধারার নানা ক্ষেত্রে এমন কড়া পদক্ষেপ নেন যা মণ্ডলী গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক, যেমন বিধবার জন্য দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ, নির্যাতনকালে যে বিশ্বাস ত্যাগ করে, পরবর্তীতে সে অনুতপ্ত হলেও তার জন্য মণ্ডলীর সহভাগিতায় পুনর্মিলন নিষিদ্ধ, ইত্যাদি বিষয়; এই ভিত্তিতে কেউ কেউ এমনটা মনে করেছে, তিনি আনুমানিক ২০৭ সালে মন্তানুসের ভ্রান্তমতে যোগ দেন; কিন্তু

তথ্যটা আজকালে যথেষ্ট অবিশ্বাস্য বলে গরিগণিত; এবং তিনি যে মণ্ডলীচ্যুত হন তাও একেবারে অনিশ্চিত বিষয়। তিনি আনুমানিক ২২০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

স্মরণযোগ্য বিষয়, তিনি খ্রিষ্টধর্মের প্রথম পক্ষসমর্থক লেখকদের মধ্যে (হ্যাঁ, প্রৈরিতিক পিতৃগণের উত্তরসূরী সাধু ইউস্তিনুস ও সাধু ইরেনেউসের সঙ্গে তের্তুল্লিয়ানুস হলেন ২য় শতাব্দীর স্তম্ভ স্বরূপ) এমন সুনাম অর্জন করেন যা আজও অনস্বীকার্য, এমনকি তাঁর ধর্মতত্ত্ব তাঁর উত্তরসূরী সহনাগরিক সাধু চিপ্রিয়ানুস (জন্ম ২১০, মৃত্যু ২৫৮ সালে) এর ধর্মতত্ত্বকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করে। 'সাধু' উপাধিতে ভূষিত না হলেও তিনি খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

যে চারটে লেখা এখানে উপস্থাপিত, সেগুলো বাপ্তিস্ম গ্রহণের পরপর রচিত হয়েছিল, সম্ভবত ১৯৮ ও ২০১ সালের মধ্যে।

লেখক হিসাবে তের্তুল্লিয়ানুস

ধর্মক্ষেত্রে লিখতে গিয়ে তিনি ৯৮২টা নতুন শব্দ প্রবর্তন করেন, যেমন, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মাকে তিনিই প্রথম 'ত্রিত্ব' বলে অভিহিত করেন; রোমীয় সামরিক ভাষায় প্রচলিত 'সাক্রামেন্ত' শব্দটাও তিনিই প্রথম খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বে ব্যবহার করেন। লাতিন মাতৃভাষায় ছাড়া তিনি গ্রীক ভাষায়ও পুস্তক লিখেছিলেন। তাছাড়া তিনিই 'caro cardo salutis' (কারো কার্দো সালুতিস) প্রখ্যাত বাক্য ব্যবহার করেছিলেন যা 'ভ্রান্তমতপন্থীদের খারিজ-নির্দেশ' এর ৩৩ অধ্যায়ে ('খ' টীকায়) ব্যাখ্যা করা হয়।

তিনি যে আইনজ্ঞ ও বহুদিন ধরে ওকালতি পেশা অবলম্বন করেছিলেন, তা তাঁর লেখায় ব্যক্ত; তাই তাঁর রচনা-শৈলী যেমন তীব্র ও যথেষ্ট ব্যঙ্গাত্মক, তেমনি তা জটিল ও যথেষ্ট দুর্জ্ঞেয়। এজন্য যেখানে এমনটা প্রয়োজন বা উপকারী বলে মনে হল, সেখানে উপযোগী কয়েকটা কথা স্কোয়ার ব্র্যাকেটের [ ] মধ্যে যুক্ত করা হল; অন্যদিকে, রাউন্ড ব্র্যাকেটের ( ) মধ্যকার পাঠ্য অতিরিক্ত ব্যাখ্যা নয়, কিন্তু তের্তুল্লিয়ানুসেরই মূল পাঠ্য।

তের্তুল্লিয়ানুসের লেখায় বাইবেল উদ্ধৃতি

আজকালে বাইবেল পুস্তকের অধিকারী হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু সেসময় বাইবেলের পাণ্ডুলিপি দুষ্প্রাপ্যই ছিল। তাছাড়া লাতিন বাইবেলের পাঠ্য তখনও স্থিরীকৃত

হয়নি; অনেক দিন পরে, ৪০০ খ্রিষ্টাব্দের পরেই তা স্থিরীকৃত হয়। ফলে লোকে তা-ই আবৃত্তি করতে পারত যা ইতিমধ্যে মুখস্থ করেছিল। সেজন্য তের্তুল্লিয়ানুসের লেখায় বাইবেলের উদ্ধৃত বাক্যগুলো আজকালের বাইবেলের সঙ্গে সূক্ষ্মতম মিল রাখে না।

কুইন্তুস সেপ্তিমিউস ফ্লোরেন্স তের্তুল্লিয়ানুস

লিখিত

চারটে পুস্তিকা

ভ্রান্তমতপন্থীদের খারিজ-নির্দেশ

তের্তুল্লিয়ানুসের এই লেখা বিশেষভাবে ‘জ্ঞান-মার্গ’ বলে পরিচিত সেই আন্দোলনকেই লক্ষ করে যা খ্রিষ্টধর্মের প্রথম শতাব্দী থেকে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত খ্রিষ্টসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। জ্ঞান-মার্গপন্থীদের উদ্দেশ্য ছিল খ্রিষ্টবিশ্বাসকে সেকালের নানা ধর্মীয় ধারণা দ্বারা প্রভাবান্বিত করা; কেননা, তাদের মতে, যেহেতু খ্রিষ্টবিশ্বাস অধিক সঙ্কীর্ণ ও সরল মনোভাবে গণ্ডিবদ্ধ, সেজন্য সেটাকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে সেটার মধ্যে অন্যান্য ধর্মের উন্নত চিন্তাধারা প্রবেশ করানো দরকার। আন্দোলনটার গ্রীক নাম ছিল γνῶσις (গ্নোসিস] অর্থাৎ ‘জ্ঞান’ বা ‘জ্ঞান-মার্গ’, কেননা তাদের মতে স্বকীয়, উন্নত ও রহস্যময় জ্ঞান-ই সেই একমাত্র উপায় যা মানুষকে পার্থিব চিন্তাধারার বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম। তারা নিজেদের উদ্বুদ্ধ মনে করত, কেমন যেন প্রথম শ্রেণির খ্রিষ্টিয়ান। আরও, তাদের মতে পাপ, বিশেষভাবে দৈহিক কামনাজনিত পাপ ছিল নিম্নস্তরের বস্তু মাত্র, তাই পাপ এমন কিছু যেটাকে তাদের উন্নত ‘জ্ঞান’ দেখতই না; অন্য কথায়, তাদের উন্নত জ্ঞান কোন নীতি মানত না, যেহেতু নীতি তথা মানব আচরণও নিম্নস্তরের ব্যাপার মাত্র।

বলা বাহুল্য যে, এ ধরনের সংমিশ্রণের ফলে খ্রিষ্টবিশ্বাস নিজের প্রকৃত স্বাদ হারিয়ে ফেলে, এমনকি তেমন দূষিত খ্রিষ্টবিশ্বাস কেবল নামেই খ্রিষ্টবিশ্বাস।

তেমন পরিস্থিতিতে তের্তুল্লিয়ানুস দু’টো বিষয় উপস্থাপন করেন: প্রথমত, যিশুখ্রিষ্ট নিজের শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব কেবল প্রেরিতদূতদের হাতেই ন্যস্ত করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, প্রেরিতদূতেরা সেই শিক্ষাকে কেবল নিজেদেরই স্থাপিত মণ্ডলীগুলোর কাছে সম্প্রদান করেছিলেন। সুতরাং, যে শিক্ষা প্রৈরিতিক মণ্ডলীগুলোর শিক্ষা অনুযায়ী, কেবল সেটাই খ্রিষ্টীয়। আরও, পবিত্র শাস্ত্র খ্রিষ্টমণ্ডলীর এমন সম্পদ যা মণ্ডলী নিজের উদ্ভবের সময় থেকেই রক্ষা করে থাকে। ফলে, যেহেতু ভ্রান্তমতপন্থীরা মণ্ডলীর পরেই উদ্ভূত হয়েছিল, সেজন্য তারা শাস্ত্রের মালিক হতে পারে না; অতএব তাদের সঙ্গে সেসম্পর্কে তর্ক করতে নেই যেহেতু সেবিষয়ে তাদের কোন অধিকার নেই।

কিন্তু খ্রিষ্টের দেওয়া শিক্ষা বাস্তবে কোথায় পাওয়া যায়? উত্তরে তের্তুল্লিয়ানুস বলেন, তা প্রেরিতদের বিশ্বাস-সূত্রেই সম্বলিত, যা সেসময়ে ‘বিশ্বাসের মানদণ্ড’ (বা বিশ্বাসের মাপকাঠি) বলে পরিচিত ছিল; এবিষয়ে তাঁর কথা এ, ‘সেই মানদণ্ডের

বিপক্ষে কিছুই না জানা মানে সবকিছু জানা' (নিচে ১৪ অধ্যায়)। অর্থাৎ, বিশ্বাস-সূত্রে যা লেখা রয়েছে, যে খ্রিষ্টিয়ান কেবল তা-ই বিশ্বাস করে, সে ভ্রান্তমতপন্থীদের ভুলভ্রান্তি দ্বারা দূষিত হবে না।

লেখার লাতিন নাম (Præscriptio hæreticorum, প্রেস্ক্রিপ্তিও হেরেতিকোরুম) সম্পর্কে দু'টো কথা। আইনজীবী হওয়ায় তের্তুল্লিয়ানুস আইনি ভাষা ব্যবহার করেন। Præscriptio (প্রেস্ক্রিপ্তিও) শব্দটা রোমীয় আইনের একটা শব্দ। আদালতে মামলার প্রারম্ভে যদি একটা পক্ষ এমন দাবি উত্থাপন করত যে, মামলায় অপর পক্ষের কোন অধিকার নেই, তাহলে বিচারপতি দাবিটা সমর্থন করলে মামলাটা সাথে সাথে খারিজ হয়ে যেত ও অপর পক্ষটার জন্য খারিজ-নির্দেশ ঘোষণা করা হত। সুতরাং, লেখায় তেমন নাম ('ভ্রান্তমতপন্থীদের খারিজ-নির্দেশ') দেওয়ায় তের্তুল্লিয়ানুস বলতে চান, বাইবেল ও ধর্মতত্ত্ব ক্ষেত্রে ভ্রান্তমতপন্থীদের কোন অধিকার বা মালিকানা না থাকায় তাদের বিপক্ষে সেই 'খারিজ-নির্দেশ' (প্রেস্ক্রিপ্তিও) পালনীয়; ফলে খ্রিষ্টিয়ানেরা তাদের যুক্তি শুনতেও বাধ্য নয়, তাদের প্রতিবাদ করতেও বাধ্য নয়।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১
২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১
৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫

১। ভ্রান্তমত যে আছে, এমনকি ভ্রান্তমত যে প্রভাবশালী, তা অনস্বীকার্য

এ বর্তমান কালের পরিস্থিতি এমন যা এ সতর্কবাণীও উপস্থাপন করতে আমাদের আহ্বান করছে, তোমরা যেন এ সমস্ত ভ্রান্তমত সম্পর্কে আদৌ বিস্মিত না হও, কেননা ভ্রান্তমত আছেই, এমনকি আগে থেকেই বলা হয়েছিল ভ্রান্তমত দেখা দেবে। তাছাড়া, ভ্রান্তমত যে কার কার বিশ্বাস উল্টিয়ে দেবে তাতেও আশ্চর্যান্বিত হতে নেই, কেননা ভ্রান্তমতের উদ্ভব এজন্যই হয়েছে, যাতে বিশ্বাস যাচাইকৃত হতে হতে *পরীক্ষাসিদ্ধ* (ক) হয়ে ওঠে। তাই, ভ্রান্তমতগুলো যে এতই প্রভাবশালী, এব্যাপারে হোঁচট খায় যারা, সেই অনেকের ব্যবহার অসার ও ভিত্তিহীন। ভ্রান্তমত যদি না থাকত, তাহলে সেগুলোর প্রভাব

কতখানি হত? [সেটার প্রভাব শূন্যই হত।] যখন এ অবধারিত যে, একটা কিছু থাকবেই, তখন সেই কিছু যেমন নিজের অস্তিত্বের কারণ প্রাপ্ত হয়, তেমনি সেই কিছু অস্তিত্বমণ্ডিত হয়ে থাকবার শক্তিও প্রাপ্ত হয় ও সেটার পক্ষে অস্তিত্ববিহীন হওয়া সম্ভব নয়।

২। ভ্রান্তমতের প্রভাব, ও ভ্রান্তমত কার্ উপরে সেই প্রভার বিস্তার করে, সেসম্পর্কে

এসো, সেই জ্বরের কথা ধরি যা মানুষকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে নানা মারাত্মক ও যন্ত্রণাদায়ী উপায়াদির মধ্যে অন্যতম; কৈ, জ্বর যে আছে ও যে মানুষকে ধ্বংস করে থাকে তাতেও আমরা বিস্মিত হই না, কারণ এর জন্যই তো জ্বর আছে। একই প্রকারে, বিশ্বাসকে দুর্বল ও নিঃশেষিত করার জন্য সেই যে ভ্রান্তমত উদ্ভূত হয়, যেহেতু সেই ভ্রান্তমত তেমন প্রভাব রাখায় আমরা আতঙ্কিত হই, সেজন্য এর আগে আমাদের এবিষয়েই আতঙ্কিত হওয়া উচিত যে, ভ্রান্তমত আছে; কেননা ভ্রান্তমত যতক্ষণ আছে ততক্ষণ প্রভাব রাখে, আর যতক্ষণ প্রভাব রাখে ততক্ষণ অস্তিত্বও রাখে! কিন্তু তবুও এ জানা কথা যে, সেই যে জ্বর নিজের কারণ ও প্রভাবের দিক দিয়ে অমঙ্গল স্বরূপ, আমরা তাতে বিস্মিত হওয়ার চেয়ে সেটাকে বেশি ঘৃণাই করি, ও তা উচ্ছেদ করার ক্ষমতা আমাদের না থাকায় আমরা সেটার বিষয়ে যতদূর পারি ততদূর সতর্ক থাকি। তথাপি এমন কেউ না কেউ আছে যারা ভ্রান্তমত এড়াবার উপায় থাকতেও সেগুলোর প্রভাব এড়াবার চেয়ে, যে ভ্রান্তমতগুলো অনন্ত মৃত্যু ও তীব্রতর আগুনেরও উত্তাপ অনুপ্রবিষ্ট করে সেই ভ্রান্তমতগুলোতে বিস্মিত হওয়াই পছন্দ করে। অথচ সেগুলোর প্রভাবে যদি আমরা তত বিস্মিত না হয়ে থাকতাম, তবে সেগুলোর কোন প্রভাব থাকতই না। কেননা হয় বিস্মিত হতে হতে মানুষ ফাঁদে পড়ে, না হয়, ফাঁদে পতিত হয়েছে বলে সে বিস্মিত হয়; এমনটা দাঁড়াচ্ছে কেমন যেন ভ্রান্তমত কোন না কোন সত্যের আগমনেই তত প্রভাব রাখে। অমঙ্গল নিজস্ব কোন শক্তির অধিকারী হলে তা-ই বিস্ময়কর ব্যাপার হত; অথচ ব্যাপারটা তেমন নয়, কেননা ভ্রান্তমত তাদেরই কাছে তত প্রভাবশালী যারা বিশ্বাসে কম প্রভাবশালী। মুষ্টি ও মল্লযোদ্ধাদের লড়াইতে যোদ্ধা যে শক্তিশালী সেজন্যই যে সে জয়ী হয় তা নয়, একই প্রকারে যোদ্ধা যে কম শক্তিশালী সেজন্যই যে সে জয়ী হতে পারে না

তাও নয়, বরং নিজের কোন শক্তি ছিল না বিধায়ই সে পরাজিত হয়েছে। আর আসলে, যে জয়ী হয়েছে, সে পরবর্তীতে যখন একেবারে শক্তিশালী একজনের সঙ্গে লড়াই করবে, তখন সেও পরাজিত হয়ে পিছটান দেবে। একই প্রকারে, ভ্রান্তমত নিজের প্রভাব লোকদের দুর্বলতা থেকেই পায়, কেননা প্রভাবশালী বিশ্বাসের অধিকারী মানুষের সম্মুখীন হলে ভ্রান্তমতের আর কোন প্রভাব থাকে না।

৩। ভ্রান্তমতের সম্মুখীন মানুষ হয় গৌরব না হয় দণ্ড প্রাপ্ত হয়

সাধারণত এমনটা হয় যে, দুর্বল স্বভাবের কোন না কোন মানুষ ভ্রান্তমতে আক্রান্ত কোন না কোন ব্যক্তি দ্বারা এমন ভাবে প্রবঞ্চিত হয় যে নিজেরাই ধ্বংসে পতিত হয়। [তারা জিজ্ঞাসা করে:] এই যে মহিলা বা এই যে পুরুষ যারা দৃঢ় বিশ্বাস ও সদ্বিবেচনা ক্ষেত্রে মণ্ডলীতে ছিল অধিক পরীক্ষাসিদ্ধ, কেমন করে তারা অপর পক্ষে চলে গেল? যে কেউ তেমন প্রশ্ন উত্তোলন করে, সে কি আসলে নিজেই নিজের কাছে উত্তর দেয় না? অর্থাৎ এমনটা কি হয় না যে, ভ্রান্তমত যাদের বিকৃত করেছে তারা সদ্বিবেচক বা বিশ্বস্ত বা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বলে পরিগণিত হবার যোগ্য ছিল না? আমার মতে এটাও কি বিস্ময়কর নয় যে, যাকে আগে পরীক্ষাসিদ্ধ বলে গণ্য করা হয়েছিল, সে পরে পিছটান দেবে? সেই যে শৌল অন্যদের তুলনায় ভাল ছিলেন, তিনি পরে হিংসা দ্বারা বিনষ্ট হন। *প্রভুর হৃদয়ের মত* [ক] ভাল লোক যে দাউদ, তিনিও পরে নরহত্যা ও ব্যভিচার দোষে দোষী হন। প্রভু দ্বারা সমস্ত অনুগ্রহ ও প্রজ্ঞা প্রাপ্ত যে শলোমন, তিনি স্ত্রীলোকদের দ্বারা প্রতিমাপূজায় আকর্ষিত হন [খ]। কেননা কেবল ঈশ্বরের পুত্রকেই এমনটা দেওয়া হয়েছিল তিনি শেষ পর্যন্ত বিনা দোষে স্থিতমূল থাকবেন। তবে ব্যাপারটা কেমন? যদি কোন বিশপ, কোন বিধবা নারী, কোন চিরকুমারী, কোন শিক্ষাগুরু, এমনকি কোন সাক্ষ্যদাতা বিশ্বাসের মানদণ্ড থেকে পতিত হন, তাহলে এর ফলে কি ভ্রান্তমতগুলো সত্যাশ্রয়ী হয়ে গণ্য হবে? আমরা কি ব্যক্তি দ্বারা বিশ্বাসকে, নাকি বিশ্বাস দ্বারা ব্যক্তিকে পরীক্ষা করি? খ্রিষ্টিয়ান ব্যক্তি ব্যতীত প্রজ্ঞাবান কেউই নেই, বিশ্বস্ত কেউই নেই, উৎকৃষ্ট কেউই নেই; এবং যে কেউ শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকে [গ], সে ছাড়া খ্রিষ্টিয়ান আর কেউই নেই। মানুষ হিসাবে তুমি তো অন্য মানুষকে বাহ্যিক দিক দিয়েই জান: তুমি যা দেখ তা-ই মনে

কর, কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ যেহেতু তোমার চোখ দু'টো আছে। কিন্তু শাস্ত্রে বলে, *প্রভুর চোখ দু'টো ঊর্ধ্বস্থিত* [ঘ], *মানুষ তো বাইরের চেহারার দিকে তাকায়, প্রভু কিন্তু হৃদয়েরই দিকে তাকান* [ঙ], *প্রভু জানেন, কে কে তাঁর আপনজন* [চ], এবং [পিতা] *যে যে চারাগাছ পোঁতেননি, সেগুলো সবই উপড়ে ফেলা হবে* [ছ], এবং তিনি যেমনটা দেখান, সেই অনুসারে, *যারা সবার আগে তারা শেষে পড়বে* [জ], এবং *তাঁর কুলো তাঁর হাতে রয়েছে নিজের খামার পরিষ্কার করার জন্য* [ঝ]। প্রলোভনের যেকোন বাতাসে লঘু বিশ্বাসের তুষ যত খুশি উড়ে যাক, তত শুদ্ধ হবে সেই গম যা প্রভুর গোলাঘরে রাশি রাশি করে সঞ্চিত হবে। কোন না কোন শিষ্য হোঁচট খেয়ে কি প্রভুকে ছেড়ে পিছিয়ে পড়েছিল না? তথাপি এর ফলে বাকি সকলে এমনটা ভাবেননি তাঁরাও প্রভুর অনুসরণ থেকে পিছিয়ে পড়বেন; বরং তিনি যে জীবন-বাণী ছিলেন ও ঈশ্বর থেকে এসেছিলেন তা তাঁরা জানতেন বিধায় শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গী হয়ে নিষ্ঠাবান থাকলেন; বস্তুত তিনি শান্ত ভাবে তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁরাও চলে যেতে চাচ্ছিলেন কিনা [ঞ]। ফিগেলস, হের্মগেনেস, ফিলেতস ও হিমেনেওসের মত মানুষেরা [ট] যে প্রভুর প্রেরিতদূতকে ছেড়ে চলে গেছিল তা সামান্যতমই ব্যাপার [যখন একথা ভাবি যে] খ্রিষ্টের বিশ্বাসঘাতক যিনি তিনি ছিলেন প্রেরিতদূতদের একজন। কোন না কোন মানুষ যে প্রভুর মণ্ডলীগুলোকে ছেড়ে চলে যায় তা দেখে আমরা বিস্মিত হই, অথচ স্বয়ং খ্রিষ্টের আদর্শমত আমরা যা যা সহ্য করে থাকি তা-ই দেখায়, আমরা খ্রিষ্টিয়ান। শাস্ত্রে বলে, *তারা আমাদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে গেছে, অথচ তারা আমাদেরই ছিল না; কারণ যদি আমাদেরই হত, তবে আমাদের সঙ্গে থাকত* [ঠ]।

৪। নূতন নিয়মের নানা বাণী দেখায় যে, ভ্রান্তমতে পতন সম্ভবপর

আমরা বরং, এসো, প্রভুর বচনগুলো ও প্রেরিতদূতদের পত্রগুলোর কথা স্মরণ করি, কেননা ভ্রান্তমত যে দেখা দেবে, সেই বচন ও পত্রগুলোও আগে থেকেই সেবিষয়ে ঘোষণা করেছিল ও তেমন ভ্রান্তমত এড়াবার ব্যাপারে আগে থেকে আমাদের সতর্ক করেছিল; আর যেমন ভ্রান্তমত যে আছে সেবিষয়ে আমরা আতঙ্কিত নই, তেমনি ভ্রান্তমত যে এমন প্রভাবশালী হতে পারে যার জন্য সেই ভ্রান্তমতগুলো এড়ানো দরকার, সেবিষয়েও আমরা

যেন বিস্মিত না হই। প্রভু আমাদের এশিক্ষা দেন যে, শিকার-ললুপ অনেক নেকড়ে মেষের বেশে আসবে [ক]। তবে, সেই মেষগুলোর বেশ খ্রিষ্টিয়ান-নামের বাহ্যিক রূপ ছাড়া আর কীবা হতে পারে? খ্রিষ্টের পালকে দূষিত করার জন্য যে ধূর্ত ইন্দ্রিয়গুলো ও অপদূত অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করে, এগুলো ছাড়া সেই শিকার-ললুপ নেকড়ে আর কীবা হতে পারে? সেই নকল নবীরা মিথ্যা-প্রচারক ছাড়া আর কীবা হতে পারে? সেই নকল প্রেরিতদূতেরা জাল-করা সুসমাচারের প্রচারক ছাড়া আর কীবা হতে পারে? আরও, আজকালে ও ভাবীকালেও, খ্রিষ্টের প্রতিদ্বন্দ্বীরা ছাড়া আর কেইবা সেই খ্রিষ্টবৈরী হতে পারে? খ্রিষ্টবৈরী সেইদিনে নির্যাতনের তীব্রতায় যেভাবে আক্রমণ চালাবে, তার তুলনায় বর্তমানকালে ভ্রান্তমত নিজের বিকৃত শিক্ষা দ্বারা মণ্ডলীকে কম দীর্ণবিদীর্ণ করছে না; পার্থক্য শুধু এ, নির্যাতনের ফলে সাক্ষ্যমরদের উদ্ভব হয়, ও ভ্রান্তমত কেবল ধর্মত্যাগীদের তৈরি করে। *সেজন্য ভ্রান্তমত দেখা দেওয়া আবশ্যক, যেন প্রকাশ পায় কে কে পরীক্ষাসিদ্ধ মানুষ* [খ], তথা সেই তারা, যারা নির্যাতনকালে নিষ্ঠাবান থাকল ও সেই তারা যারা বিপথগামী না হয়ে ভ্রান্তমতে পদার্পণ করল না। কেননা প্রেরিতদূত এমনটা চান না যে আমরা তাদেরই পরীক্ষাসিদ্ধ মানুষ বলে গণ্য করব যারা ভ্রান্তমত পালন করার জন্য বিশ্বাস ত্যাগ করে, যেইভাবে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা চায় যখন নিজেদের যুক্তি অনুসারে তাঁর আর একটা বাণী ব্যবহার করে বলে, *সবকিছু যাচাই কর, যা মঙ্গলজনক, তা-ই ধরে রাখ* [গ], কেমন যেন সবকিছু ভুলবশত যাচাই করার পর একজন নাকি ভুলের মধ্য দিয়ে কোন না কোন অমঙ্গল বেছে নিতে না পারত।

৫। ভ্রান্তমত ও দলাদলি মণ্ডলীর ঐক্য নষ্ট করে

উপরন্তু, যখন প্রেরিতদূত যা নিঃসন্দেহে অমঙ্গলকর, সেই বিভেদ ও দলাদলি নিন্দা করেন, তখন তিনি সাথে সাথে ভ্রান্তমতের কথাও যোগ করেন। তবে, তিনি অমঙ্গলকর সবকিছুতে যা যোগ করেন, তা তিনি অমঙ্গল বলেই স্বীকার করেন বটে; এমনকি আরও মহত্তর যুক্তির জোরেই তা করেন, কেননা তিনি বলেন যে, বিভেদ ও দলাদলি সংক্রান্ত তাঁর যে ধারণা, তা তাঁর এ জানার উপর ভিত্তি করছিল যে, *দলাদলি দেখা দেওয়া আবশ্যক* [ক]। বাস্তবিকই তিনি দেখান যে, তিনি লঘুতর অমঙ্গলের কথাও সহজে মেনে

নিচ্ছিলেন এই কারণে যে, তিনি দেখছিলেন সেগুলোর তুলনায় গুরুতরই অমঙ্গল রয়েছে। তিনি যে অমঙ্গল মেনে নিচ্ছিলেন বলে ভ্রান্তমতকে মঙ্গলকর বলে মনে করছিলেন, তা নয় বটে, তিনি বরং আমাদের এবিষয়ে সতর্ক করতে অভিপ্রেত ছিলেন যাতে আরও খারাপ প্রলোভনের সম্মুখীন হয়ে আমরা বিস্মিত না হই; কেননা, তাঁর কথামত, সেগুলোর উদ্দেশ্যই *যেন প্রকাশ পায় কে কে পরীক্ষাসিদ্ধ মানুষ* (খ), অর্থাৎ যেন সেই পরীক্ষাসিদ্ধ মানুষই প্রকাশিত হয়, ভ্রান্তমত যাদের বিকৃত করতে পারে না। অবশেষে, যেহেতু গোটা বচনটা ঐক্য-রক্ষা ও বিভেদ-দমনের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে এই কারণে যে, বিভেদ ও অনৈক্যের চেয়ে ভ্রান্তমত মানুষকে ঐক্য থেকে কমই ছিন্ন করে না, সেজন্য তিনি যেমন বিভেদ ও অনৈক্য নিন্দনীয় শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করেন, তেমনি নিঃসন্দেহে তিনি ভ্রান্তমতও সেই শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করেন। আর তেমনটা ক'রে তিনি, ভ্রান্তমতে পতিত হয়েছে যারা, তাদের 'পরীক্ষাসিদ্ধ নয়' বলে ঘোষণা করেন; এবং বিশেষভাবে তিনি তেমনটা করেন যখন অভিযোগের কণ্ঠে তিনি মানুষকে সেইসব কিছু থেকে সরে যেতে অনুরোধ ক'রে এমন উপদেশ দেন তারা যেন সকলে একই কথা বলে ও একই কথা ভাবে (গ), কেননা এ এমন কিছু যা করতে ভ্রান্তমত [অর্থাৎ দলাদলি] প্রতিরোধ করে।

৬। ভ্রান্তমত সর্বক্ষেত্রে এড়ানো দরকার

এবিষয়ে আর কোন কথা দরকার হয় না, যেহেতু পল নিজেই গালাতীয়দের কাছে পত্রে ভ্রান্তমতকে সেই *মাংসের কর্মফলের* (ক) মধ্যে তালিকাভুক্ত করেন; তাছাড়া তিনি তীতকে এ আদেশ দেন, *ভ্রান্তমতপন্থীকে একবার সতর্ক করার পর তাকে পরিত্যাগ করতে হবে* একারণে যে, *তেমন লোক ধর্মভ্রষ্ট, ও এমন ভাবে পাপ করে যে নিজেই নিজেকে আত্মদণ্ডিত করে* (খ)। এমনকি, প্রায় প্রতিটি পত্রে তিনি যখন বিকৃত তত্ত্ব এড়াতে নির্দেশ দেন, তখন বিকৃত তত্ত্বগুলোর মধ্যে ভ্রান্তমতকেই অন্যতম বলে চিহ্নিত করেন। গ্রীক ভাষার 'হেরেসেস' [অর্থাৎ ভ্রান্তমত] শব্দটা এমন 'বেছে নেওয়াটা' নির্দেশ করে যার উপর একটা মানুষ অবলম্বন করে যখন সে ভ্রান্তমত বিষয়ে শিক্ষা দেয় বা ভ্রান্তমতকে নিজের জন্য আপন করে নেয়। তিনি ভ্রান্তমতপন্থীকে এজন্যই 'আত্মদণ্ডিত'

বলে থাকে, কারণ সে নিজেকে তাতেই দণ্ডিত করে যা নিজেই বেছে নিয়েছে। তথাপি আমাদের পক্ষে নিজেদের ইচ্ছামত কোন কিছুই অনুপ্রবেশ করানো বিধেয় নয়, তা-ও বেছে নেওয়া বিধেয় নয় যা অন্য কেউ নিজের ইচ্ছামত অনুপ্রবেশ করিয়েছে। আমরা অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে প্রভুর প্রেরিতদূতদেরই মানি, কেননা যা প্রবেশ করানো দরকার, তা তাঁরাও নিজেদের ইচ্ছামত বেছে নেননি, বরং খ্রিষ্টের কাছ থেকে যা গ্রহণ করে নিয়েছিলেন, তাঁরা সেই শিক্ষাবাণী জাতিসকলের কাছে বিশ্বস্তভাবে হস্তান্তর করেছিলেন। সুতরাং, *যদিও স্বর্গ থেকে আগত কোন দূত অন্য সুসমাচার প্রচার করতেন* তিনি আমাদের দ্বারা *বিনাশ-মানতের বস্তু* (গ) বলে চিহ্নিত হবেন। এমনকি পবিত্র আত্মাও আগে থেকে এমনটা দেখেছিলেন যে, আলোময় দূতের বেশ ধারণ ক'রে (ঘ) প্রবঞ্চক একটা অপদূত ফিলুমেনে (ঘ) নামক একটা কুমারীতে অবস্থান করবে যার চিহ্নকর্ম ও অপরূপ কাজ দ্বারা চালিত হয়ে আপেল্লেস নতুন একটা ভ্রান্তমত অনুপ্রবেশ করাল।

৭। বিধর্মীদের দর্শনবিদ্যাই ভ্রান্তমত অনুপ্রবেশ করায়

এগুলো হলো মানুষদের ও *অপদূতদের সেই মতবাদ* (ক) যা কানের চুলকানির লক্ষ্যে এযুগের প্রজ্ঞার আত্মা থেকে জন্ম নিয়েছে; সেটাকে 'মূর্খতা' আখ্যায়িত ক'রে প্রভু *জগতের যা মূর্খ তাই বেছে নিয়েছেন খোদ দর্শনবিদ্যাকেও লজ্জা দেবার জন্য* (খ)। কেননা এ দর্শনবিদ্যাই হলো এযুগের প্রজ্ঞার মূল উপাদান ও প্রকৃতির ও ঈশ্বরের ব্যবস্থার অহঙ্কারী ব্যাখ্যাতা। বলতে গেলে, ভ্রান্তমতগুলোও দর্শনবিদ্যা দ্বারা প্ররোচিত।

তেমন উৎস থেকে এল সেই এওনগুলো ও সেই অগণন রূপ ইত্যাদি বিষয়াদি যা নিজেও উল্লেখ করতে পারি না, ও সেই মানব-ত্রিত্বও এল যা ভালেন্তিনুসের (গ) মতবাদ অনুযায়ী; আর এ ভালেন্তিনুস ছিল প্লেটোর মতবাদপন্থী। একই উৎস থেকে এল মার্কিওনের (ঘ) সেই শ্রেয়তর ঈশ্বর যে-ঈশ্বর কমপক্ষে বিরামে চিহ্নিত; এই মার্কিওন তো স্তোয়া-মতবাদ থেকেই এসেছিল। আরও, সেই মতবাদ রয়েছে যা অনুসারে মানবাত্মা মরণশীল; মতবাদটা এপিকুরোসপন্থীদেরই (ঙ) দ্বারা সমর্থিত; আরও, দেহের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সেই অস্বীকৃতিও রয়েছে যা সকল দার্শনিকদের বিদ্যালয় থেকে আগত;

আরও, যখন বলা হয়, পার্থিব পদার্থ ঈশ্বরের সমকক্ষ, তখন সেটা হলো জেনোর (চ) মতবাদ; আর যখন অগ্নিময় এক ঈশ্বরের কথা বলা হয় তখন এই যে, হেরাক্লিতোস উপস্থিত। একই বিষয়বস্তু ভ্রান্তমতপন্থী ও দার্শনিকদের দ্বারা অনবরতই উত্থাপিত, একই যুক্তি অনবরতই উপস্থাপিত। অমঙ্গল কোথা থেকে উদ্গত? অমঙ্গল কেন বিদ্যমান? মানুষ কোথা থেকে উদ্গত? মানুষ কিভাবে উদ্ভূত হলো? এবং ভালেন্তিনুস যা সম্প্রতিকালে উত্থাপন করেছে, সেই অনুসারে, ঈশ্বর কোথা থেকে উদ্গত? উত্তর, ঈশ্বর 'এন্থিমেসিস' ও 'একত্রোমা' থেকে উদ্গত (ছ)।

হে দুর্ভাগা এরিষ্টটল, তুমিই তো ওদের জন্য সেই তর্কযুক্তি উপস্থাপন করেছিলে, তথা গেঁথে তোলার ও নামিয়ে দেওয়ার কায়দা; সেই কায়দা এমন যা নিজ বচনগুলোতে একেবারে অসরল, নিজ ধারণাধারায় অস্বাভাবিক, যুক্তিতে দুর্জ্ঞেয়, তর্কাতর্কিতে কার্যকর, এমনকি নিজের পক্ষেও বিব্রতকর যেহেতু সেটা সবকিছু প্রত্যাহার করে ও সেইসঙ্গে কিছুই পর্যালোচনা করে না।

এ থেকেই এল সেই সমস্ত *রূপকথা* ও *সীমাহীন বংশতালিকা* (জ), সেই *ফলহীন প্রশ্ন* (ঝ) ও সেই *কথা যা দুষ্ট ক্ষতের মত ছড়িয়ে পড়ে* (ঞ)। কেননা, আমাদের সংযত করতে গিয়ে প্রেরিতদূত এসমস্ত কিছুর মধ্য থেকে স্পষ্টভাবে দর্শনবিদ্যার কথা ব্যক্ত ক'রে অভিপ্রায় করেন আমরা এসমস্ত বিষয়ে সতর্ক থাকব। কলসীয়দের কাছে পত্র পাঠিয়ে তিনি বলেন, *দেখ, নিজ নিজ দর্শনবিদ্যার অসার প্রতারণা দিয়ে কেউই যেন তোমাদের মন জয় না করে: তা মানবীয় ঐতিহ্য-ভিত্তিক, ও পবিত্র আত্মার প্রজ্ঞা অনুরূপ নয়* (ট)। তিনি তো একসময় এথেন্সে ছিলেন, ও [সেখানকার দার্শনিকদের সঙ্গে] কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সেই মানব-প্রজ্ঞা বিষয়ে অবগত হয়েছিলেন যা সত্য জানবার দাবি রাখে ও সেইসঙ্গে সত্যকে বিকৃত করে; এমন সত্য যা পরস্পর বিরোধী উপদলগুলো দ্বারা নিজের অভ্যন্তরেই বহুমুখী ভ্রান্তমতে বিভক্ত।

তবে, এথেন্স ও যেরুশালেমের মধ্যে সম্পর্ক কি? 'আকাদেমিয়া' (ঠ) ও মণ্ডলীর মধ্যে সম্পর্ক কী? ভ্রান্তমতপন্থীদের সঙ্গে খ্রিষ্টিয়ানদের মধ্যে সম্পর্ক কি? আমাদের শিক্ষাবাণী শলোমন-অলিন্দ থেকে আগত যিনি এশিক্ষা সম্প্রদান করেছিলেন যে, *প্রভুকে সরল অন্তরে অন্বেষণ করা* (ড) উচিত। যারা স্তোয়া, প্লেটো ও তর্কযুক্তি অনুযায়ী একটা খ্রিষ্টতত্ত্ব

উপস্থাপন করেছে, তারা সাবধান থাকুক। খ্রিষ্টযিশুকে গ্রহণ করার পর আমাদের আর অন্য কোন কৌতূহল দরকার হয় না; সুসমাচার গ্রহণ করার পর আমাদের আর অন্য কোন অন্বেষার প্রবণতা নেই। আমরা যখন বিশ্বাস করি, তখন অন্য কোন কিছু বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করি না। কেননা আমাদের প্রাথমিক বিশ্বাস এ: সেই বিশ্বাসের পাশাপাশি অন্য কিছু বিশ্বাস করতে নেই।

৮। 'খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে' বচনের অর্থ

এবার আমি সেই বিষয়ে আসি যা আমাদের ভাইয়েরা কৌতূহলে প্রবেশ করার জন্য অজুহাত হিসাবে তুলে ধরে ও যার উপরে ভ্রান্তমতপন্থীরা দ্বিধাবোধ অনুপ্রবেশ করাবার জন্য চাপ দেয়। ওরা নাকি বলে, *লেখা রয়েছে, খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে* (ক)। এসো, প্রভু কোন্ সময় একথা উচ্চারণ করেছিলেন তা স্মরণ করি। আমি মনে করি, তিনি নিজের শিক্ষাদানের শুরুতেই সেকথা বলেছিলেন যখন তিনি খ্রিষ্ট কিনা সেবিষয়ে সকলে তখনও সন্দেহ বোধ করছিল, আর যখন পিতর নিজেও তখনও তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষণা করেননি, এবং প্রকৃতপক্ষে [বাপ্তিস্মদাতা] যোহনও তাঁর বিষয়ে নিশ্চিত হতে ক্ষান্ত হয়েছিলেন। সুতরাং 'খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে' কথাটা যথেষ্ট কারণের ভিত্তিতেই এমন সময়ে উচ্চারণ করা হয়েছিল যখন যিনি তখনও পরিচিত ছিলেন না, তাঁর বিষয়ে খোঁজ করাটা তখনও শুরু হয়নি। তাছাড়া ব্যাপারটা ইহুদীদের লক্ষ করে। কেননা তাদেরই যে কোথায় বা খ্রিষ্টকে খুঁজতে হত, তা তারা ভাল করেই জানত।

তিনি বলেছিলেন, *তাদের তো মোশি ও এলিয় আছেন* (খ), অর্থাৎ তাদের সেই বিধান ও নবীরা আছেন যাঁরা খ্রিষ্টকে প্রচার করে থাকেন। আরেক স্থানেও তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, *যেখানে তোমরা পরিত্রাণ প্রত্যাশা কর, তন্ন তন্ন করে সেই শাস্ত্রের অনুসন্ধান কর, কারণ সেসমস্ত কিছু আমারই বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে* (গ); আর এটিই 'খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে' বচনটার অর্থ। কেননা একথা স্পষ্ট যে, পরবর্তী কথাও ইহুদীদের লক্ষ করে, *দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে* (ঘ)। ইহুদীরা একসময় ঈশ্বরের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে নিজেদের পাপের কারণে পরিত্যক্ত হওয়ার পর তারা ঈশ্বরকে ছাড়া জীবনধারণ করতে শুরু করেছিল। অপর

দিকে বিজাতীয়রা ঈশ্বরের সঙ্গে কখনও সন্ধিবদ্ধ হয়নি, তারা ছিল কেবল *কলসির এক জলবিন্দুরই মত ও স্থানের বাইরে পাতলা ধুলার মত* (ঙ), ও সবসময়ের মত ছিল দরজার বাইরে। তবে, যে সবসময়ের মত বাইরে ছিল সে কেমন করে সেখানে ঘা দেবে যেখানে সে কখনও ছিল না? সে কোন্ দরজার কথা জানবে যখন সে কখনও কোন দরজায় গৃহীত হয়নি ও কখনও পরিত্যক্তও হয়নি? কিন্তু যে এবিষয়ে সচেতন যে, সে একসময় ভিতরে ছিল ও তাকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, সে-ই নাকি সেই ব্যক্তি নয় যে ঘা দেবে ও দরজার কথা জানবে?

একই প্রকারে, *চাও, তোমরা পাবে* (চ) কথাটা উপযোগীভাবে তাকেই লক্ষ করে যে আগে থেকে জানত তাকে কার্ কাছে চাইতে হয় ও কার্ কাছ থেকে সে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল, অর্থাৎ কিনা আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের সেই ঈশ্বর যাঁর বিষয়ে ও যাঁর প্রতিশ্রুতি বিষয়ে বিজাতীয়রা কখনও কিছুই জানেনি। এজন্য ইস্রায়েলকে বলা হয়েছিল, *আমি —তিনি বলেছিলেন— কেবল ইস্রায়েলকুলের হারানো মেষগুলির কাছেই প্রেরিত হয়েছি* (ছ)। তিনি তখনও সন্তানদের খাদ্য কুকুরদের কাছে ফেলে দেননি (জ), তখনও বিজাতীয়দের এলাকায় যেতে আদেশ করেননি (ঝ)। কেবল শেষেই তিনি এমন আজ্ঞা করেছিলেন তাঁরা যেন সকল জাতিকে শিক্ষাদান করার জন্য ও প্রক্ষালিত করার জন্য বেরিয়ে পড়েন (ঞ), অর্থাৎ তিনি তখনই একথা বলেছিলেন যখন তাঁরা সহায়ক সেই পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করতে উদ্যত ছিলেন *যিনি পূর্ণ সত্যের মধ্যে তাঁদের চালনা করবেন* (ট); এবং একথাও একই ব্যাপারটা লক্ষ করে। কেননা বিজাতীয়দের শিক্ষাগুরু হতে যাঁদের আদেশ করা হয়েছিল, সেই প্রেরিতদূতদেরও যখন সেই সহায়ককেই নিজের শিক্ষাগুরু হিসাবে পাবার কথা ছিল, তখন মহত্তর কারণে আমাদেরই কাছে বলা দরকার ছিল, *'খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে'*, সেই আমরা যাদের কাছে একদিন সরাসরিই প্রেরিতদূতদের মাধ্যমে শিক্ষা আসবার কথা ছিল, ও প্রেরিতদূতদের কাছেও সেই শিক্ষা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আসবার কথা ছিল। সত্যি, প্রভুর সকল বচন সকল মানুষের জন্য উপস্থাপিত; সেই বচনগুলো ইহুদীদের কানের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে এসে গেছে। কিন্তু যেহেতু বেশির ভাগে সেই বচনগুলো ব্যক্তি হিসাবে ইহুদীদেরই লক্ষ করছিল,

সেজন্য সেই বচনগুলো আমাদের জন্য প্রকৃতপক্ষে সাবধান বাণী হিসাবে নয়, উদাহরণ-বাণী হিসাবেই বরং উচ্চারিত।

৯। খ্রিষ্টের শিক্ষা পাবার পর খোঁজ করার মত আর কিছুই নেই

আমি এখন ইচ্ছাকৃত ভাবেই এবিষয় ছেড়ে দিচ্ছি। একথা মেনে নেওয়া হোক যে, *খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে* (ক) বচনটা সকল মানুষের জন্য উচ্চারিত হয়েছিল। তথাপি এটাও দাবীকৃত যে, বচনটার প্রকৃত অর্থ বিচারবুদ্ধির পরিচালনা হাতিয়ার করেই স্থির করা হবে। কোন ঐশকণ্ঠ এমনভাবে সম্পর্কবিহীন ও এলোমেলো ভাবে বিক্ষিপ্ত নয় যে কেবল বচনগুলোই সমর্থনের বিষয় কিন্তু সেগুলোর যুক্তি তত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

কিন্তু আমি প্রথমত এ ধরে নিচ্ছি যে, খ্রিষ্টের শেখানো কোন না কোন বচন রয়েছে যা বিজাতীয়রা সবদিক দিয়েই বিশ্বাস করতে বাধ্য, আর সেইজন্য তারা তা 'খুঁজতে'ই বাধ্য যাতে তা 'খুঁজে পেয়ে' বিশ্বাস করতে সক্ষম হতে পারে। তথাপি, যা কিছু একক ভাবে ও নিশ্চিত ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেটার জন্য অশেষ অনুসন্ধান থাকতে পারে না: কেবল খুঁজে না পাওয়া পর্যন্তই তোমাকে খুঁজতে হবে, ও খুঁজে পাবার পর তোমাকে সেটাকে বিশ্বাস করতে হবে; তারপর, যা বিশ্বাস করেছ, তা রক্ষা করা ছাড়া তোমার অতিরিক্ত কিছু করার আর দরকার হয় না, অবশ্য, তুমি যদি এও বিশ্বাস কর যে, বিশ্বাস করার মত আর কিছুই নেই, ফলে যিনি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া অন্য কিছু খোঁজ না করতে তোমাকে আজ্ঞা করেছেন; তাই তুমি যখন তাঁর সেই শিক্ষা খুঁজে পেয়েছ ও বিশ্বাস করেছ, তখন খোঁজবার মতও তোমার আর কিছু নেই। এমনকি, যদিও কোন মানুষ এবিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে, তথাপি আপনা আপনি এ প্রমাণিত হবে যে, খ্রিষ্ট দ্বারা যা শেখানো হয়েছে তা আমাদেরই (খ) কাছে রয়েছে। এদিকে, তেমন প্রমাণের উপর আস্থা রেখে আমি সাথে সাথে এমন কথা বলব যা কয়েকটা মানুষের জন্য সতর্কবাণী হিসাবে উচ্চারিত, তথা, তারা যা বিশ্বাস করেছে, ও যা একসময় মনে করছিল তাদের তা খোঁজ করা দরকার, যেন সেটার বাইরে অন্য কিছুই খোঁজ না করে; এবং '*খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে*' বচনটা তারা যেন বিচারবুদ্ধির নিয়ম অবহেলা ক'রে ব্যাখ্যা না করে।

১০। অশেষ অনুসন্ধান করা-ই মানে, মানুষের মন যা চায় তা মানুষ এখনও খুঁজে পায়নি।

খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে (ক) বচনটার যুক্তি ত্রিবিধ, বস্তুগত যুক্তি, কাল-ভিত্তিক যুক্তি ও সীমাগত যুক্তি। বস্তুগত যুক্তিটা হলো, তুমি যেন বিচার-বিবেচনা কর সেটা কী যা তুমি খুঁজতে যাচ্ছ; কাল-ভিত্তিক যুক্তিটা হলো, কখন তোমাকে খুঁজতে হবে; সীমাগত যুক্তিটা হলো, কত সময় ধরে তুমি খোঁজ করে থাকবে। সুতরাং, যা খ্রিষ্ট শিখিয়েছিলেন তোমাকে তা-ই খুঁজতে হবে, আর তোমাকে ততক্ষণ ধরে খুঁজতে হবে যতক্ষণ না খুঁজে পাবে; হ্যাঁ, ততক্ষণ যতক্ষণ না খুঁজে পাবে। কিন্তু তুমি যখন বিশ্বাস করেছিলে, তখন তা তুমি ইতিমধ্যে খুঁজে পেয়েছিলে, কেননা তুমি যদি খুঁজে না পেয়ে থাকতে তবে বিশ্বাসও করতে না; একই প্রকারে, পাবার লক্ষ্য যদি না থাকত, তুমি খুঁজতে না। সুতরাং তুমি তো পাবার জন্যই খুঁজতে থাক, ও বিশ্বাস করার জন্যই খুঁজে পাও। তুমি বিশ্বাস করায়ই খোঁজবার ও খুঁজে পাবার অনর্থক বিলম্ব বন্ধ করে দিয়েছ। তোমার খোঁজবার খোদ ফলটাই তোমার জন্য এ সীমা নির্ধারণ করেছে। এই গণ্ডি তিনি নিজেই নির্দিষ্ট করেছিলেন যিনি এমনটা ইচ্ছা করেন না, তিনি যা শিখিয়েছিলেন তুমি সেটা ছাড়া অন্য কিছু বিশ্বাস করবে, ফলত অন্য কিছুও খুঁজবে।

তথাপি, যেহেতু অমুক তমুক দ্বারা কতগুলো বিষয় শেখানো হয়েছে, সেজন্য আমাদের ততক্ষণ খুঁজতে হবে যতক্ষণ না কিছুটা পেতে পারি; হ্যাঁ, সবসময়ই খুঁজব, ও কখনও কিছুই বিশ্বাস করব না। কেননা তেমন খোঁজবার শেষ কোথায়? কোথায় বিশ্বাস করার শেষ স্থান? কোথায় খুঁজে পাবার সমাপ্তি? মার্কিওনের কাছে কি? কিন্তু ভালেন্তিনুসও 'খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে' বচনটা উপস্থাপন করে। তবে কি, ভালেন্তিনুসের কাছে [আমাদের খুঁজে পাবার সমাপ্তি হবে]? আচ্ছা, তবে আপেল্লেসও একই বচন দ্বারা আমার উপর চাপ দেবে; এবং এইভাবে হেবিওন ও শিমোন (খ) ও অন্যান্য সকলেও পালাক্রমে এসে আমাকে ভুলিয়ে নিজ নিজ দলে টানবার জন্য সেই বচন ছাড়া অন্য কিছুই ব্যবহার করবে না। তাই আমি কেমন যেন আর কোথাও থাকব না, ও একই সময়ে সর্বস্থানেই সেই '*খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে*' আহ্বানের সম্মুখীন হব, ঠিক যেন আমার কোন বিশ্রামস্থান না থাকত, ঠিক যেন আমি তা খুঁজে পেয়ে না থাকতাম

যা খ্রিষ্ট শিখিয়েছিলেন, অর্থাৎ সেই বিষয় যা খোঁজা দরকার, যা বিশ্বাস করা একান্ত প্রয়োজন।

১১। খ্রিষ্ট-বিশ্বাস পাবার পর বিকল্প কিছু খোঁজ করা বৃথা কাজ

অপরাধ না থাকলে তবে ভুল করলে দায়মুক্তি থাকতে পারে; যদিও ভুল করাও অপরাধ। আবার বলছি, বাস্তব কিছু না রেখে ফেললে মানুষ দায়মুক্তির আশ্রয়ে ছুটে বেড়াতে পারে। অথচ, আমি যা বিশ্বাস করতে বাধ্য ছিলাম, তা যদি বিশ্বাস করছিলাম, এবং পরে, আমার পক্ষে তেমন প্রত্যাশা পোষণ করা সমুচিত না হলেও তবু, হয় এই কারণে যে, বাইরে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও আমি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করিনি, না হয় এই কারণে যে, আমার বিশ্বাস করাটা আমি বন্ধ করেছি, তবে, পরে আমি যদি মনে করি খোঁজবার মত অন্য কিছু থাকে, তাহলে আমি অবশ্যই এমনটা প্রত্যাশা করব যে, পাবার মত অন্য কিছু থাকে। তাই আমি যদি এভাবে আমার বিশ্বাস ছেড়ে দিই, তাহলে এর ফলে আমাকে অস্বীকারকারী বলে সাব্যস্ত করা হবে। আমি একবার মাত্র বলব, এমন ব্যক্তি যে কখনও কোন কিছুর অধিকারী হয়নি বা সবকিছু হারিয়ে ফেলেছে, সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউই খোঁজে না। সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তার দশটা রুপোর টাকার একটা হারিয়ে ফেলেছিল বিধায়ই সেটা খুঁজছিল (ক), কিন্তু সেটাকে পাবার পর খোঁজ করাটা বন্ধ করেছিল। তার রুটি ছিল না বিধায়ই সেই প্রতিবেশী দরজায় ঘা দিচ্ছিল; কিন্তু তার জন্য দরজাটা খুলে দেওয়া হওয়া মাত্র ও রুটিটা গ্রহণ করা মাত্র সে ঘা দেওয়াটা বন্ধ করেছিল (খ)। সেই বিধবা স্ত্রীলোক শুনানি পাচ্ছিল না বিধায়ই বিচারকের কাছে শুনানি যাচনা করতে থাকছিল; কিন্তু তার কথা শোনা হলে সে ক্ষান্ত হয়েছিল (গ)। সুতরাং খোঁজবার, ঘা দেওয়ার ও যাচনা করার একটা সীমা আছে। তিনি বলেন, *যে যাচনা করে, সে পায়; আর যে ঘা দেয়, তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে, ও যে খোঁজে, সে খুঁজে পাবে* (ঘ)। দূর হোক সেই মানুষ যে কখনও কিছুই খুঁজে পায় না বিধায় অবিরতই খুঁজতে থাকে, কেননা সে সেইখানে খুঁজছে যেখানে খুঁজে পাবার কিছুই নেই। দূর হোক সেই মানুষ যে তার জন্য দরজাটা কখনও খুলে দেওয়া হয় না বিধায় অবিরতই ঘা দিতে থাকে, কেননা সে সেইখানে ঘা দিচ্ছে যেখানে [দরজা খুলে দেওয়ার মত] কেউই নেই।

দূর হোক সেই মানুষ যে তার কথা কখনও শোনা যায় না বিধায় অবিরত যাচনা করে থাকে, কেননা সে এমন একজনের কাছে যাচনা করছে যে শোনে না।

১২। বিশ্বাসের আলো যা দিতে পারে, তা ছাড়া অন্য কিছু খুঁজতে নেই

আমাদের পক্ষ থেকে, যদিও একথা সত্য যে এখনও আমাদের খোঁজ করা দরকার এমনকি অবিরতই খোঁজ করা দরকার, তবু কোথায়ই বা খোঁজ করা উচিত? আমরা কি ভ্রান্তমতপন্থীদের কাছে খুঁজব? কিন্তু সেখানে সবকিছুই আমাদের নিজস্ব সত্যের পক্ষে অচেনা ও বিরুদ্ধ, এমনকি ওদের কাছে যাওয়াও নিষিদ্ধ। কোন্ দাস অচেনা লোকের কাছে বা, আরও খারাপ, নিজের প্রভুর শত্রুর কাছে খাদ্য খোঁজে? যুদ্ধত্যাগী বা পলাতক বা বিদ্রোহী না হলে কোন্ সৈন্য এমন রাজাদের কাছ থেকে পুরস্কার বা মজুরি প্রত্যাশা করে যাঁরা মিত্র নন, এমনকি আমি বলতে পারতাম, যাঁরা শত্রু? সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকও নিজের বাড়ির মধ্যেই সেই রুপোর টাকা খুঁজছিল। সেই যে লোকটা অবিরতই দরজায় ঘা দিচ্ছিল, সেও প্রতিবেশী একজনের দরজায় ঘা দিচ্ছিল। আর সেই বিধবা স্ত্রীলোক যার কাছে শুনানি যাচনা করছিল, সেই বিচারক কড়া হয়েও তবু তার শত্রু ছিল না। যা কিছু বিনাশমূলক, কেউই তা থেকে গঠনমূলক শিক্ষা পেতে পারে না। যেখানে অন্ধকার বিরাজ করে, সেখান থেকে কেউই আলো পায় না। তাই এসো, যা আমাদের নিজস্ব সেটারই মধ্যে, যারা আমাদের আপনজন তাদেরই কাছ থেকে, ও যা কিছু আমাদের সেটার বিষয়েই খুঁজতে থাকি, অর্থাৎ সেইসব কিছু, এমনকি কেবল সেটাই খুঁজতে থাকি যা বিশ্বাসের মানদণ্ড অক্ষুণ্ন রেখে অনুসন্ধানের বিষয় হতে পারে।

১৩। বিশ্বাসের মানদণ্ড

আমরা যা রক্ষা করি, এখন থেকেও যেন তা স্বীকার করতে পারি, সেজন্য সেই বিশ্বাসের মানদণ্ড তথা সেই বিষয়াদি রয়েছে যা বিশ্বাস করা দরকার, তথা: কেবল এক ঈশ্বর আছেন, আর তিনি জগতের সেই স্রষ্টা ছাড়া অন্য কেউ নন, যিনি সবকিছুর পূর্বে নিঃসৃত তাঁর নিজের বাণী দ্বারা অনস্তিত্ব থেকে নিখিল বিশ্বকে উৎপাদন করেছেন; এই বাণী তাঁর আপন পুত্র বলে অভিহিত, তিনি ঈশ্বরের নামে নানা ভাবে কুলপতিদের কাছে

দৃষ্ট হয়ে, সর্বকালে নবীদের মধ্যে শ্রুত হয়ে, পরিশেষে পিতা ঈশ্বরের আত্মা ও পরাক্রম দ্বারা কুমারী মারীয়াতে আনীত হয়ে, তাঁর গর্ভে মাংস হয়ে ও তাঁর কাছ থেকে সঞ্জাত হয়ে যিশুখ্রিষ্ট হলেন; তারপর তিনি নতুন বিধানের ও স্বর্গরাজ্যের নতুন প্রতিশ্রুতির কথা প্রচার করলেন, পরাক্রম-কর্ম সাধন করলেন, ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন, স্বর্গে আরোহণ করে পিতার ডান পাশে আসন নিলেন; নিজের হয়ে সেই পবিত্র আত্মার পরাক্রম প্রেরণ করলেন যিনি বিশ্বাসীদের চালনা করবেন; মাংসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-সহ পবিত্রজনদের ও দুর্জনদের উভয়েরই পুনরুত্থানের পর তিনি অনন্ত জীবনের ও সমস্ত প্রতিশ্রুতির ফল ভোগ করার জন্য পবিত্রজনদের সঙ্গে করে নেবার লক্ষ্যে ও চিরন্তন আগুনে দুর্জনদের দণ্ডিত করার লক্ষ্যে সগৌরবে আগমন করবেন।

খ্রিষ্ট দ্বারা শেখানো এই [বিশ্বাসের] মানদণ্ড (ক), যেইভাবে প্রমাণিত হবে, সেই অনুসারে আমাদের কাছে কোন জিজ্ঞাসা রাখে না, কেবল সেই জিজ্ঞাসাই থেকে যায় যেগুলোকে ভ্রান্তমতসমূহ অনুপ্রবেশ করায় ও যেগুলো মানুষকে ভ্রান্তমতপন্থী করে তোলে।

১৪। বিশ্বাসের মানদণ্ডের বাইরে যেকোন জিজ্ঞাসা অসার কৌতূহল মাত্র

তুমি [মানদণ্ডের] বিষয়বস্তুসমূহ নিজ নিজ অনুক্রম অনুসারে নিজ নিজ রূপ রক্ষা করলে তবে তোমার কাছে যা কিছু সন্দেহের বিষয় বা অস্পষ্ট মনে হচ্ছে, সেসম্পর্কে নিজের খুশিমত খুঁজতে ও আলোচনা করতে পার ও সমস্ত স্বাধীনতার সঙ্গে নিজের কৌতূহল বিস্তার করতে পার। অবশ্যই তোমার কোন না কোন বিজ্ঞ ভ্রাতা আছেন যিনি জ্ঞানের অনুগ্রহ প্রাপ্ত, যিনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রেণির একজন; তোমার ঘনিষ্ঠ এমন একজন আছেন যিনি তোমার মত কৌতূহলী হয়েও তথাপি তোমার মত অনুসন্ধানী মানুষ। যাই হোক, পাছে তুমি এমন কিছু জানতে পাও যা তোমার জানা উচিত নয়, সেজন্য তোমার পক্ষে না জানাটা অনেক ভালো। প্রভু শাস্ত্রে 'তোমার দক্ষতা' নয়, *তোমার বিশ্বাস-ই তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে* (ক) বলেছিলেন। সুতরাং, বিশ্বাস সেই মানদণ্ডে রাখা হয়েছে; তার একটা নিয়ম আছে, ও সেই নিয়ম পালনের ফলে পরিত্রাণও আছে। তথাপি অনুশীলন কৌতূহলের অভ্যন্তরেই স্থিত, ও তার যে একমাত্র গৌরব রয়েছে, তা বিজ্ঞতাপূর্ণ প্রচেষ্টা থেকে আসে। কৌতূহল বিশ্বাসকে স্থান দিক, গৌরব পরিত্রাণকে স্থান দিক। যাই হোক, সেই কৌতূহল ও গৌরব দু'টোই নিজ নিজ কোলাহল স্তব্ধ করে দিক, না হয় শান্ত থাকুক। সেই মানদণ্ডের বিপক্ষে কিছুই না জানা মানে সবকিছু জানা।

এসো, এমনটা ধরে নিই যে ভ্রান্তমতপন্থীরা সত্যের শত্রু নয়, যার ফলে তাদের এড়াবার ব্যাপারে আগে থেকে আমাদের কোন ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি; আচ্ছা, যারা এখনও স্বীকার করছে তারা খুঁজছে, তেমন লোকদের সঙ্গে কেমন আচরণ অবলম্বন করা উচিত? কেননা ওরা যদি সত্যিকারে এখনও খুঁজছে, তাহলে নিশ্চিত হবার মত ওরা এখনও কিছুই পায়নি; সেজন্য ওরা ইতিমধ্যে যে বিষয়ে প্রাপ্ত বলে মনে হচ্ছে, তবু ওদের অবিরত খোঁজাখুঁজি দেখাচ্ছে যে, ওরা এখনও সন্দেহে মগ্ন। তাই তুমি যে সেই অবিরত অনুসন্ধানীর দিকে তাকিয়ে ওদের মত অবিরত খোঁজাখুঁজি করছ, সেই তুমি যে সন্দিগ্ধদের দ্বারা সন্দিগ্ধের মত, অনিশ্চিতদের দ্বারা অনিশ্চিতের মত, অন্ধদের দ্বারা অন্ধের মত গর্তে চালিত হবেই (খ) তা অনিবার্য।

কিন্তু, আমাদের ভোলাবার খাতিরে যখন ওরা এখনও খুঁজছে বলে ভান করছে যাতে একান্ত সহানুভূতি প্রদর্শনিতে আমাদের মধ্যে নিজেদের লেখাগুলো অনুপ্রবেশ করাতে

পারে, এক কথায়, আমাদের কাছে আসতে পেরে যখন ওরা সাথে সাথে সেইসব কিছু সমর্থন করে যা তাদের মতে অনুসন্ধানের বিষয়, তখন, ঠিক সেসময়ই, আমাদের ওদের এমনভাবে প্রতিবাদ করতে হবে যেন ওরা বুঝতে পারে যে, আমরা খ্রিষ্টকে নয়, ওদেরই অস্বীকার করছি। কেননা যেহেতু ওরা এখনও খুঁজছে সেজন্য এখনও কিছুই ধরে রাখছে না ; আর যেহেতু কিছুই ধরে রাখছে না সেজন্য ওরা এখনও কিছুই বিশ্বাস করেনি ; আর যেহেতু এখনও কিছুই বিশ্বাস করেনি সেজন্য ওরা খ্রিষ্টিয়ান নয়। আর যদিও ওরা কিছুটা ধরে রাখে ও বিশ্বাস করে, তবু ওরা নাকি বলে, সত্যসমর্থনের লক্ষ্যেই ওরা খুঁজতে থাকে। কিন্তু সত্যসমর্থন করার আগে, ওরা যা বিশ্বাস করে তা অস্বীকারই করে, যেহেতু এ স্বীকার করছে যে, যতক্ষণ ওরা খোঁজ করতে থাকে ততক্ষণ বিশ্বাস করছে না। তাই যারা নিজেদের কাছেও খ্রিষ্টিয়ান নয়, তখন তারা মহত্তর কারণে আমাদের কাছেও খ্রিষ্টিয়ান নয়। ওরা যে মিথ্যার মধ্য দিয়ে সত্যের কাছে এগিয়ে যায়, কোন্ বিশ্বাসের বিষয়ে তর্ক করছে? ওরা যে সত্যকে মিথ্যা দ্বারাই অনুপ্রবেশ করায়, কোন্ সত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করছে? অথচ ওরা শাস্ত্র সম্পর্কে কথা বলে ও শাস্ত্রের বচন উপস্থাপন করে। হ্যাঁ, ওরা তাই করে বৈকি, কেননা বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে ওরা বিশ্বাসের সূত্রগুলো ছাড়া অন্য কিছুই উপস্থাপন করতে পারে না।

১৫। ভ্রান্তমতপন্থীদের বিপক্ষে সংগ্রাম করা প্রয়োজন

এভাবে আমরা আমাদের বক্তব্যের আসল বিষয়বস্তুতে এসে পৌঁছেছি। কেননা ঠিক এ বিষয়ই ছিল আমাদের লক্ষ্য ও ঠিক এবিষয়ের জন্যই আমাদের আলোচনার ভূমিকা-পর্বে পূর্বপ্রস্তুতি করে নিচ্ছিলাম, যাতে করে, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা যা বিষয়ে আমাদের আহ্বান করে, আমরা এখন সেবিষয় সমষ্টিগত ভাবে উপস্থাপন করতে পারি। ওরা শাস্ত্রকে সামনে দাঁড় করায়, ও তেমন দুঃসাহসের মধ্য দিয়ে কোন না কোন ব্যক্তিকে প্রভাবান্বিত করে। তথাপি তেমন লড়াইতে ওরা বলিষ্ঠদের শ্রান্ত করে, দুর্বলকে ধরে, ও মাঝামাঝি রয়েছে যারা তাদের মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে তাদের বিদায় দেয়। তাই, সেই অনুসারে, আমরা ওদের সামনে বিশেষভাবে এ ধাপটাই দাঁড় করাচ্ছি, তথা আমরা শাস্ত্র সংক্রান্ত কোন আলোচনায় ওদের প্রবেশাধিকার দেব না।

যদি এতেই ওদের শক্তি থাকে, তাহলে ওরা সেটা হাতিয়ার করার আগে আমাদের এটাই স্পষ্টভাবে স্থির করা দরকার আছে, তথা শাস্ত্র বিষয়ক অধিকার কাদের মানায়, যাতে যাকে আদৌ মানায় না, সে যেন শাস্ত্রে প্রবেশাধিকার না পায়।

১৬। শাস্ত্রের বিষয়ে ভ্রান্তমতপন্থীদের অপব্যাখ্যা (১)

আমি আমার বক্তব্য যে নিজের ব্যাপারে অনাস্থার মনোভাবে বা লড়াইতে অন্যভাবে প্রবেশ করার চেষ্টায় উপস্থাপন করেছি, কথাটা বিচার্যই হত বটে যদি না একটা কারণ না থাকত, আর প্রকৃতপক্ষে কারণটা প্রথমত এ যে, আমাদের বিশ্বাস সেই প্রেরিতদূতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে বাধ্য যিনি তর্কাতর্কিতে প্রবেশ করতে, নবীন নবীন কণ্ঠের দিকে কান পেতে দিতে (ক), ও ভ্রান্তমতপন্থীকে তর্কাতর্কির পরে নয় বরং *একটামাত্র শাসনের পরেই তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে* (খ) বারণ করেন। শাসনকেই ভ্রান্তমতপন্থীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার কারণ বলে স্থির করায় তিনি তর্কাতর্কিটা বারণ করছেন। আর সেই শাসনটা একটাই হবে, কেননা সেই ভ্রান্তমতপন্থী খ্রিষ্টিয়ান নয়, যাতে এমনটা না মনে হয় যে, খ্রিষ্টিয়ানের রীতি অনুসারে তারও পক্ষে বারে বারে, এমনকি দু' তিনজন সাক্ষীর সামনেই (গ) তিরস্কারের পাত্র হওয়া দরকার; কেননা তাকে একারণেই শাস্তি দেওয়া দরকার যে, সে এমন একজন নয় যার সঙ্গে আমরা তর্কাতর্কি করতে বাধ্য, এবং দ্বিতীয় কারণটা খুবই স্পষ্ট, তথা শাস্ত্র সংক্রান্ত তর্কাতর্কিটা পেট বা মস্তিষ্ককে উলট পালট করা ছাড়া অন্য কাজে আসে না।

১৭। শাস্ত্রের বিষয়ে ভ্রান্তমতপন্থীদের অপব্যাখ্যা (২)

আচ্ছা, এ বিশিষ্ট ভ্রান্তমত কোন না কোন শাস্ত্রবাণী মানে না; আর যখন কোন একটা গ্রহণ করে তখন নিজের লক্ষ্য পূরণের খাতিরে সেটাকে যোগ ও বিয়োগের মাধ্যমে বিকৃত করে; আর শুধু তা নয়, সে যা কিছু গ্রহণ করে, তা পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রহণ করে না, আর যদিও কোন রকমে তা পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রহণ করে থাকে, তাসত্ত্বেও নানা বিরোধী ব্যাখ্যা প্রয়োগে সেটাকেও বিকৃত করে। অর্থ-বিকৃতি সত্যের ততখানি বিরোধিতা করে যতখানি পাঠ্য-বিকৃতি তার বিরোধিতা করে। তাদের অসার অনুমান যা

দ্বারা অস্বীকৃত, অবশ্যই তা মানতে অস্বীকার করে। ওরা সেই সমস্ত কিছুর উপর নির্ভর করে যা নিজেরা মিথ্যায় সঙ্কলন করেছে ও দ্ব্যর্থতার কারণেই বেছে নিয়েছে। শাস্ত্র বিষয়ে হে পরম বিজ্ঞ ব্যাখ্যাতা, তুমি কত দূরে যাবে যখন যা তুমি সমর্থন কর অপর পক্ষটা তা অস্বীকার করে, ও যা তুমি অস্বীকার কর ওরা তা সমর্থন করে? আর লড়াইতে গলা হারানো ছাড়া তুমি অন্য কিছুই হারাবে না; এবং ওদের ধর্মনিন্দা থেকে বিরক্তি লাভ করা ছাড়া অন্য কিছুতেই লাভবান হবে না।

১৮। ভ্রান্তমতপন্থীদের সঙ্গে তর্কাতর্কি বৃথা কাজ

সন্দেহে আক্রান্ত যে মানুষকে দৃঢ় করার লক্ষ্যে তুমি তার খাতিরে শাস্ত্র সংক্রান্ত আলোচনা করতে যাচ্ছ, সেই মানুষ যেই হোক না কেন, সে কি সত্য, নাকি ভ্রান্তমতের দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়বে? কেননা তেমনটা দেখে যে তোমার কোন অগ্রগতি হয়নি কিন্তু একইসময়ে এটাও লক্ষ ক'রে যে অপর পক্ষ অস্বীকার ও সমর্থন ক্ষেত্রে তোমার একই পর্যায়ে রয়েছে বা কমপক্ষে মোটামুটি সমান পর্যায়েই রয়েছে, সে, কোন্ পক্ষকে যে ভ্রান্তমতপন্থী বলে বিচার করতে হবে তা না জেনে সে সেই আলোচনা থেকে আরও অনিশ্চিত মনোভাবে চলে যাবে। কেননা এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ওরাও এসমস্ত কিছু আমাদের বিপক্ষে ফিরিয়ে দিতে পারে। এমনকি, যেহেতু ঠিক আমাদেরই মত ওরাও সত্য সমর্থন করে, সেজন্য এটি অনিবার্য যে, তারা বলবে, সেই শাস্ত্র-বিকৃতি ও মিথ্যা অপব্যাখ্যা আমাদেরই দ্বারা সাধিত অপকর্ম।

১৯। পবিত্র শাস্ত্র কাদের সম্পদ?

অতএব, আমাদের সমর্থন-পদ্ধতিকে শাস্ত্রমুখী করা চলবে না; তর্কাতর্কিও এমন বিষয়ে ভিত্তি করবে না যে বিষয়গুলোতে বিজয় হবে অসম্ভব বা অনিশ্চিত বা তত নিশ্চিত নয়। কিন্তু যদিও শাস্ত্র সংক্রান্ত আলোচনার ফলাফল পক্ষ দু'টোকে একই পর্যায়ে না দাঁড় করায়, তবু এ ব্যবস্থাই যুক্তিসঙ্গত হবে যে, সর্বপ্রথমে সেই বিষয় উপস্থাপন করা উচিত যা এখন আমাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয়, তথা, শাস্ত্রের অধিকারী যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস কাদের মানায়? যা দ্বারা মানুষ খ্রিষ্টিয়ান হয়ে ওঠে, সেই মানদণ্ড কার্ কাছ

থেকে ও কার্ দ্বারা, এবং কখন ও কার্ কাছে সম্প্রদান করা হয়েছে? কেননা যেখানে খ্রিষ্টীয় জীবনধারণের ও বিশ্বাসের সত্য প্রকাশিত হবে, সেখানে একইভাবে শাস্ত্রের, ব্যাখ্যার ও সমস্ত খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্যের সত্যও বিরাজ করবে।

২০। খ্রিষ্ট ও প্রেরিতদূতদের ভূমিকা

আমি যা বলতে উদ্যত হচ্ছি, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টযিশু নিজেই তা আমাকে বলতে দিন। তিনি যেই হোন, সেই ঈশ্বর যেই হোন তিনি যাঁর পুত্র, সেই সত্তা যাই হোক যা অনুসারে তিনি মানুষ ও ঈশ্বর, সেই বিশ্বাস যাই হোক যা বিষয়ে তিনি শিক্ষাগুরু, সেই পুরস্কার যাই হোক যা তিনি দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন, তিনি যতদিন পৃথিবীতে জীবনযাপন করলেন, ততদিন তিনি যে কি, তিনি কি ছিলেন, পিতার যে ইচ্ছার তিনি সেবা করছিলেন সেই ইচ্ছা কী, মানুষের সেই করণীয় যা তিনি স্থির করতে যাচ্ছিলেন সেই করণীয় কি—এ সমস্ত বিষয় তিনি জনগণের সামনে প্রকাশ্যে ও শিষ্যদের কাছে আলাদা ভাবেই প্রচার করে গেছিলেন। সেই শিষ্যদের মধ্য থেকে তিনি নিজের পাশে দাঁড়াবার জন্য প্রধান সেই বারোজনকে বেছে নিয়েছিলেন যাঁদের সর্বজাতির শিক্ষাগুরু পদে নিযুক্ত হবার কথা।

এজন্য, এঁদের একজন বিচ্যুত হলে পর তিনি পুনরুত্থানের পরে পিতার কাছে ফিরে যাওয়ার সময়ে বাকি এগারোজনকে এ আদেশ দিয়েছিলেন, তাঁরা গিয়ে যেন সকল জাতিকে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দিয়ে শিক্ষাদান করেন (ক)।

তাই, 'প্রেরিতদূত' নামে অভিহিত যাঁরা, তাঁরা, ইতস্তত না করে, দাউদের সামসঙ্গীতের ভাববাণীর অধিকার-সূত্রে যুদার জায়গায় গুলিবাঁট করে দ্বাদশতম হিসাবে মাথিয়াসকে গ্রহণ করে নিয়ে (খ) অলৌকিক কাজ ও বাণীপ্রচার সাধনের লক্ষ্যে পবিত্র আত্মার সেই প্রতিশ্রুত পরাক্রম পেলেন; এবং আগে, যুদেয়া জুড়ে যিশুখ্রিষ্টে বিশ্বাসের বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করার পর ও নানা মণ্ডলীকে স্থাপন করার পর তাঁরা বিশ্বজুড়ে বেরিয়ে পড়ে একই বিশ্বাসের একই শিক্ষা জাতিগুলির কাছে প্রচার করলেন।

পরে, একই প্রকারে, তাঁরা প্রতিটি শহরে কতগুলো মণ্ডলীকে স্থাপন করলেন। এ মণ্ডলীগুলির কাছ থেকেই অন্যান্য যত মণ্ডলী, একটার পর একটাই, প্রকৃত মণ্ডলী হবার

জন্য বিশ্বাস-পরম্পরা ও ধর্মতত্ত্বের বীজ গ্রহণ করে নিল ও আজও গ্রহণ করে থাকে। এজন্যই প্রৈরিতিক মণ্ডলীগুলির কন্যা-মণ্ডলী হওয়ায় এ সকল মণ্ডলীও প্রৈরিতিক বলে পরিগণিত হতে পারবে।

[নিজ নিজ শ্রেণি অনুসারে] শ্রেণিভুক্ত হবার জন্য প্রতিটি বস্তুকে নিজ নিজ মূল-উৎসে ফিরে যেতে হয়; তাই সেই অনুসারে এত সংখ্যক ও এত বিপুল মণ্ডলীর মধ্যে অনন্য মণ্ডলী হল সেই মণ্ডলী যা প্রথম হয়ে প্রেরিতদূতদের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল, ও যা থেকে অন্যগুলো নির্গত হয়। এভাবে সকল মণ্ডলী প্রথম মণ্ডলী ও সকল মণ্ডলী প্রৈরিতিক যেহেতু সবগুলো এক: তেমন ঐক্য শান্তি-সহভাগিতা, ভ্রাতৃত্ব-স্বীকৃতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা দ্বারা প্রমাণিত। আর এই সমস্ত বিশেষ অধিকারের মূলসূত্র হলো সেই একই সাক্রামেন্তের (গ) একমাত্র পরম্পরা।

২১। সমস্ত ধর্মতত্ত্ব মণ্ডলীতে প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়ে আগত

সেজন্যই আমরা এসমস্ত কিছু থেকেই [ভ্রান্তমতপন্থীদের সংক্রান্ত] আমাদের এই খারিজ-নির্দেশ লিখতে বসেছি। যেহেতু প্রভু যিশুখ্রিষ্ট প্রেরিতদূতদের প্রচার করতে পাঠিয়েছিলেন, সেজন্য, খ্রিষ্ট যাঁদের নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁরা ছাড়া অন্য কেউই প্রচারক হিসাবে গৃহীত হতে পারে না; কেননা *পিতাকে কেউ জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও সে-ই ছাড়া যার কাছে পুত্র নিজেই তাকে প্রকাশ করবেন* (ক)। পুত্র যা প্রকাশ করেছিলেন, ঠিক তা-ই প্রচার করতে যাঁদের পাঠিয়েছিলেন, তিনি যে সেই প্রেরিতদূতদের কাছে ছাড়া অন্য কারও কাছে পিতাকে প্রকাশ করেছিলেন এমনটা মনে হয় না। তবে, প্রেরিতদূতেরা যে কী প্রচার করেছিলেন, অর্থাৎ খ্রিষ্টই যে কী তাঁদের প্রকাশ করেছিলেন, তা (আর আমি একথাও নির্দেশ করতে বাধ্য) কেবল সেই মণ্ডলীগুলোর মাধ্যমেই প্রমাণিত হতে পারে যেগুলোকে প্রেরিতদূতেরা নিজেরা নিজেদের কণ্ঠে ও পরবর্তীকালে পত্রের মাধ্যমে (খ) বাণীপ্রচার করে স্থাপন করেছিলেন।

সুতরাং ব্যাপারটা তেমনটা হলে তবে সবদিক দিয়ে এ স্পষ্টই দাঁড়ায় যে, যে সকল ধর্মতত্ত্ব বিশ্বাসের উৎস এই প্রৈরিতিক মাতৃ-মণ্ডলীগুলোর সঙ্গে মিল রাখে, সেগুলোই সত্যাশ্রয়ী বলে গণিত হবার যোগ্য যেহেতু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সেগুলোতে

রয়েছে সেই সবকিছু যা তারা প্রেরিতদূতদের কাছ থেকে, প্রেরিতদূতেরা খ্রিষ্ট থেকে, খ্রিষ্ট ঈশ্বর থেকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। অপরদিকে যত ধর্মতত্ত্ব মণ্ডলীগুলোর, প্রেরিতদূতদের, খ্রিষ্টের ও ঈশ্বরের সত্যের বিরোধী স্বাদ বহন করে, সেই সমস্ত ধর্মতত্ত্ব সরাসরিই মিথ্যা বলে বিচারিত হওয়ার যোগ্য। তাই এখন এটাই বাকি রয়েছে যে, আমরা প্রমাণ দেব, যে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে আমরা উপরে মানদণ্ড দিয়েছিলাম, আমাদের এই ধর্মতত্ত্ব সত্যিকারে প্রেরিতদূতদের পরম্পরা থেকে উৎসারিত কিনা ও ঠিকই এর ফলে অন্যান্য ধর্মতত্ত্ব মিথ্যা থেকে উদ্গত কিনা। আমরা প্রৈরিতিক মণ্ডলীগুলোর সঙ্গে সহভাগিতা রাখি, কারণ আমাদের ধর্মতত্ত্ব সেই মণ্ডলীগুলোর ধর্মতত্ত্ব থেকে ভিন্ন নয়। এটিই সত্যের সাক্ষ্য।

২২। প্রৈরিতিক ধর্মতত্ত্বের গুরুত্ব

কিন্তু যেহেতু প্রমাণটা এতই কাছাকাছি যে, তা সাথে সাথে উপস্থাপন করলে তবে দেখাবার মত আর কিছুই থাকত না, তবে একথাও ধরে নিয়ে যে আমাদের পক্ষ থেকে আর কোন প্রমাণ দেওয়া হবে না, সেজন্য এসো, কিছুক্ষণের মত বিপক্ষদের স্থান দিয়ে দেখি যদি ওরা এমনটা ভাবে যে, ওরা এই খারিজ-নির্দেশ ব্যর্থ করার জন্য কোন না কোন উপায় পেতে পারে। সাধারণত ওরা নাকি বলে, প্রেরিতদূতেরা সবকিছু জানতেন না, কিন্তু এতে ওরা এমন উন্মাদনা দ্বারা প্রভাবান্বিত যার ফলে নিজেদের স্থানের বিপরীত স্থানে ফিরে এমনটা ঘোষণা করে যে, প্রেরিতদূতেরা অবশ্যই সবই জানতেন কিন্তু সেই সব কিছু সকলকে সম্প্রদান করেননি; উভয় ক্ষেত্রে ওরা দোষটা খ্রিষ্টের উপরেই চাপাচ্ছে এই কারণে যে, তিনি এমন প্রেরিতদূতদের প্রেরণ করেছিলেন যাঁরা হয় বেশি অজ্ঞ, না হয় বেশি সরল ছিলেন।

তবে, সঠিক মাথার কোন্ মানুষ এমনটা ধরে নিতে পারে যে, প্রভু যাঁদের শিক্ষাগুরু বলে নিযুক্ত করেছিলেন, যাঁদের তিনি নিজের সঙ্গে, নিজের শিষ্যত্বে, নিজের সাহচর্যে রেখেছিলেন, তিনি *একাকী হওয়ার সময়ে যাঁদের কাছে অস্পষ্ট সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিতেন* [ক], যাঁদের তিনি বলেছিলেন, এমন রহস্যগুলোকে তাঁদেরই বুঝতে দেওয়া হয়েছিল যা লোকদের বুঝতে দেওয়া হয়নি [খ], সেই তাঁরা কি সবকিছুতে অজ্ঞ ছিলেন?

যাঁকে এমন 'শৈল' নাম দেওয়া হয়েছিল, যে শৈলের উপরে মণ্ডলীকে গেঁথে তোলার কথা, যিনি স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি ও স্বর্গে ও পৃথিবীতে মুক্ত করার অধিকারও পেয়েছিলেন (গ), সেই পিতরের কাছে কি কোন কিছু গোপন রাখা হয়েছিল? প্রভু যাঁকে বেশি ভালবাসতেন, যিনি প্রভুর বুকের দিকে মাথা কাত করতেন, সেই একজনমাত্র যাঁকে প্রভু আগে থেকে যুদাকে বিশ্বাসঘাতক বলে নির্দিষ্ট করেছিলেন (ঘ), যাঁকে প্রভু মারীয়ার হাতে নিজের স্থানে ছেলে বলে সঁপে দিয়েছিলেন (ঙ), সেই যোহনেরও কাছে কি কোন কিছু গোপন রাখা হয়েছিল? আর যাঁদের কাছে তিনি মোশি ও এলিয়ের সঙ্গে নিজের গৌরব দেখিয়েছিলেন ও স্বর্গ থেকে পিতার সেই কণ্ঠস্বরও শুনিয়েছিলেন (চ), সেই তাঁদের তিনি কোন্ বিষয়ে অজ্ঞ রাখতে ইচ্ছা করেছিলেন? [কিন্তু তিনি কেবল তিনজনকেই সঙ্গে নিয়েছিলেন কেন?] তিনি যে বাকি সকলকে হেয়জ্ঞান করছিলেন এমন নয়, বরং একারণে যে, *তিনজন সাক্ষীর প্রমাণে প্রতিটি কথার নিষ্পত্তি হবে* (ছ)। একই প্রকারে, আমি মনে করি, তাঁরাও অজ্ঞ ছিলেন, যাঁদের কাছে, তাঁর পুনরুত্থানের পরেও, পথ চলতে চলতে, তিনি *শাস্ত্র বুঝিয়ে দিতে* (জ) প্রসন্ন হয়েছিলেন।

একদিন তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন: *তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে পার না।* তথাপি তিনি একথা বলে চলেছিলেন: *কিন্তু তিনি যখন আসবেন, সেই সত্যময় আত্মা, তিনিই পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন* (ঝ)। এতে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, সত্যময় আত্মার মাধ্যমে পূর্ণ সত্য পাবার প্রতিশ্রুতি যাঁদের দিয়েছিলেন, তাঁরা কোন বিষয়েই অজ্ঞ ছিলেন না। আর আসলে নিজের সেই প্রতিশ্রুতি তিনি পূরণ করেছিলেন, যেইভাবে প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে এ প্রমাণিত যে, পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন। আচ্ছা, যারা শাস্ত্র গ্রাহ্য করে না, যেহেতু তারা এখনও একথা স্বীকার করতে পারে না যে, পবিত্র আত্মাকে শিষ্যদের উপরে পাঠানো হয়নি, সেজন্য তারা পবিত্র আত্মারও নয়, এবং এ মণ্ডলী-দেহ কবে ও কেমন জন্ম-কাপড়ে জন্মেছিল এবিষয়ে প্রমাণ করার মত যাদের কোন উপায় নেই, তারা যে নিজেদেরই মণ্ডলী বলে দাবি করছে, তাও তারা সমর্থন করতে পারে না। ওরা যা কিছু সমর্থন করে থাকে, সেবিষয়ে কোন প্রমাণের অধিকারী না হওয়া ওদের

কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, পাছে সেই সবকিছুর সঙ্গে সেই সমস্ত অপব্যাখ্যাও ব্যক্ত হয় যা ওরা বিথ্যায় বানিয়ে থাকে।

২৩। প্রেরিতদূতেরা অজ্ঞ ছিলেন, ভ্রান্তমতপন্থীদের এ অভিযোগ সম্পর্কে

প্রেরিতদূতদের কোন না কোন অজ্ঞতার মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ওরা এবিষয় উপস্থাপন করে যে, পল পিতরকে ও তাঁর সঙ্গীদের ভর্ৎসনা করেছিলেন (ক)। ওরা নাকি বলে, 'অবশ্যই তাঁরা কোন না কোন কিছুতে অভাবী ছিলেন।' ওরা তেমনটা বলে যাতে এবিষয়ে ভিত্তি করে ওরা ওদের এই আর একটা বিষয় গেঁথে তুলতে পারে যে, পূর্ণতর জ্ঞান হয় তো তাঁদের উপরে পরেই নেমে এসেছিল যেইভাবে পলের বেলায় তখনই ঘটেছিল যখন তিনি তাঁদের ভর্ৎসনা করেছিলেন যাঁরা তাঁর পূর্বসূরী।

যারা প্রেরিতদের কার্যবিবরণী অগ্রাহ্য করে, আমি এখন তাদের বলতে পারি, 'আগে এমনটা দরকার আছে, তোমরা দেখাবে সেই পল কে, তিনি প্রেরিতদূত হবার আগে কী ছিলেন ও কেমন করে প্রেরিতদূত হয়েছিলেন'; কেননা অন্য নানা বিষয় ক্ষেত্রেও ওরা পলের কথা তুলে ধরে। তিনি যে নিজেই স্বীকার করেন, প্রেরিতদূত হবার আগে তিনি ছিলেন নির্যাতক (খ), বিশ্বাসী যে কেউ ব্যাপারটা পরীক্ষা করে, তার কাছেও তাঁর সেই কথা যথেষ্ট নয়, কেননা প্রভু নিজেও নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দেননি (গ)।

কিন্তু যখন ওরা শাস্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্বাস করে, তখন শাস্ত্র ছাড়াও বিশ্বাস করুক। কিন্তু তবুও, পল যে পিতরকে ভর্ৎসনা করেছিলেন ওদের এই অভিযোগের অবস্থা-পরিস্থিতি থেকে ওদের দেখানো উচিত যে, পিতর ও বাকি সকলে যে সুসমাচার আগে উপস্থাপন করেছিলেন, সেটার পাশাপাশি পল সুসমাচারের অন্য একটা রূপ যোগ করেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা হলো এ, যেহেতু তিনি নির্যাতক থেকে প্রচারকে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, সেজন্য তিনি ভাইদের দ্বারা ভাইদের কাছে, ভাইদের মধ্যে থেকে একজন ভাই বলেই চালিত হন, এমনকি তাদেরই কাছে তাদেরই দ্বারা চালিত হন যারা প্রেরিতদূতদের হাত থেকে বিশ্বাস পরিধান করেছিল। তারপর, যেইভাবে তিনি নিজে বিবরণ দেন, তিনি পিতরকে দেখবার জন্য যেরুশালেমে গিয়েছিলেন (ঘ), নিঃসন্দেহে তাঁর ভূমিকার ভিত্তিতে ও একই বিশ্বাস ও প্রচারকর্মের অধিকারগুণে গিয়েছিলেন। তবে,

যদি তাঁর প্রচারবাণী কোন রকমেও বিপরীত হত, তাহলে তিনি যে নির্যাতক থেকে প্রচারক হয়েছিলেন, তাতে তাঁরা অবশ্যই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হতেন না; তাছাড়া, পল যদি নিজেকে পিতরের প্রতিপক্ষ বলে উপস্থাপন করতেন, তাহলে এজন্য তাঁরা ঈশ্বরের গৌরবকীর্তনও করতেন না (ঙ)। তাঁরা বরং মনের মিলের ও সহভাগিতার চিহ্ন রূপে তাঁকে ডান হাত দিয়েছিলেন (চ) এবং নিজেদের মধ্যে সুসমাচারের বিচ্ছিন্নতা নয়, কর্ম-বণ্টনেরই ব্যবস্থা করেছিলেন, যাতে তাঁরা বিভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন সুসমাচার প্রচার না ক'রে বরং ভিন্ন ভিন্ন লোকদের কাছে একই সুসমাচার প্রচার করেন, তথা, পিতর পরিচ্ছেদিতদের কাছে, পল বিজাতীয়দের কাছে। তারপরে পিতরকে এজন্য ভর্ৎসনা করা হয়েছিল যে, তিনি বিজাতীয়দের সঙ্গে জীবনধারণ করার পর, কোন না কোন ব্যক্তির সম্মানার্থে তাদের সাহচর্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে শুরু করেছিলেন; দোষটা প্রচারকর্ম সংক্রান্ত নয়, অবশ্যই ভদ্রতা সংক্রান্ত। কেননা এ থেকে এমনটা দেখা গেল না যে তাঁর দ্বারা স্রষ্টা ছাড়া অন্য ঈশ্বর, বা মারীয়ার সন্তান ছাড়া অন্য খ্রিষ্ট, বা পুনরুত্থান ছাড়া অন্য প্রত্যাশা প্রচারিত হল।

২৪। পলের সেই শিক্ষাবাণী, যা খ্রিষ্টবিশ্বাস, সেসম্পর্কে

আমার এমন সৌভাগ্য হয়নি, আসলে আমার বলা উচিত, আমার এমন দুর্ভাগ্য হয়নি যে, আমি প্রেরিতদূতদের পরস্পর লড়াইতে আহ্বান করব। কিন্তু, যেহেতু সেই বিকৃত মনের মানুষেরা আগেকার ধর্মতত্ত্বকে সন্দেহমূলক বলে দেখাবার লক্ষ্যে উপরোল্লিখিত সেই ভর্ৎসনার ব্যাপারে বাধা দিচ্ছে, এজন্য কেমন যেন পিতরের সমর্থনেই এই উত্তর দেব যে, পলও বলেছিলেন যে, *সকলের কাছে তিনি সবকিছু হয়েছিলেন, ইহুদীদের কাছে ইহুদী*, ইহুদী-নয় যারা, তাদের কাছে ইহুদী-নয়, *যেন তিনি সকলকে জয় করতে পারেন* (ক)। অতএব, কাল, ব্যক্তি-বিশেষ ও কারণের খাতিরে ওরা এমন বিষয়গুলো ভর্ৎসনা করত যা, কাল, ব্যক্তি-বিশেষ ও কারণের খাতিরে নিজেরাই পালন করতে দ্বিধা করত না। [উদাহরণ যোগে,] কেমন যেন পিতরও পলকে ভর্ৎসনা করতেন যেহেতু পল পরিচ্ছেদন নিষেধ করা সত্ত্বেও নিজেই তিমথিকে পরিচ্ছেদিত

করিয়েছিলেন। দূর তারা যারা প্রেরিতদূতদের বিচার করে। এটি ভালো যে, সাক্ষ্যমরণে পিতর ও পল সমকক্ষ হয়ে উঠেছেন [খ]।

এদিকে, যদিও পল তৃতীয় স্বর্গেও উপনীত হয়ে ও পরমদেশে উন্নীত হয়ে [গ] সেখানে কিছু না কিছু শুনেছিলেন, তবু তেমনটা মনে হয় না যে, সেই সমস্ত কিছু এমন যা তাঁকে অন্য ধরনের ধর্মতত্ত্বের প্রশিক্ষক বলে চিহ্নিত করতে পারে, কেননা সেই সমস্ত কিছু এমন ধরনেরই ছিল যা কোন মানুষের উপকারে আসতে পারত না। আর সেই সমস্ত কিছু যা বিষয়ে আমি কিছু জানি না, তা যদি কারও কাছে জ্ঞাত হয়ে থাকে বা কোন ভ্রান্তমত যদি এমনটা বলে সেটা ঠিক সেই সমস্ত কিছুই অনুসরণ করছে, তাহলে, হয় পল সেই রহস্যকে ধরিয়ে দেওয়ার দায়ে দোষী হয়ে দাঁড়ান, না হয় অন্য এমন মানুষকে দেখাতে হবে যে মানুষ পরবর্তীকালে পরমদেশে উপনীত হয়েছিল ও তাকে সেই সমস্ত কিছু ব্যক্ত করতে দেওয়া হয়েছিল যা পলের পক্ষে উচ্চারণ করা উচিত ছিল না।

২৫। যিশুর যেমন ইচ্ছা, প্রেরিতদূতেরা সেই অনুসারেই সবই জানতেন

কিন্তু, আমি যেমন বলেছিলাম, সেই অনুসারে, এই যে সেই একই উন্মাদনা! কেননা ওরা এ স্বীকার করতে করতে যে, প্রেরিতদূতেরা কোনও বিষয়েই অজ্ঞ ছিলেন না ও পরস্পর বিরোধী কোনও ধর্মতত্ত্বও প্রচার করেননি, তবু এও স্বীকার করে যে, প্রেরিতদূতেরা সকল মানুষকে সবকিছু প্রকাশ করেননি, অর্থাৎ, কিছুটা তত্ত্ব ব্যক্ত করেছিলেন প্রকাশ্যে ও সবার কাছে, ও কিছুটা তত্ত্ব গোপনে ও অল্প কয়েকজনের কাছে; কারণ [ওরা নাকি বলে,] পল তিমথিকে উদ্দেশ করে একথাও ব্যবহার করেছিলেন, *হে তিমথি, সঞ্চয়টা রক্ষা কর* [ক], আরও, *সেই মূল্যবান সঞ্চয় পালন কর* [খ]। সঞ্চয়টা কী? সেটা কি উপযোগী এমন কিছু যা অন্য ধরনের ধর্মতত্ত্বকে চিহ্নিত করবে? নাকি সেটা সেই বিষয় সংক্রান্ত যা বিষয়ে তিনি বলেছিলেন, *সবকিছুর জীবনদাতা সেই ঈশ্বরের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে, এবং যিনি পন্তিউস পিলাতের সাক্ষাতে সেই উত্তম স্বীকারোক্তির বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, সেই খ্রিষ্টযিশুর সাক্ষাতে আমি তোমাকে এই আদেশ দিচ্ছি, তুমি আজ্ঞাটি রক্ষা কর* [গ]। আচ্ছা, সেই আজ্ঞা কী, ও সেই আদেশ কি? বচনটার আগের ও পরের কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, এবচনে অস্পষ্ট ও অন্য ধরনের কোন তত্ত্ব নিহিত নেই,

বরং তিমথি নিজে যা শুনেছিলেন, ঠিক তা-ই। অর্থাৎ, আমার মতে, উক্তি এ, *অনেক সাক্ষীর সাক্ষাতে* (ঘ)। আচ্ছা, সেই 'অনেক সাক্ষী' বলতে যে মণ্ডলীকে বোঝায়, ওরা যদি একথা অস্বীকার করে, তাতে অসুবিধা নেই, কেননা যা 'অনেক সাক্ষীর সাক্ষাতে' উচ্চারণ করা হয়েছিল তা অবশ্যই গোপন ছিল না। কিন্তু যা পল ইচ্ছা করেছিলেন তিমথি করবেন, তা এ ছিল, *তুমি এসব কিছু এমন বিশ্বস্ত লোকদের কাছে সম্প্রদান কর যারা অন্যান্যদেরও শিক্ষা দিতে উপযুক্ত* (ঙ), এই কথাও এমন যুক্তি সমর্থন করে না যার ভিত্তিতে কথাটাকে গোপন ও অন্য ধরনের সুসমাচার বলে ব্যাখ্যা করতে হবে। কেননা যখন তিনি 'এসব কিছু' বলছেন, তখন এমন কিছুর কথা বলছেন যা বিষয়ে সেসময়ে লিখছিলেন। কিন্তু তিনি যদি অস্পষ্ট বা গোপন কিছুর কথা বলতেন, তবে, বিষয়টা বর্তমান না হওয়ায়, তিনি, সেবিষয়ে পরিচিত একজনকে উদ্দেশ ক'রে সেটাকে 'এসব' নয়, 'সেইসব' বলেই চিহ্নিত করতেন।

২৬। প্রেরিতদূতেরা গোটা মণ্ডলীকে পূর্ণ সত্য বিষয়ে শিক্ষা দিলেন

এসবকিছুর পরবর্তী বিষয় হিসাবে এমনটা বলতে হত যে, যার উপরে তিনি সুসমাচার-সেবাকর্মের ভার আরোপ করছিলেন, তার জন্য তিনি এমন আদেশ যোগ করতেন যাতে, *মণিমুক্তা শূকরদের সামনে, ও যা পবিত্র তা কুকুরদের সামনে ফেলো না* (ক), প্রভুর এবচন অনুসারে সেবাকর্মটা সর্বস্থানে ও নির্বিচারে সম্পাদিত না হয়। এটা স্পষ্টই যে প্রভু কোনও গোপন রহস্যকে ইঙ্গিত না করে কথা বলছিলেন। তিনি নিজেই তো আদেশ করেছিলেন, তারা অন্ধকারে বা গোপনে যা কিছু শুনেছিল, তা যেন আলোতে ও ছাদের উপরে প্রচার করে (খ)। উপমার মধ্য দিয়ে তিনি এমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যাতে তাঁরা একটামাত্র মোহরও অর্থাৎ তাঁর নিজের একটামাত্র বাণীকেও গোপন স্থানে সুদ-ছাড়া না রাখেন (গ)। তিনি নিজে উপদেশ দিয়ে বলছিলেন যে, মোমবাতি সাধারণত ধামার নিচে ফেলা হয় না বরং দীপাধারের উপরেই রাখা হয় যাতে ঘরের সকলের জন্য আলো দেয় (ঘ)। তবে প্রেরিতদূতেরা আলোর অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণীর ও খ্রিষ্টরহস্যের কোনও কিছু লুকিয়ে রাখায় যদি তা পূরণ করে না থাকেন, এর কারণ হলো, হয় তাঁরা এসব কিছু অবহেলা করেছিলেন, না হয় কম বুঝেছিলেন। আমি এবিষয়ে নিশ্চিত যে,

তাঁরা কোন ইহুদী বা বিজাতীয় মানুষের সহিংসতা ভয় পেতেন না; তাই যাঁরা সমাজগৃহে ও গণস্থানে নীরব থাকতেন না, তাঁরা মহত্তর কারণেই মণ্ডলীতে প্রচার করতেন। এমনকি, তাঁরা যা ইচ্ছা করছিলেন ইহুদীরা ও বিজাতীয়রা বিশ্বাস করবে, তা যদি সূক্ষ্ম ভাবে উপস্থাপন না করতেন, তবে ইহুদীদের ধর্মান্তরিত করা ও বিজাতীয়দের আকর্ষণ করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হত। আরও মহত্তর কারণে তাঁরা বিশ্বাসী মণ্ডলীগুলোর কাছ থেকে কিছুই উঠিয়ে নেননি অল্পজনদের কাছে তা আলাদা ভাবে বিতরণ করার জন্য। আর যদিও এমনটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তাঁরা, বলতে গেলে, আপনজনদেরই মধ্যে সেই সমস্ত বিষয়ে কথা বলতেন, তবু এটা সম্ভব নয় যে, সেই কথাপোকথন এমন ছিল যা অন্য এমন বিশ্বাস-মানদণ্ড অনুপ্রবেশ করাবে যা, যেটা তাঁরা কাথলিক মণ্ডলীগুলোর মধ্যে প্রচার করছিলেন, তা সেটা থেকে ভিন্ন ও বিপরীত। তা এমনটা হত, তাঁরা কেমন যেন মণ্ডলীতে এক ঈশ্বরের, ও ঘরে অন্য এক ঈশ্বরের কথা বলতেন, প্রকাশ্যে খ্রিষ্টের এক সত্তা ও গোপনে অন্য এক সত্তা বর্ণনা করতেন, ও সকলের সামনে পুনরুত্থানের এক প্রত্যাশা ও অল্পজনদের সামনে অন্য এক প্রত্যাশা প্রচার করতেন; আর এসব কিছু করছিলেন যদিও নিজেদের পত্রগুলোতে এ অনুরোধ রাখছিলেন যেন সকলে একই কথা বলে ও মণ্ডলীর মধ্যে যেন কোন বিচ্ছেদ ও বিভেদ না থাকে [ঙ], কেননা, হয় পল, না হয় অন্যেরা, সবাই একই বিষয় প্রচার করতেন। তাছাড়া, তাঁরা যেন সুসমাচার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহার না করেন, সেজন্য একথা স্মরণ করছিলেন যে, *তোমাদের কথা এ-ই হোক: হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, না; কেননা এর অতিরিক্ত যা, তা সেই ধূর্তজন থেকেই আগত* [চ]।

২৭। প্রৈরিতিক পরম্পরা নিখুঁৎ ও অখণ্ডনীয়।

অতএব, যেহেতু এ অবিশ্বাস্য যে, যা প্রচার করার কথা, হয় প্রেরিতদূতেরা সেটার পূর্ণাঙ্গতা বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন, না হয় পুরো বিশ্বাস-মানদণ্ড ব্যক্ত করার ব্যাপারে তাঁরা অকৃতকার্য হলেন, সেজন্য এসো, একটু দেখি যদি প্রেরিতদূতেরা, হয় তো সরলভাবে ও পুরোভাবে, সেই সমস্ত কিছু প্রচার করতে করতে, প্রেরিতদূতেরা যা উপস্থাপন করেছিলেন, মণ্ডলীগুলো নিজেদের দোষে তা অন্যভাবে গ্রহণ করেছিল। তুমি দেখতে

পাবে, সন্দেহজনক এসমস্ত প্ররোচনা ভ্রান্তমতপন্থীদের দ্বারা উপস্থাপন করা হয়েছে। মণ্ডলীগুলো যে প্রেরিতদূত দ্বারা ভর্ৎসনা করা হয়েছিল, ওরা তা-ই মনে রাখে, তথা, *হে নির্বোধ গালাতীয়েরা, কেইবা তোমাদের জাদু করেছে?* (ক), আরও, *আহা, তোমরা সুন্দরভাবেই দৌড়োচ্ছিলে; কে তোমাদের বাধা দিল?* (খ), এমনকি পত্রের শুরুর একথা, *আমি এতে আশ্চর্যান্বিত যে, অনুগ্রহে যিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন, তোমরা এত শীঘ্রই তাঁকে ছেড়ে অন্য এক সুসমাচারের দিকে ফিরে গিয়েছ* (গ)। একই প্রকারে ওরা মনে রাখে সেই কথা যা করিন্থীয়দের কাছে লেখা হয়েছিল, অর্থাৎ তারা এখনও এমন মাংসময় মানুষ যাদের দুধ খাওয়ানো দরকার, যেহেতু তারা এখনও শক্ত মাংস সহ্য করতে অক্ষম (ঘ), এমনকি তারা মনে করত তারা কিছু জানে, যখন যেভাবে জানা উচিত সেইভাবে তারা এখনও কিছুই জানতে পারেনি (ঙ)। যখন ওরা এ অভিযোগ তোলে যে, মণ্ডলীগুলোকে ভর্ৎসনা করা হয়েছিল, তখন ওরা এটাও ধরে নিক যে, [সেই ভর্ৎসনার ফলে] মণ্ডলীগুলো নিজেদের অপরাধ মেনে নিয়ে নিজেদের শুদ্ধ করেছিল। ওরা সেই মণ্ডলীগুলোর কথাও মনে রাখুক, যাদের বিশ্বাস, জ্ঞান ও জীবনধারণ বিষয়ে প্রেরিতদূত আনন্দিত ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান, কেননা এ মণ্ডলীগুলো আজও সেই মণ্ডলীগুলোর সঙ্গে মিলিত যেগুলোকে এক ও একই বিশ্বাস-পরম্পরা বিষয়ে ভর্ৎসনা করা হয়েছিল।

২৮। সেই বিশ্বাস-পরম্পরা যা সর্বমণ্ডলীতে এক

তবে এটা মেনে নাও যে, সবাই ভ্রান্ত হয়েছিল। হ্যাঁ, সাক্ষ্যদানে প্রেরিতদূত ভ্রান্ত হয়েছিলেন, কোন মণ্ডলীকে সত্যে চালনার ব্যাপারে পবিত্র আত্ম সেই মণ্ডলীকে সম্মান দেখাননি যদিও তিনি ঠিক এলক্ষ্যেই খ্রিষ্ট দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন (ক) ও এলক্ষ্যে পিতার কাছে তাঁকে চাওয়া হয়েছিল তিনি যেন হন সত্যের শিক্ষাগুরু (খ); হ্যাঁ, ঈশ্বরের গৃহাধ্যক্ষ যিনি, খ্রিষ্টের প্রতিনিধি যিনি, তিনি নিজের কর্তব্য অবহেলা করেছিলেন, কারণ তিনি নিজে প্রেরিতদূতদের দ্বারা যা যা প্রচার করছিলেন, তিনি এমনটা দিয়েছিলেন, মণ্ডলীগুলো সময় সময় তা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বুঝবে। এ কি সম্ভব যে, ততগুলো ও তত বড় মণ্ডলী এক ও একই বিশ্বাস ক্ষেত্রে পথভ্রান্ত হবে? যখন বহু ঘটনার মধ্যে একটাও এক ও একই ফলাফল জন্মাতে পারে না, তখন এটাও আবশ্যক যে, মণ্ডলীগুলোতে

ধর্মতত্ত্ব ক্ষেত্রে একটা ভুল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাবে। তথাপি, যা কিছু অনেকের মধ্যে বিস্তৃত, তা যখন দেখা যায় তা এক ও একই, তখন তা ভ্রান্তির নয়, পরম্পরারই ফলাফল। অতএব, পরম্পরা সম্প্রদান করেছিলেন যাঁরা, তাঁরা যে ভ্রান্ত হয়েছিলেন, একথা বলবার মত কি দুঃসাহসী এমন কেউ থাকতে পারে?

২৯। সত্য ভ্রান্তমতপন্থীদের হাতে ন্যস্ত হয়নি

ভুলভ্রান্তি যেইভাবে দেখা দিল না কেন, তবু সেটা তত সময় সর্বত্র রাজত্ব করল যত সময় কোন ভ্রান্তমত ছিল না। মুক্তিলাভ করার জন্য সত্যকে কোন না কোন মার্কিওনপন্থী ও ভালেন্তিনুসপন্থীর অপেক্ষায় থাকতে হল। সেই সময়কাল ধরে সুসমাচার ভুলভাবেই প্রচারিত হচ্ছিল, মানুষ ভুলভাবে বিশ্বাস করছিল, সেই হাজার হাজার মানুষ ভুলভাবে অবগাহিত হচ্ছিল, ততখানি বিশ্বাস-কর্ম ভুলভাবে সম্পাদন করা হচ্ছিল, ততখানি পরাক্রম-কর্ম, ততখানি অনুগ্রহদান ভুলভাবে কার্যকর হচ্ছিল, ততখানি যাজনকর্ম, ততখানি সেবাকর্ম ভুলভাবে অনুশীলন করা হচ্ছিল, পরিশেষে, ততখানি সাক্ষ্যমর ভুলভাবে মাল্যভূষিত হচ্ছিলেন। অন্যথা, যদি ভুলভাবে ও উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে কিছুই করা হয়নি, তাহলে এ কেমন হতে পারে যে, ঈশ্বর সংক্রান্ত সেই সবকিছু তখনই গতিশীল হতে লাগল যখন সেই সবকিছু যে কোন্ ঈশ্বর সংক্রান্ত তা জানা ছিল না? এ কেমন হতে পারে যে, খ্রিষ্টকে খুঁজে পাবার আগেও খ্রিষ্টিয়ানেরা বিদ্যমান ছিল, ও সত্য ধর্মতত্ত্বের আগে ভ্রান্তমতগুলো বিদ্যমান ছিল? না, বরং যেমন সব ক্ষেত্রে সত্য নিজের প্রতিমূর্তির অগ্রবর্তী, তেমনি সাদৃশ্যটা বাস্তবতার পরবর্তী। তবু ভ্রান্তমত যে নিজের ধর্মতত্ত্বের আগে দেখা দিল, একথা যুক্তির বাইরে, একারণেও যে, ধর্মতত্ত্বই আগে থেকে বলেছিল এমন ভ্রান্তমতের উদ্ভব হবে যা বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। যে মণ্ডলী তেমন সত্যের অধিকারী ছিল, সেই মণ্ডলীর কাছে লেখা হয়েছিল (হ্যাঁ, ধর্মতত্ত্ব নিজেই নিজের মণ্ডলীর কাছে পত্র লিখছেন!), 'তোমাদের কাছে যে সুসমাচার আমরা প্রচার করেছি, যদিও স্বর্গ থেকে আগত কোন দূত সেটি ছাড়া অন্য সুসমাচার প্রচার করে, সে অভিশপ্ত হোক (ক)।

৩০। ভ্রান্তমতগুলো মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্বের পরেই অবির্ভূত হয়েছিল

তবে পন্তসের সেই সারেং, স্তোয়া-মতবাদের আগ্রহী ছাত্র সেই মার্কিওন সেসময় কোথায় ছিল? প্লেটো-মতপন্থী সেই ভালেন্তিনুস সেসময় কোথায় ছিল? কেননা এ স্পষ্ট যে, সেই লোকেরা তত দিন আগের মানুষ নয়, মোটামুটি আন্তনিনুসের রজত্বকালেরই মানুষ ছিল, এবং এটাও জানা কথা যে, ওরা আগে, ধন্য এলেউথেরুসের (ক) বিশপত্বে, রোম মণ্ডলীতে, ছিল কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাসী, যে পর্যন্ত ওদের অক্লান্তিকর কৌতূহলের কারণে একাধিকবার বিচ্যুত করা হয়েছিল। আর সেই মার্কিওন, যে দু'শ রুপোর টাকা মণ্ডলীতে এনেছিল, তা সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেছিল। অবশেষে চিরস্থায়ী বিচ্যুতিতে বিচ্যুত হয়ে ওরা নিজেদের ধর্মতত্ত্বসমূহের বিষ ছড়িয়ে দিয়েছিল। একথা সত্য যে, পরবর্তীকালে মার্কিওন অনুতাপ স্বীকার করে তাকে দেওয়া প্রায়শ্চিত্ত মেনে নিল, অর্থাৎ সে যে যে মানুষকে বিনাশের পথে আকর্ষণ করেছিল, সে তাদের সকলকে মণ্ডলীতে ফিরিয়ে আনলে তবেই পুনর্মিলন লাভ করবে; কিন্তু এতে মৃত্যু দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়েছিল।

বাস্তবিক ভ্রান্তমত যে দেখা দেবে তা আবশ্যকই ছিল (খ), কিন্তু ভ্রান্তমত আবশ্যক বলতে ভ্রান্তমত যে ভাল তা বোঝায় না, কেননা অনর্থ দেখা দেওয়াও আবশ্যক। এও আবশ্যক ছিল যে, প্রভুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে, কিন্তু সেই বিশ্বাসঘাতককে ধিক্ (গ)। তাই এক্ষেত্রেও কেউই যেন ভ্রান্তমতের পক্ষে কথা না বলে।

কিন্তু আপেল্লেসের বংশ সম্পর্কেও কিছু বলা দরকার আছে। তার শিক্ষক ও গঠনকারী মার্কিওনের তুলনায় সে প্রাচীন বিষয়গুলোর তত অনুগামী ছিল না; কিন্তু তবু একটা স্ত্রীলোকে পতিত হয়ে মার্কিওনের কৌমার্য-সমর্থন ত্যাগ ক'রে নিজের পবিত্রতম (ঘ) গুরুর দৃষ্টির আড়ালে আলেক্সান্দ্রিয়ায় আশ্রয় নেয়। কয়েক বছর পর সে সেখান থেকে ফিরে আসে, কিন্তু আগের চেয়ে ভাল নয়; শুধু এক্ষেত্রে তার উন্নতি হয় যে, সে মার্কিওনপন্থী আর নয়; বরং আর এক স্ত্রীলোকের সাথে, ইতিমধ্যে উপরোল্লিখিতা সেই কুমারী ফিলুমেনের সাথেই সে লেগে যায়; সেই যে ফিলুমেনে পরবর্তীকালে বিশাল বেশ্যা হয়ে ওঠার কথা। সেই ফিলুমেনের তেজে প্রভাবান্বিত হয়ে আপেল্লেস সেই 'প্রকাশিত বাক্য' রচনা করে যা সেই স্ত্রীলোক থেকে শিখেছিল। এখনও

কেউ না কেউ আছে যারা তাদের কথা স্মরণ করে, তথা তাদের প্রকৃত শিষ্য ও উত্তরসূরী, যার জন্য এমনটা বলা যায় না যে সেই দু'জনের একটা বংশ হয়নি। অথচ এরা সকলে তাদের নিজেদের কর্ম দ্বারা দণ্ডিত, সেইভাবে যেভাবে প্রভু বলেছিলেন। কেননা যেহেতু মার্কিওন নূতন নিয়ম পুরাতন নিয়ম থেকে বিযুক্ত করেছিল, সেজন্য সে যা বিযুক্ত করেছিল তা থেকে সে পরবর্তী, কেননা সে যা বিযুক্ত করেছিল, তা যদি আগে যুক্ত না হত, তবে সে তা বিযুক্ত করতে পারত না। সুতরাং বিযুক্তির আগে যুক্ত হওয়ায় সেটার পরবর্তী বিযুক্তিই প্রমাণিত করে যে, সেই বিযুক্তি যে সাধন করেছিল সেও পরবর্তীকালীন। একই প্রকারে ভালেন্তিনুস অপব্যাখ্যা করতে করতে ও নিঃসন্দেহে [শাস্ত্রের] পাঠ্যও পরিবর্তন করতে করতে পূর্ববর্তী ত্রুটির ভিত্তিতেই সেই পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, আর এতে সে প্রমাণ করে যে, সেই পুঁথিগুলো অন্য রকম ছিল।

আমরা এই সত্য-ভ্রষ্টকারীদের কথা উল্লেখ করেছি কারণ অন্যান্যদের তুলনায় এরাই ছিল সবচেয়ে নাম করা ও পরিচিত ব্যক্তি। তথাপি নিগিদিউস নামক একটা লোক, হের্মগেনেস [ঙ], ও আরও বেশ কয়েকজন রয়েছে যারা এখনও প্রভুর পথ বিকৃত করতে করতে ঘুরে বেড়ায়। ওরা আমাকে দেখিয়ে দিক কোন্ অধিকারের ভিত্তিতে ওরা বেরিয়ে গিয়েছে। ওরা যদি অন্য কোন ঈশ্বরকে প্রচার করে, তবে যাঁর বিরুদ্ধে ওরা প্রচার করে, কেমন করে ওরা সেই ঈশ্বরের বিষয়গুলো, লেখাগুলো ও নামগুলো ব্যবহার করে? কিন্তু তিনি একই ঈশ্বর হলে তবে কেমন করে ওরা তাঁকে অন্য রকম ভাবে ব্যবহার করে? ওরা নিজেরা যে প্রেরিতদূত, সেবিষয়ে প্রমাণ দিক। ওরা একথা মেনে নিক যে খ্রিষ্ট দ্বিতীয় বারের মত নেমে এসেছেন, দ্বিতীয় বারের মত নিজেই শিক্ষাদান করেছেন, দু' দুবার ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, দু' দুবার মারা গেছেন, দু' দুবার পুনরুত্থিত হয়েছেন। কেননা প্রেরিতদূতদের ব্যাপারে খ্রিষ্ট ঠিক এভাবেই ব্যবহার করে থাকেন, অর্থাৎ তিনি তাঁদের বিশেষভাবে এমন প্রতাপ দান করে থাকেন যা দ্বারা তাঁরা সেই একই চিহ্নকর্ম সাধন করবেন যা নিজেই সাধন করেছিলেন। আহা আমার কেমন ইচ্ছা, তাঁদের পরাক্রম-কর্মসমূহও দাঁড় করানো হোক; কিন্তু না, কেননা এ দ্বারা আমি ওদের সেই সবচেয়ে বড় শক্তি মেনে নিতাম যা দ্বারা ওরা প্রেরিতদূতদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। কেননা প্রেরিতদূতেরা মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করতেন, এরা জীবিতদের মৃত্যুর হাতে তুলে দেয়।

৩১। উত্তম বীজের উপমা

তথাপি আমাকে পার্শ্ববর্তী এ বিষয়ে থেকে, সত্য যে মিথ্যার পূর্ববর্তী ও মিথ্যা যে সত্যের পরবর্তী বিষয়টায় ফিরে আসতে দেওয়া হোক। আমার বক্তব্যের পক্ষসমর্থনে সেই উপমা-কাহিনী থেকেও যুক্তি যোগাব যা সবকিছুর আগে গমের সেই উত্তম বীজ উপস্থাপন করে যা প্রভু দ্বারা বোনা হয়েছিল, কিন্তু পরে ফসলের সেই ভেজাল হাজির করায় যা শত্রু সেই দিয়াবল দ্বারা অনর্থক শ্যামাঘাস বোনায় সাধিত হয়েছিল। কারণ এ উপমা উপযুক্ত ভাবে ধর্মতত্ত্বগুলোর পার্থক্য তুলে ধরে, কেননা অন্যত্রও প্রভুর বাণীকে বীজের সঙ্গে তুলনা করা হয় (ক)। সুতরাং, বর্ণনাগুলোর খোদ অনুক্রম থেকে এ স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, যা কিছু প্রথম বোনা হয়েছিল তা প্রভুরই ও সত্য, অপরদিকে যা কিছু পরে অনুপ্রবেশ করানো হয়েছিল তা বহিরাগত ও মিথ্যা। এই রায় পরবর্তীকালীন সেই সমস্ত ভ্রান্তমতের বিপক্ষেও দাঁড়াবে যেগুলো নিজ নিজ পক্ষে সত্যকে দাবি করার মত অভ্যন্তরে কোন সংগতি রাখে না।

৩২। ভ্রান্তমতগুলো প্রৈরিতিক ধারাবাহিকতা থেকে নির্গত নয়।

তাছাড়া, এমন ভ্রান্তমত যদি থাকে যা দুঃসাহস ক'রে প্রৈরিতিক কালেই নিজেকে অনুপ্রবিষ্ট করে যাতে এদ্বারা এমনটা মনে হতে পারে যে, প্রেরিতদূতদের সময়ে উপস্থিত ছিল বিধায়ই সেটা প্রেরিতদূতদের দ্বারা সম্প্রদান করা হয়েছে, তাহলে আমরা বলতে পারি, সেগুলো নিজেদের মণ্ডলীগুলোর উৎস দেখিয়ে দিক, আদি থেকে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ধাপে ধাপে বেয়ে বেয়ে একাল পর্যন্ত নেমে এসে নিজ নিজ বিশপ-ক্রমন্বয় এমন ভাবে ব্যক্ত করুক যাতে করে তাদের প্রথম বিশপ প্রেরিতদূতদের বা প্রৈরিতিক ব্যক্তিত্বসমূহের একজনকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠাতা বা পূর্বসূরী বলে দেখাতে পারেন, কিন্তু এমন একজনকে চাই যিনি প্রেরিতদূতদের সঙ্গে একমত হয়ে থাকলেন। কেননা এভাবেই প্রৈরিতিক মণ্ডলীগুলো নিজ নিজ বিশপগণনা হস্তান্তরিত করে থাকে; যেমন সেই স্মির্না মণ্ডলী যা একথা উল্লেখ করে যে, পলিকার্প যোহন দ্বারা নিযুক্ত হয়েছিলেন; যেমন সেই রোম মণ্ডলীও যার কথা অনুসারে ক্লেমেণ্টকে পিতর দ্বারা বিশপপদে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছিল (ক)। আর ঠিক এইভাবে বাকি যত মণ্ডলীও সেইমত নিজ নিজ

আদিবিশপ হিসাবে এমন একজনকে উপস্থাপন করে যিনি প্রেরিতদূতদের দ্বারা বিশপপদে নিযুক্ত হয়েছেন বিধায় তারা তাঁকে প্রৈরিতিক বীজের হস্তান্তরকারী বলে গণ্য করে।

ভ্রান্তমতপন্থীরা তেমন কিছু তৈরি করুক। কেননা ধর্মনিন্দা করার পর চেষ্টা করার মত বিধানবিরুদ্ধ আর এমন কি কাজ ওদের আছে? কিন্তু তেমনটা সাধন করলেও ওরা এক ধাপেও এগোবে না; কেননা প্রেরিতদূতদের ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে নিজেদের ধর্মতত্ত্বকে মেলাবার পর সেই ধর্মতত্ত্ব নিজেই নিজের বিভিন্নতা ও বৈপরীত্ব দ্বারা ওদের ঘোষণা করবে, কোনও প্রেরিতদূত ও কোনও প্রৈরিতিক ব্যক্তিত্ব সেটার উদ্ভাবক নন; কেননা, যেমন প্রেরিতদূতেরা এমনটা শেখাতেন না যা পরস্পর বিরোধী, তেমনি প্রৈরিতিক ব্যক্তিত্বগণও এমন ধর্মশিক্ষা ব্যক্ত করতেন না যা প্রেরিতদূতদের শিক্ষা থেকে ভিন্ন, যদি না প্রেরিতদূতদের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন যাঁরা, তাঁরা বিপরীত কিছু প্রচার করতেন। সুতরাং সেই মণ্ডলীগুলো দ্বারা ওদের তেমন পরীক্ষার অধীন করা হবে, যে মণ্ডলীগুলো নিজ নিজ প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে কোনও প্রেরিতদূতকে বা প্রৈরিতিক কোন ব্যক্তিত্বকে উপস্থাপন করে না (যেহেতু সেই মণ্ডলীগুলো অনেক দিন পরের মণ্ডলী, হ্যাঁ, বাস্তব ক্ষেত্রে মণ্ডলীগুলোকে দিনে দিনেই স্থাপন করা হচ্ছে), তবু এক-ই বিশ্বাসে একমত হওয়ায় সেই মণ্ডলীগুলো ধর্মতত্ত্বে কেমন যেন সমরক্তেরই ভিত্তিতে কম প্রৈরিতিক বলে পরিগণিত নয়।

অতএব, আমাদের প্রৈরিতিক মণ্ডলীর এপরীক্ষা দু'টো যাচাইকৃত হয়ে এসমস্ত ভ্রান্তমত প্রমাণ দিক, কেমন করে তারা নিজেদের প্রৈরিতিক বলে গণ্য করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা প্রৈরিতিকও নয়, ও তারা যা নয়, তেমনটাও তারা প্রমাণ করতে পারে না। তাছাড়া, যে মণ্ডলীগুলো কোন ক্ষেত্রে প্রেরিতদূতদের সঙ্গে সংযুক্ত, তেমন মণ্ডলীগুলো দ্বারা ওরা শান্তি ও সহভাগিতার বন্ধনে গৃহীত নয়, যেহেতু সাক্রামেন্তের (খ) বিভিন্নতার কারণে ওরা কোন ক্ষেত্রেই প্রৈরিতিক নয়।

৩৩। বর্তমানকালীন ভ্রান্তমত সম্পর্কে

এসমস্ত কিছু বাদে আমি এখন সেই ধর্মতত্ত্বগুলো সম্পর্কে একটা মূল্যায়ন উপস্থাপন করতে যাচ্ছি, যেগুলো প্রেরিতদূতদের আমলে বর্তমান ছিল বিধায় সেই প্রেরিতদূতদের দ্বারা অনাবৃত ও নিন্দিত হয়েছিল। কেননা এভাবে সেগুলো, একবার যখন দেখানো হবে যে, সেসময়ও সেগুলো বর্তমান ছিল, কিংবা ছিল সেকালেরও বর্তমান ভুলভ্রান্তির চারা, তখন আরও সহজে নিন্দার বস্তু হবে।

করিন্থীয়দের কাছে পত্রে পল এমন কয়েকজনকে চিহ্নিত করেন যারা পুনরুত্থানের কথা অস্বীকার করছিল বা সেবিষয়ে সন্দেহ ছড়াচ্ছিল (ক)। তেমন মনোভাব সাদ্দুকীদেরই বিশিষ্ট মনোভাব ছিল। তথাপি সেটার একটা অংশকে দখল করেছিল সেই মার্কিওন, আপেল্লেস, ভালেন্তিনুস ও সেই অন্যান্যরা যারা মাংসের পুনরুত্থান লঙ্ঘন করত (খ)। গালাতীয়দের কাছেও লিখতে গিয়ে পল তাদের নিন্দা করেন যারা পরিচ্ছেদন ও [মোশির] বিধান পালন করছিল ও সমর্থন করছিল: হেবিওনের ভ্রান্তমত ঠিক তা-ই। তিমথিকে পরামর্শ দিতে গিয়ে পল, যারা বিবাহ নিষেধ করছিল (গ), তাদেরও ভর্ৎসনা করেন: আচ্ছা, মার্কিওন ও তার অনুগামী সেই আপেল্লেস ঠিক তা-ই সমর্থন করেছিল। একই প্রকারে পল তাদেরও আক্রমণ করেন যারা বলছিল, পুনরুত্থান ইতিমধ্যে ঘটেছে (ঘ); কথাটা ভালেন্তিনুসপন্থীরাও নিজস্ব ধারণা বলে সমর্থন করেছিল। আর যখন পল সেই *সীমাহীন বংশতালিকা* (ঙ) এর কথা উল্লেখ করেন, তখন সেই ভালেন্তিনুসের পরিচয় পাওয়া যায় যার মতে নতুন নাম-বিশিষ্ট, এমনকি কেবল এক নামও-বিশিষ্ট নয় একটা এওন (চ) (সেই এওন যেই হোক না কেন) নিজের কৃপা থেকে অনুভূতি ও সত্য জনিত করে; এবং এই অনুভূতি ও এই সত্য একইভাবে নিজ নিজ থেকে সেই বাণী ও জীবন উৎপন্ন করে, যেগুলো মানব ও মণ্ডলীকে জনিত করে। তেমন প্রাথমিক অষ্টক থেকে আরও দশটা এওন নির্গত হয়, এবং শেষে বাকি বারোটারও উদ্ভব হয় যেগুলো অপরূপ নামের অধিকারী: এতে সেই ত্রিশ এওন সংক্রান্ত রূপকথার সমাপ্তি। আর যারা আদীম শক্তিগুলোর সেবা করে (ছ), তাদের তেমন মনোভাব অগ্রাহ্য ক'রে একই প্রেরিতদূত হের্মগেনেসের কয়েকটা অভিমত দেখান, সেই যে হের্মগেনেস জড়বস্তু যে অ-সঞ্জাত তেমন ধারণা অনুপ্রবেশ করিয়ে তা অ-সঞ্জাত ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করে, আর

এভাবে উপাদানগুলোর মাতাকে ঐশ্বরিক পর্যায়ে উন্নীত ক'রে সে তারই সেবা করতে পারে যাকে সে ঈশ্বরের সমতুল্য করে।

এদিকে যোহন ঐশপ্রকাশ পুস্তকে আদেশ করেন, যারা প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্য খায় ও ব্যভিচার করে, তাদের যেন শাস্তি দেওয়া হয় (জ)। তাছাড়া এখনও অন্য রকম নিকোলাসপন্থীরা রয়েছে; তাদের 'গায়ানা ভ্রান্তমত'(ঝ) বলা হয়। কিন্তু আপন পত্রে তিনি বিশেষভাবে তাদেরই খ্রিষ্টবৈরী বলে চিহ্নিত করেন যারা অস্বীকার করছিল খ্রিষ্ট মাংসে এসেছিলেন ও যারা এমনটা মনে করছিল না যে, যিশু স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র (ঞ); প্রথম অভিমতটা মার্কিওন দ্বারা, ও দ্বিতীয় অভিমতটা হেবিওন দ্বারা সমর্থন করা হয়েছিল। কিন্তু শিমোনের যে জাদুবিদ্যা স্বর্গদূত-পূজাকে উপস্থাপন করছিল, তা প্রকৃতপক্ষে প্রতিমাপূজা পালনকারীদের মধ্যে পরিগণিত ছিল ও প্রেরিতদূত পিতর দ্বারা সেই শিমোনেই নিন্দিত হয়েছিল (ট)।

৩৪। প্রৈরিতিক কালের ভ্রান্তমতসমূহ সম্পর্কে

আমার মতে এগুলোই নানা জাতের সেই বিকৃত ধর্মতত্ত্বগুলো যেগুলো সম্পর্কে আমরা প্রেরিতদূতদের নিজেদেরই কাছ থেকে শিখেছি যে, সেগুলো প্রেরিতদূতদের আমলে বিদ্যমান ছিল। তাসত্ত্বেও ততগুলো জঘন্য বিচ্ছিন্নতার মধ্যে এমন একটাও পাই না যা নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা হিসাবে ঈশ্বর সম্পর্কে বিবাদ সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয় এক ঈশ্বরকে অনুমান করার মত দুঃসাহসী কেউই ছিল না। পিতার চেয়ে পুত্রেরই সম্পর্কে সন্দেহ আরও সহজে জেগে উঠত, সেপর্যন্ত যেপর্যন্ত সেই মার্কিওন স্রষ্টাকে ছাড়া অন্য এমন ঈশ্বরকে অনুপ্রবেশ করাল যিনি কেবল মঙ্গলময়তারই ঈশ্বর। আপেল্লেস স্রষ্টা ও বিধানের ও ইস্রায়েলের ঈশ্বর হিসাবে অনির্দিষ্ট এমন একটা দূতকে করেছিল যে দূত মহত্তর এক ঈশ্বরের গৌরবময় দূত; সে নাকি বলছিল, সেই ঈশ্বর ছিলেন অগ্নিময়। ভালেন্তিনুস তার সেই এওনগুলো ছড়িয়ে দিল, ও একটামাত্র এওনের পাপকে স্রষ্টা ঈশ্বরের উৎপত্তির মূলকারণ বলে চিহ্নিত করল।

সেই এওনগুলোর কাছে ছাড়া ও এগুলোর আগে অন্য কারও কাছেও ঈশ্বরত্বের সত্য প্রকাশিত হয়নি, আর এগুলো অবশ্যই সেই দিয়াবলের কাছ থেকে বিশেষ সম্মান ও

পূর্ণতর মর্যাদা প্রাপ্ত হলো, সেই যে দিয়াবল এতেও ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে ইচ্ছুক ছিল যাতে ধর্মতত্ত্বগুলোর বিষের মাধ্যমে সে তা নিজেই করতে পারে যা ঈশ্বর বলেছিলেন তা করা যায় না, তথা, গুরুর চেয়ে শিষ্যদেরই বড় করা (ক)। সেজন্য সমস্ত ভ্রান্তমত নিজেদের জন্য সেই কাল বেছে নিক যেকালে নিজেরা দেখা দেবে; কিন্তু সেই কাল তত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয় যেহেতু সেই ধর্মতত্ত্বগুলো সত্য থেকে উদ্গত নয়, এবং প্রেরিতদূতদের আমলে যা যা ছিল না, তা এখনও প্রেরিতদূতদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে না। কেননা যদি সেগুলো সত্যিই [প্রেরিতদূতদের আমলে] বিদ্যমান হয়ে থাকত, তাহলে সেগুলোর নাম এখনও পরিচিত হত যাতে সেগুলোকে দমনও করা যেতে পারত। বাস্তবিকই, যে ভ্রান্তমতগুলো প্রেরিতদূতদের আমলে বিদ্যমান ছিল, এক একটার নাম উল্লেখ করা মাত্রই সেগুলো নিন্দিত হয়। তাই যদি এমনটা হয় যে, যে ভ্রান্তমতগুলো প্রেরিতদূতদের আমলে রূঢ় অবস্থায় বিদ্যমান ছিল, সেগুলো আজ মার্জিত অবস্থায়ই বিদ্যমান, তাহলে সেগুলো ঠিক একারণেই নিন্দার বস্তু। আর যদি এমনটা হয় যে সেগুলো অন্যই ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরে উদ্গত হলো, ও সেগুলো থেকে কেবল কিছুটা কিছুটা ধারণ করে নিল, তাহলে আগেকারগুলোর সঙ্গে শিক্ষাদানের ব্যাপারে একমত হওয়ায় অবশ্যই একই নিন্দার অংশী হবে, উপরে উল্লিখিত সেই পরবর্তী-নির্দেশক নিয়মের ভিত্তিতে (খ), যা অনুসারে যদিও সেগুলো দণ্ডিত ধর্মতত্ত্বের যেকোন সহভাগিতা থেকে মুক্ত, তবু কালের ভিত্তিতেই ইতিমধ্যে বিচারিত হত, যেহেতু প্রেরিতদূতদেরও দ্বারা উল্লিখিত না হওয়ায় মহত্তর কারণে বিকৃত। এ থেকে এমনটা আরও দৃঢ়তর হয়ে উঠে যে, এগুলোই সেই ভ্রান্তমত যা সেকাল থেকেও দেখা দেবে বলে পূর্বঘোষিত হয়েছিল।

৩৫। ভ্রান্তমতে সত্যের বীজ থাকতে পারে না

উল্লিখিত বর্ণনা অনুসারে আমাদের দ্বারা প্ররোচিত ও নিন্দিত হয়ে সমস্ত ভ্রান্তমত, আর সেই ভ্রান্তমতগুলো প্রেরিতদূতদের পরবর্তীকালীন বা সমকালীন হোক, কিন্তু সেগুলো থেকে ভিন্নই হোক, ও সাধারণ বা বিশিষ্ট নিন্দার ভিত্তিতে পূর্বদণ্ডিত হোক, হ্যাঁ, সমস্ত ভ্রান্তমত দুঃসাহস দেখিয়ে একই ধরনের খারিজ-নির্দেশ উপস্থাপন করায় আমাদের

ধর্মশিক্ষার বিরুদ্ধ প্রতিবাদ করুক। কেননা, যখন ওরা আমাদের ধর্মতত্ত্বের সত্য অস্বীকার করে, তখন ওদের এও দেখাতে হবে যে, যে নিয়ম দ্বারা ওদের ভ্রান্তমত খণ্ডন করা হলো, আমাদের ধর্মতত্ত্বও এমন ভ্রান্তমত যা একই নিয়ম দ্বারা খণ্ডন করা যায়। এবং একই সময়ে ওদের দেখাতে হবে, যে সত্য ওদের কাছে নেই, আমাদের কোথায় সেই সত্যের সন্ধান করতে হবে: এ এমন বিষয় যা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

কালের দিক দিয়ে, আমাদের বিষয়টা পরবর্তীকালীন নয়, বরং সবগুলোর চেয়ে পূর্ববর্তী; এবং এবিষয়টাই হয়ে উঠবে সেই সত্যের সাক্ষ্য, সেই যে সত্য সর্বস্থানে প্রথম স্থানের অধিকারী। আরও, প্রেরিতদূতেরা কোথাও সত্যকে দণ্ডিত করেন না; না, তাঁরা বরং সেটার পক্ষেই দাঁড়ান; এতে প্রমাণিত হবে যে, প্রেরিতদূতেরাই সেই সত্যের অধিকারী। কেননা যখন তাঁরা যেকোন অদ্ভুত ধারণা দণ্ডিত করেছিলেন, তখন যে ধর্মতত্ত্ব তাঁরা দণ্ডিত করেন না, এতে তাঁরা দেখান সেটা তাঁদেরই, ও সেইজন্য সেটার পক্ষে দাঁড়ান।

৩৬। প্রৈরিতিক মণ্ডলীগুলো প্রেরিতদূতদের নিজেদের কণ্ঠ

তবে, নিজের পরিত্রাণের ব্যাপারে শ্রেয়তর কৌতূহল অনুশীলন করতে ইচ্ছুক যে তুমি, সেই তুমি এসো, সেই প্রৈরিতিক মণ্ডলীগুলোকে মূল্যায়ন কর যেগুলোতে প্রেরিতদূতদের স্বকীয় আসন নিজ নিজ স্থানে এখনও প্রাধান্যের অধিকারী, যেগুলোতে তাঁদের সেই প্রামাণিক লেখাগুলো এখনও পাঠ করা হচ্ছে, যা তাঁদের প্রত্যেকেরই কণ্ঠ ধ্বনিত করছে ও প্রত্যেকেরই মুখমণ্ডল প্রদর্শন করছে। সেই আখাইয়া প্রদেশ তোমার কাছাকাছি আছে: আচ্ছা, সেখানে তোমার জন্য আছে করিন্থ; তুমি মাকিদনিয়া থেকে বেশি দূরে না থাকলে, তবে তোমার জন্য আছে ফিলিপ্পি, আবার তোমার জন্য আছে সেই থেসালোনিকীয়েরা। তুমি এশিয়ায় (ক) পার হতে পারলে তবে তোমার জন্য আছে এফেসস; আর তুমি ইতালির কাছাকাছি থাকলে তবে তোমার জন্য আছে সেই রোম যা থেকে আমাদের হাতে প্রৈরিতিক অধিকার আগত। আহা, কেমন সুখী এই মণ্ডলী যেখানে প্রেরিতদূতেরা নিজেদের রক্তের সঙ্গে নিজেদের ধর্মতত্ত্ব ক্ষরিত করেছিলেন, যেখানে পিতর প্রভুর যন্ত্রণাভোগের সমকক্ষতা অর্জন করেন, যেখানে পল [বাপ্তিস্মদাতা]

যোহনের সদৃশ মৃত্যুতে মাল্যভূষিত হন, যেখানে যোহন ফুটন্ত তেলে নিমজ্জিত হওয়ার পর কিছুতেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে সেই দ্বীপে প্রবাসিত হন (খ)।

এসো, দেখি সেই রোম কী শিখেছে, কী শিখিয়ে দিয়েছে, আফ্রিকার মণ্ডলীগুলোর সঙ্গেও কেমন সহভাগিতা অর্জন করেছে। এই মণ্ডলী বিশ্বস্রষ্টা এক-প্রভু ঈশ্বরকে ও কুমারী মারীয়া থেকে সঞ্জাত স্রষ্টা ঈশ্বরের পুত্র সেই খ্রিষ্টযিশুকে ও মাংসের পুনরুত্থান স্বীকার করে; সুসমাচার-রচয়িতাদের ও প্রেরিতদূতদের লেখাগুলোর সঙ্গে সে একক পুস্তকে বিধান ও নবীদের মিলিত করেন যা থেকে সে বিশ্বাস পান করে। সেই বিশ্বাসকে সে [বাপ্তিস্মের] জল দ্বারা সীলমোহরযুক্ত করে, পবিত্র আত্মা দ্বারা অলঙ্কৃত করে, এউখারিস্তিয়া দ্বারা পুষ্ট করে, সাক্ষ্যমরণের উদ্দেশে আহ্বান করে, আর এভাবে এমন কাউকেই গ্রহণ করে নেয় না যে এই ব্যবস্থার বিরোধী। এই সেই ব্যবস্থা যা বিষয়ে আমি আর বলব না সেটা ভাবী ভ্রান্তমতের কথা পূর্বঘোষণা করেছিল, বরং বলব, সেই ব্যবস্থা যা থেকে ভ্রান্তমতসমূহ বেরিয়ে এসেছিল; কিন্তু তবুও সেগুলো এ ব্যবস্থারই ছিল না, কেননা সেগুলো এব্যবস্থার বিরোধী। টক বন্য-জলপাইগাছও মিষ্টি সমৃদ্ধ ও খাঁটি জলপাইগাছের বীজ থেকে উৎপন্ন হয়; কোমল ও মিষ্টতম ডুমুরগাছের বীজ থেকেও অসার ও অকেজো বন্য-ডুমুরগাছ গজিয়ে ওঠে। তেমনি ভ্রান্তমতগুলোও আমাদের গাছ থেকে উৎপন্ন, যদিও সেগুলো আমাদের জাতের নয়; সেগুলো সত্যের দানা থেকেই উৎপন্ন, কিন্তু মিথ্যা হওয়ায় কেবল বন্য পাতা ফলায়।

৩৭। ভ্রান্তমতপন্থীরা খ্রিষ্টিয়ান নয়।

ব্যাপারটা তেমনটা হলে তবে সত্য এই আমাদেরই বলে সাব্যস্ত করা হোক যারা এক একজন [বিশ্বাসের] সেই মানদণ্ড অনুসারে চলি যা মণ্ডলী প্রেরিতদূতদের কাছ থেকে, প্রেরিতদূতেরা খ্রিষ্টের কাছ থেকে ও খ্রিষ্ট ঈশ্বরের কাছ থেকে সম্প্রদান করেছেন, সেজন্য আমাদের অবস্থার যুক্তি সুস্পষ্ট, বিশেষভাবে তখন যখন সেটা স্থির করে, ভ্রান্তমতপন্থীদের শাস্ত্র সংক্রান্ত কোন তর্কাতর্কিতে যোগ দিতে দেওয়া উচিত নয় যেহেতু আমরা শাস্ত্রকে হাতিয়ার না করেও প্রমাণ করি যে, শাস্ত্রের প্রতি ওদের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা ওরা যখন ভ্রান্তমতপন্থী, তখন প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ান হতে পারে না, আর যেহেতু

নিজেদের পছন্দমত যা অনুসরণ করে, তা খ্রিষ্টের কাছ থেকে পায় না, সেজন্য ওদের ভ্রান্তমতপন্থী বলা হয়। অতএব, খ্রিষ্টিয়ান না হওয়ায় খ্রিষ্টীয় শাস্ত্রের ব্যাপারে ওদের কোন অধিকার নেই, যার জন্য উপযুক্তভাবেই ওদের বলা যেতে পারে, 'তুমি কে? তুমি কবে ও কোথা থেকে আসছ? যখন আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই তখন আমার যা, সেটার ব্যাপারে তোমার কী? তাই, হে মার্কিওন, কোন্ অধিকারে তুমি আমার কাঠ কাট? হে ভালেন্তিনুস, কার্ অনুমতিতে তুমি আমার উৎসের জলস্রোত বদলাচ্ছ? হে আপেল্লেস, কোন্ ক্ষমতায় তুমি আমার সীমানা সরাচ্ছ? এ সম্পদ তো আমারই। বাকি হে সকলে, কেন তোমরা তোমাদের ইচ্ছামত এখানে বীজ বুনছ ও পাল চরাচ্ছ? সম্পদ তো আমার, বহুদিন থেকেই আমি এটার মালিক, তোমাদের আগ থেকেই আমি এটার মালিক। যারা ছিল এটার মালিক, সেই প্রকৃত মালিকদেরই কাছ থেকে পাওয়া এটার পাক্কা দলিলপত্র আমার হাতে রয়েছে। আমি প্রেরিতদূতদের উত্তরাধিকারী। তাঁরা যেমন নিজেদের সাক্ষ্যবাণী সযত্নে প্রস্তুত করেছিলেন, যেমন সেটাকে বিশ্বাসযোগ্য পাতায় ন্যস্ত করেছিলেন, যেমন এবিষয়ে শপথ করেছিলেন, সেই অনুসারে আমি সেটা ধারণ করে রাখি। তোমাদের বিষয়ে, তাঁরা তো সবসময়ই তোমাদের উত্তরাধিকার-বঞ্চিত বলে গণ্য করেছিলেন, ও বিধর্মী ও শত্রু বলে ত্যজ্য করেছিলেন।' কিন্তু কোন্ ভিত্তিতে ভ্রান্তমতপন্থীরা প্রেরিতদূতদের কাছে বিধর্মী ও শত্রু, যদি না একারণেই যে, ওদের ধর্মতত্ত্বসমূহ ভিন্ন? বস্তুতপক্ষে ওরা এক একজন নিজ নিজ ইচ্ছামতই সেই ধর্মতত্ত্ব প্রেরিতদূতদের বিপরীতে হস্তান্তরিত করল বা গ্রহণ করে নিল।

৩৮। মণ্ডলী ও শাস্ত্রের মধ্যকার মিল

যেখানে ধর্মতত্ত্বের ভিন্নতা উপস্থিত, সেখানে শাস্ত্রের ও ব্যাখ্যার বিকৃতিও উপস্থিত বলে অনুমেয়। ভিন্ন শিক্ষাদান যাদের লক্ষ্য ছিল, তাদের উপরেই নির্ভর করে ধর্মতত্ত্বের যন্ত্রসমূহ (ক) নানা ভাবে সাজাবার প্রয়োজনীয়তা। কেননা শিক্ষাদানে ভিন্ন যন্ত্রপাতি অবলম্বন করা ছাড়া ওদের সেই ভিন্ন শিক্ষাদান উপস্থাপন করার জন্য অন্য যন্ত্র ছিল না। ওদের দিক দিয়ে, যেমন বিকৃত যন্ত্রপাতি ছাড়া বিকৃত ধর্মতত্ত্ব উপস্থাপনটা সফল হতে পারত না, তেমনি আমাদের দিক দিয়ে, যে যন্ত্রপাতি দ্বারা ধর্মতত্ত্বের ব্যবস্থা করা

হয়েছিল, সেই খাঁটি যন্ত্রপাতি ছাড়া খাঁটি ধর্মতত্ত্ব সফল হতে পারত না। আচ্ছা, আমাদের শাস্ত্রে এমন কি আছে যা আমাদের বিপরীত? আমাদের যা নিজস্ব, তাতে আমরা এমন কি অনুপ্রবেশ করিয়েছি যা আমাদের পক্ষে পুনরায় বাদ দেওয়া বা যোগ করা বা বিকৃত করা দরকার যাতে যা কিছু সেটার বিপরীত তা তার প্রকৃত পরিপক্কতায় ও শাস্ত্রে যা অন্তর্ভুক্ত তাতে ফিরিয়ে আনতে পারি? আমরা নিজেরা যা, শাস্ত্রও নিজের উৎপত্তিকাল থেকে তা; অন্য কোন কিছু হবার আগে, তোমাদের দ্বারা শাস্ত্র বিকৃত হবার আগে, আমরা সেই শাস্ত্র থেকেই উদ্গত হয়ে আছি। তবে, যেহেতু সমস্ত বিকৃতিকরণ পরবর্তীকালীন বলে মান্য করা দরকার, এই সুস্পষ্ট কারণে যে, সেই বিকৃতিকরণটা এমন বিরোধিতা থেকে উৎপন্ন যা, যার বিরোধিতা করছে কখনও ও কোন ক্ষেত্রেও সেটার পূর্বকালীনও নয়, সেটার সমজাতও নয়, সেজন্য প্রজ্ঞাবান যেকোন ব্যক্তির কাছে এটা অবশ্যই অবিশ্বাস্য যে, কেউ না কেউ মনে করবে, আমরা যারা প্রথম থেকে আছি বলে প্রথমই আছি, এই আমরা নিজেরাই সেই শাস্ত্রের মধ্যে ভিন্ন কিছু অনুপ্রবেশ করিয়েছি; পক্ষান্তরে ওরাই, যারা কালের দিক দিয়ে পরবর্তীকালীন ও শাস্ত্রের বিপরীত, সেই ওরাই শাস্ত্রে ভিন্ন কিছু অনুপ্রবেশ করিয়েছে। একজন হাত দিয়ে, আর একজন অপব্যাখ্যা দিয়ে সেটার অর্থ বিকৃত করে। কেননা যদিও এমনটা মনে হয় ভালেন্তিনুস পুরা পুস্তকটা ব্যবহার করছে, তবু তাসত্ত্বেও মার্কিওনের চেয়ে সে কেবল অধিকতর ধূর্ত মন ও দক্ষতা দিয়েই সত্যের উপরে হিংসাত্মক হাত তুলেছে। মার্কিওন সরাসরি ও প্রকাশ্যে কলম-কাটা ছুরি নয়, তলোয়ারই ব্যবহার করেছিল যেহেতু সে নিজের সঙ্কল্প অনুযায়ীই শাস্ত্রের ছেদন সাধন করেছিল। কিন্তু ভালেন্তিনুস তেমন ছেদন থেকে বিরত থেকেছিল, কেননা সে নিজের প্রকল্পমত শাস্ত্রকে কল্পনা করেনি বরং নিজের প্রকল্পটাকে শাস্ত্র অনুযায়ী উপযোগী করে তুলেছিল; অথচ প্রতিটি বিশেষ শব্দের প্রকৃত অর্থ বাতিল করায় ও অবাস্তব উপযোগীকরণ যোগ করায় সে [মার্কিওনের চেয়ে] [শাস্ত্র থেকে] আরও বেশি কিছু বাতিল করেছিল ও [তাতে] আরও বেশি কিছু যোগ করেছিল।

৩৯। যা পল আধ্যাত্মিক শঠতা বলে চিহ্নিত করে, সেসম্পর্কে

এগুলো ছিল আধ্যাত্মিক শঠতা সংক্রান্ত সেই সমস্ত বুদ্ধিমত্তা যেগুলোর সঙ্গে আমাদেরও, হে ভ্রাতৃগণ, সম্ভবত সেই লড়াইতে নামতে হবে যা বিশ্বাসের জন্য প্রয়োজন, যাতে করে মনোনীতেরা প্রকাশিত হয়, যাতে তিরস্কৃতেরা অনাবৃত হয়। আর এজন্যই এগুলো এমন প্রভাব ও ভুলভ্রান্তি আবিষ্কার ও তৈরি করার এমন দক্ষতার অধিকারী, যার সামনে, কঠিন ও অনির্বচনীয় সমস্যার সামনেই যেন, আমাদের পক্ষে আশ্চর্যান্বিত হওয়া উচিত নয়, কেননা ধর্মীয় নয় এমন লেখায়ও সদৃশ দক্ষতা বিশিষ্ট একটা উদাহরণ সহজে পাওয়া যায়। তুমি তো আজও দেখতে পাচ্ছ ভির্জিলের লেখাগুলো-ভিত্তিক এমন একেবারে ভিন্ন ধরনেরই একটা গল্প যা কাব্যিক কায়দা অনুযায়ী সাজানো, ও যার প্রতিটি পদও নিজ নিজ বিষয়বস্তু অনুযায়ী সাজানো। একথার প্রমাণস্বরূপ, হোসিদিউস গেতা নিজের রচিত 'মেদেয়া' নাটককে সম্পূর্ণরূপে ভির্জিল থেকেই চুরি করেছেন। আমার নিজের একপ্রকার আত্মীয় তার নিজের কলমের নানা অবসরকালীন লেখার মধ্যে একই কবির লেখাগুলো ভিত্তি করে 'কেবেসের ফলক' রচনা করল। যাদের সাধারণত 'হোমেরোসচেন্তনি' বলে অভিহিত, তারা হোমারের কাব্যকর্ম ভিত্তি করে এস্থান-ওস্থান থেকে এলোমেলোভাবে নিজেদের পছন্দমত কতগুলো পদ উদ্ধৃত ক'রে জোড়াতালির মত তা একদেহেই যেন সেলাই ক'রে নিজেদের লেখা তৈরি করে। আচ্ছা, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এধরনের সহজ কাজের লক্ষ্যে ঐশশাস্ত্রই অধিক ফলপ্রদ উৎস। এমনকি আমি নির্ভয়ে বলতে পারি, ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে শাস্ত্র এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যাতে খোদ শাস্ত্রটাই ভ্রান্তমতপন্থীদের মাল যুগিয়ে দিতে পারে, কেননা আমি এ পড়ি যে, *ভ্রান্তমত অবশ্যই দেখা দেবে* (ক), আর তা এমন যা শাস্ত্র ছাড়া হতে পারে না।

৪০। প্রতিমাপূজা ও ভ্রান্তমত শামীল

কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, 'যাতে সেই পদগুলো ভ্রান্তমতের জন্য উপযোগী হতে পারে, সেগুলোর অর্থ কার্ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হবে?' অবশ্যই দিয়াবল দ্বারা, কেননা যে সমস্ত ছলনা সত্যকে বিকৃত করে তা তারই অধিকার; আরও, তার রহস্যময়

প্রতিমাপূজার মধ্য দিয়ে সে ঈশ্বরের সাক্রামেন্তগুলোর (ক) প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করে। হ্যাঁ, সেও কাউকে অর্থাৎ নিজের বিশ্বাসী ও বিশ্বস্ত অনুগামীদের বাপ্তিস্ম দেয়, সেও নিজস্ব প্রক্ষালন দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রতিজ্ঞা করে, এবং আমার স্মৃতিমত সেই মিথ্রাও (খ) নিজের সৈন্যদের কপাল নিজের মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত করে, রুটি-উৎসর্গ অনুষ্ঠানও উদ্‌যাপন করে, পুনরুত্থানমুখী একটা প্রতিমূর্তি অনুপ্রবেশ করায়, ও খড়্গের আঘাতে মালা গাঁথে। সে যে নিজের প্রধান যাজকের জন্য একক বিবাহ স্থির করে থাকে, এসম্পর্কেও কীবা বলব? তারও নিজস্ব কুমারীর দল আছে, তারও আছে কৌমার্যধারীর দল। তাছাড়া আমরা যদি নুমা পম্পিলিউসের (গ) কুসংস্কারের কথা ধরতাম, যদি তার যাজনকর্ম পদ্ধতি, ধর্মীয় চিহ্নাদি ও বিশেষ বিশেষ অধিকার, তার যজ্ঞরীতিও ও যজ্ঞ সংক্রান্ত সেই সমস্ত উপাদান ও পাত্রাদি, ও তার প্রায়শ্চিত্ত ও মানত সংক্রান্ত অদ্ভুত অনুষ্ঠানরীতির কথাও বিচার-বিবেচনা করতাম, তবে এ কি স্পষ্ট হত না যে দিয়াবল ইহুদী বিধানের সেই জানা নিখুঁত্ব অনুকরণ করেছে? তাই, যেহেতু প্রতিমাপূজা ক্ষেত্রে সে খ্রিষ্টের সাক্রামেন্তসমূহ সম্পাদনা সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রকাশ করার লক্ষ্যে এত অনুকরণ-আগ্রহ দেখিয়েছে, সেজন্য অবশ্যই অনুমান করা যেতে পারে, একই বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হওয়ায় সে ঐশবিষয়াদির ও খ্রিষ্টিয়ান পবিত্রজনদের খোদ দলিলসমূহকেও, তথা তাদের ব্যাখ্যা থেকে নিজের ব্যাখ্যা, তাদের বচনাদি থেকে নিজের বচনাদি, তাদের উপমা-কাহিনী থেকে নিজের উপমা-কাহিনী, এই সবই সে নিজের ভক্তিহীন ও প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বাসের উপযোগী করার জন্য মনস্থ করেছে ও তাতে কৃতকার্যও হয়েছে। এবং এজন্য এবিষয়ে কারও সন্দেহ করা উচিত নয় যে, যা থেকে ভ্রান্তমতও আগত, সেই আধ্যাত্মিক শঠতাও দিয়াবল দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, এতেও সন্দেহ করা উচিত নয় যে, ভ্রান্তমত ও প্রতিমাপূজার মধ্যে প্রকৃত কোন পার্থক্য নেই, কেননা, সেই দু'টো নিজ নিজ প্রবর্তক ও কর্মফল হিসাবে তা-ই স্বীকার করে যা প্রতিমাপূজাও স্বীকার করে। তারা হয় ভান করে বলে, স্রষ্টার বিরুদ্ধে অন্য কোন ঈশ্বর নেই, না হয়, তাঁকে একমাত্র ঈশ্বর বলে স্বীকার করলেও তবু ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে যা, ওরা সেই অনুসারে নয়, অন্যভাবেই তাঁর বিষয়ে আলোচনা করে। এর ফলে, ঈশ্বর সম্পর্কে ওরা যত মিথ্যা বলে, তা একপ্রকারে প্রতিমাপূজা স্বরূপ।

৪১। ভ্রান্তমতপন্থীদের জীবনধারণ

এক্ষেত্রে ভ্রান্তমতপন্থীদের জীবনধারণ সম্পর্কে একটা বিবরণও যেন বাদ না পড়ে, তথা, সেই জীবনধারণ কেমন অসার, কেমন পার্থিব, কেমন মানবীয় মাত্র, কেমন গাম্ভীর্যবিহীন, অধিকারবিহীন ও শৃঙ্খলাবিহীন, হ্যাঁ, ওদের জীবনধারণ ঠিক ওদের বিশ্বাস অনুযায়ী। প্রথমত, কে দীক্ষাপ্রার্থী ও কে বিশ্বস্ত তা সন্দেহের বিষয়; ওরা সমানভাবে এগিয়ে আসে, সমানভাবে শোনে, সমানভাবে প্রার্থনা করে; আর বিধর্মীরা এসে পড়লে তারাও তেমনটি করে। যা পবিত্র ওরা তা কুকুরদের সামনে, ও মণিমুক্তা শূকরদের সামনে ফেলে (ক), যদিও, সত্যিকথা বলতে গেলে, প্রকৃত মণিমুক্তা ফেলে না। ওদের মতে সরলতা হলো শৃঙ্খলা উৎখাত, আর সেটার প্রতি আমাদের যত্নকে ওরা ব্যভিচার বলে। তাছাড়া, ওরা শান্তি সকলের মধ্যে নির্বিচারে আদান-প্রদান করে। কোন বিষয়ে ওদের কোন চিন্তা নেই, বিষয়াদি সম্পর্কে ওদের নিজ নিজ অভিমত থাকুক, আসল কথা এ, যেন ওরা একমাত্র সত্যকে আক্রমণ করে বিনাশ করতে পারে। সবাই গর্বে স্ফীত, সবাই জ্ঞান বিতরণ করে। ওদের দীক্ষাপ্রার্থী প্রশিক্ষিত হবার আগেও পণ্ডিত। ভ্রান্তমতপন্থী স্ত্রীলোকেরা নিজেরাও চরিত্রহীন, কেননা সেই স্ত্রীলোকেরা এতই দুঃসাহসী যে শিক্ষাও প্রদান করে, [ধর্মীয় ব্যাপারে] তর্কযুক্তি করে, অশুভশক্তি বিতাড়ন করে, নিরাময় অঙ্গীকার করে, আর হয় তো বাপ্তিস্মও দেয়। ওদের পদশ্রেণিভুক্তি-রীতিও দুঃসাহসী, অসার ও পরিবর্তনশীলতা প্রবণ। এক সময় ওরা নববাপ্তিস্মপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে, আর এক সময় জাগতিক কর্মে আবদ্ধ মানুষকে, অন্য সময় আমাদের নিজেদের ধর্মত্যাগী মানুষকে পদপ্রাপ্ত করে যাতে করে গৌরবদানে ওদের নিজেদের প্রতি আবদ্ধ করতে পারে যেহেতু সত্যের শরণে তা করতে অক্ষম। পদোন্নতি বিদ্রোহীদের শিবিরের চেয়ে অন্যত্র সহজতর ব্যাপার নয়, কেননা সেই শিবিরে থাকা-ই আপনা আপনি পদোন্নতি বোঝায়। এর ফলে এমনটা হয় যে, আজ বিশপ একজন, আগামীকাল আরেকজন; আজ সে-ই পরিসেবক যে আগামীকাল হবে পাঠক; আজ সে-ই পুরোহিত যে আগামীকাল হবে গণশ্রেণির একজন। কেননা ওরা গণশ্রেণিভুক্তদের উপরেও যাজকীয় ভূমিকা জোরপূর্বক আরোপ করে।

৪২। ভ্রান্তমতপন্থীদের লক্ষ্য সবই ধ্বংস করা

কিন্তু বাণী-সেবাকর্ম সম্পর্কে আমি আর কী বলব, যখন ওদের কর্ম বিধর্মীদের ধর্মান্তরিত করা নয় বরং আমাদের জনসমাজকে উলট পালট করা? যখন ওরা পতিতদের উত্থাপন করে তখন নয়, বরং যখন দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের পতন সাধন করে তখনই ওরা বেশি গৌরব অর্জন করে। আর সেই অনুসারে, যেহেতু ওদের কৃতিত্ব ওদের নিজেদের গাঁথনি থেকে নয় বরং সত্য-ধ্বংসন থেকেই আসে, সেজন্য আমাদের যা, ওরা তা নামিয়ে দেয় যাতে নিজেরটা গেঁথে তুলতে পারে। তুমি শুধু মোশির বিধান, নবীদের ও স্রষ্টার ঈশ্বরত্ব বিষয়ে ওদের বঞ্চিত কর, আর আলাপ-আলোচনা করার মত ওদের আর কোন আপত্তি থাকে না। এর ফল হলো এ যে, পতিত ধ্বংসস্তূপ গেঁথে তোলার চেয়ে ওরা দাঁড়ানো ঘর ধ্বংসনে বেশি সহজে কৃতকার্য হয়। কেবল এক্ষেত্রেই ওরা নিজেদের নম্র, কোমল ও শ্রদ্ধাপূর্ণ দেখায়। অন্যথা ওরা নিজেদের নেতাদেরও শ্রদ্ধা করতে জানে না। এজন্য ভ্রান্তমতপন্থীদের মধ্যে দলাদলি প্রায়ই দেখা দেয় না, কারণ যখন দলাদিলি দেখা দেয় তখন তা চোখে পড়ে না। বাস্তবিকই ওদের কাছে দলাদলিই একতা। ওরা যদি নিজেদের মধ্যে নিজেদের নিয়মবিধি ছেড়ে বিপথগামী না হয়, তবে এক্ষেত্রে আমি মিথ্যাবাদী; কেননা এক একজন যা গ্রহণ করে নিয়েছে তা নিজের ইচ্ছামত বদলায় ঠিক সেইভাবে যেভাবে যে সেইসব সম্প্রদান করেছিল সে নিজের ইচ্ছামত সেইসব বদলিয়েছিল। ব্যাপারটার অগ্রগতি নিজের স্বভাব ও নিজের উৎপত্তির প্রকৃতি স্বীকারেই স্থিত। যা ভালেন্তিনুসের কাছে বিধেয় ছিল, তা ভালেন্তিনুসপন্থীদেরও কাছে বিধেয় ছিল; তেমনিভাবে, মার্কিওনের কাছে যা বিধেয় ছিল, মার্কিওনপন্থীদের কাছেও তা বিধেয় ছিল, নিজেদের ইচ্ছামত বিশ্বাসকে নবীকৃত করাও ওদের কাছে বিধেয় ছিল। অবশেষে, সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, সমস্ত ভ্রান্তমত অনেক ক্ষেত্রে ওদের প্রবর্তকদের অভিমত থেকে ভিন্ন অভিমত সমর্থন করে। বেশির ভাগ সেগুলোর গির্জাঘর পর্যন্তও নেই। মাতাবিহীন, ঘরবিহীন, বিশ্বাস ক্ষেত্রে অভাবী, নির্বাসিত হয়ে ওরা কেমন যেন অস্তিত্ববিহীন হয়ে ঘোরাফেরা করে থাকে।

৪৩। ভ্রান্তমতপন্থীদের সঙ্গীদের সম্পর্কে

এটাও লক্ষ করা হয়েছে যে, ভ্রান্তমতপন্থীরা প্রায়ই জাদুবিদদের, হাতুড়িয়াদের, গণকদের ও দার্শনিকদের সঙ্গে মেলামেশা করে। এর কারণ হলো যে, ওরা এমন মানুষ যারা যা কিছু কৌতূহলী তাতেই নিবিষ্ট থাকে। *খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে* (ক) বচনটা ওরা সর্বত্রই মনে রাখে। তাই ওরা যে কার্ সঙ্গে মেলামেশা করে, তা থেকে ওদের বিশ্বাসের গুণমান গণ্য করা যেতে পারে। ওদের বিশ্বাসের পরিচয় ওদের শৃঙ্খলা থেকে পাওয়া যায়। ওরা বলে ঈশ্বরকে ভয় পেতে নেই, সেই অনুসারে ওদের কাছে সবই উন্মুক্ত ও অনুমোদিত। তথাপি, কোথায়ই বা ঈশ্বরকে ভয় করা হয় না, সেইখানে ছাড়া যেখানে ঈশ্বর নেই? যেখানে ঈশ্বর নেই সেখানে সত্যও নেই; যেখানে সত্য নেই, এ বলা বাহুল্যই যে, সেখানে ওদের সেই শৃঙ্খলা উপস্থিত। কিন্তু যেখানে ঈশ্বর আছেন, সেখানে সেই ঈশ্বরভীতি আছে যা *প্রজ্ঞার সূত্রপাত* (খ)। যেখানে ঈশ্বরভীতি আছে, সেখানে আছে সরলতাপূর্ণ গাম্ভীর্য, সুবিবেচক শৃঙ্খলা, আগ্রহী যত্ন, যাচাইকৃত পদশ্রেণিভুক্তিকরণ, সুচিন্তিত সহভাগিতা, যোগ্যতা অনুযায়ী পদোন্নতি, শ্রদ্ধাপূর্ণ বশ্যতা, [ধর্মানুষ্ঠানে] ভক্তিময় অংশগ্রহণ, মার্জিত আচরণ, ঐক্যবদ্ধ মণ্ডলী ও সেইসব কিছু যা ঈশ্বরের।

৪৪। ভ্রান্তমতপন্থীদের বিষয়ে প্রভুর বিচার

আমাদের মধ্যে উপস্থিত দৃঢ় শৃঙ্খলার এসমস্ত চিহ্ন হলো সত্য বিষয়ে এমন অতিরিক্ত প্রমাণ যা থেকে সেই মানুষ নিরাপদে পথ পরিবর্তন করে না, যে মানুষ সেই ভাবী বিচারের কথা মনে রাখে যখন সবকিছুর আগে বিশ্বাসেরই বিষয়ে কৈফিয়ত দেবার জন্য *আমাদের সকলকে খ্রিষ্টের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াতে হবে* (ক)। যে কুমারীকে [তথা বিশ্বাস] খ্রিষ্ট তুলে দিয়েছিলেন, যারা তাকে নিজেদের ভ্রান্তমত-ব্যভিচারে দূষিতা করেছিল, তারা তখন কী বলবে? আমি মনে করি, ওরা অভিযোগ করে বলবে, 'বিকৃত ও জঘন্য ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে বা তেমন কিছু এড়াবার বা ঘৃণা করার ব্যাপারেও খ্রিষ্ট দ্বারা বা তাঁর প্রেরিতদূতদের দ্বারা আমাদের কোন নির্দেশ কখনও দেওয়া হয়নি। তবে [খ্রিষ্ট ও তাঁর প্রেরিতদূতেরা] এমনটা মেনে নিন যে, আমাদের কোন পূর্ব সতর্কতা-বাণী ও নির্দেশ না দেওয়ার ব্যাপারে দোষ তাঁদেরই ও তাঁদের শিষ্যদেরই।' তাছাড়া ওরা

ভ্রান্তমতের এক এক শিক্ষাগুরুর অধিকার সম্পর্কে বহু কিছু যোগ করবে, এরা কেমন উৎকৃষ্ট ভাবে নিজ নিজ ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাস দৃঢ় করেছিল, কেমন মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করেছিল, পীড়িতদের নিরাময় করেছিল ও ভবিষ্যতের কথা বলেছিল, যাতে করে উপযুক্ত ভাবে প্রেরিতদূত বলে পরিগণিত হতে পারে। এ এমনটা যা কেমন যেন লিখিত ছিল না, তথা, ওদের বিকৃত প্রচারের প্রতারণার রক্ষার্থে অনেকেই আসবে যারা উৎকৃষ্ট পরাক্রম-কর্ম সম্পাদন করবে। আর এভাবে ওরা ক্ষমা পাবারও যোগ্য হবে বৈকি।

[সেই ভ্রান্তমতপন্থীরা বলতে থাকে], তথাপি, যে কেউ প্রভুর ও প্রেরিতদূতদের লেখা ও নিন্দার কথা মনে রেখে বিশ্বাসের অখণ্ডতায় দৃঢ় থাকবে, আমি মনে করি, তারা তখন ক্ষমা হারবার ব্যাপারে বিপদে পড়বে যখন প্রভু উত্তরে বলবেন, 'আমি আগে থেকে তোমাদের স্পষ্ট সতর্কবাণী দিয়েছিলাম যে আমার নামে, এমনকি নবীদের ও প্রেরিতদূতদেরও নামে জাল ধর্মতত্ত্বের শিক্ষাগুরু দেখা দেবে; এবং আমার শিষ্যদের আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম তারা যেন একই কথা তোমাদের কাছে প্রচার করে। আমি একসময় আমার প্রেরিতদূতদের সেই সুসমাচার ও সেটার নিয়মের [অর্থাৎ মানদণ্ডের] ধর্মতত্ত্ব দিয়েছিলাম; কিন্তু যেহেতু তোমরা বিশ্বাস করবে না, সেজন্য পরে আমার প্রসন্নতার খাতিরেই আমি বহু কিছু পরিবর্তন করেছিলাম। আমি পুনরুত্থানের এমনকি মাংসেরও পুনরুত্থানের কথা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কিন্তু ব্যাপারটা আবার ভেবে আমি দেখেছিলাম, হয় তো আমি সেই প্রতিজ্ঞা মেনে নিতে পারব না। আমি দেখিয়েছিলাম, আমি কুমারী থেকে জন্ম নিয়েছিলাম, কিন্তু পরে ব্যাপারটা আমার কাছে জঘন্য মনে হলো। আমি বলেছিলাম, সূর্যের ও বৃষ্টিধারার নির্মাতা যিনি তিনি আমার পিতা, কিন্তু তাঁর তুলনায় আরও ভালো অন্য পিতা আমাকে দত্তক করেছিল। আমি ভ্রান্তমতপন্থীদের কথা কান পেতে শুনতে তোমাদের নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু এতে আমার ভুল হয়েছিল।' যারা পথভ্রান্ত হয় ও সত্যের বিশ্বাস বিষয়ে বিপদ না এড়ায়, তাদের পক্ষে তেমনটা ভাবা সম্ভব হয়।

৪৫। বিদায়

কিন্তু আপাতত, আমাদের এ লেখা সকল ভ্রান্তমতের বিপক্ষে সাধারণভাবে দাঁড়িয়েছে, এমনটা দেখিয়ে যে, শাস্ত্রের সঙ্গে কোন তুলনা না করে সবগুলো নির্দিষ্ট, ন্যায্য ও দরকারী খারিজ-নির্দেশাবলি অনুসারে খণ্ডন করা প্রয়োজন। বাকি যা কিছু রয়েছে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ এমনটা দিলে তবে আমরা ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে এ ভ্রান্তমতগুলোর কয়েকটার ব্যাপারে প্রতিবাদও প্রস্তুত করব। যারা সত্যে বিশ্বাসের খাতিরে এসব কিছু পাঠ করার জন্য সুযোগ নেবে, তাদের উপর আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক চিরকাল ধরে।

---

১ (ক) ১ করি ১১:১৯ দ্রঃ।

৩ (ক) ১ শামু ১৩:১৪।

(খ) ২ শামু ১১ দ্রঃ।

(গ) মথি ১০:২২ দ্রঃ।

(ঘ) যেরে ৩২:১৯ দ্রঃ।

(ঙ) ১ শামু ১৬:৭।

(চ) ১ তি ২:১৯।

(ছ) মথি ২০:১৬ দ্রঃ।

(জ) মথি ১৫:১৩।

(ঝ) মথি ৩:১২ দ্রঃ।

(ঞ) যোহন ৬:৬৭ দ্রঃ।

(ট) ২ তি ১:১৫; ২:১৭; ১ তি ১:২০ দ্রঃ।

(ঠ) ১ যোহন ২:১৯।

৪ (ক) মথি ৭:১৫ দ্রঃ।

(খ) ১ করি ১১:১৯।

(গ) ১ থে ৫:২১।

৫ (ক) ১ করি ১১:১৯।

(খ) ১ করি ১১:১৯।

(গ) ১ করি ১:১০ দ্রঃ।

৬ (ক) গা ৫:২০ দ্রঃ।

(খ) তীত ৩:১০-১১ দ্রঃ।

(গ) গা ১:৮।

(ঘ) ২ করি ১১:১৪ দ্রঃ।

(ঙ) ভাববাদিনী ফিলুমেনে সংক্রান্ত তথ্য থেকে শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে, সে অপদূতগ্রস্ত একটা অবিবাহিতা মিশরীয় নারী যার জন্মস্থান আলেক্সান্দ্রিয়া। কথিত আছে, ভ্রান্তমতপন্থী আপেল্লেস তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার পর তারই পন্থী হয়ে তার ভাববাণী ও দৈববাণী লিপিবদ্ধ করেছিল।

৭ (ক) ১ তি ৪:১ দ্রঃ।

(খ) ১ করি ১:২৭ দ্রঃ।

(গ) ভালেন্তিনুসই এপদে উল্লিখিত 'এওন' মতবাদের প্রবর্তক। এই ভালেন্তিনুস মিশরে জন্মগ্রহণ করে একসময় জ্ঞান-মার্গে যোগ দেয়; তার প্রবর্তিত মতবাদে নানা বিষয় অন্তর্ভুক্ত যেমন পারস্য দর্শন, পিতাগোরাসের দর্শন এবং স্তোয়া ও মিশরীয় যাজকদের মতবাদসমূহ। সে আনুমানিক ১৪০ সালে রোমে তার সেই নিজস্ব দর্শনবিদ্যা প্রচার করলে যথেষ্ট লোক তার অনুসরণ করে যেমন এরাক্লেওন, তলেমি, মার্কোস, বার্দেসানেস ইত্যাদি শিষ্য। কথিত আছে, ভালেন্তিনুস বিশপ পদে নিযুক্ত না হওয়ার কারণেই জ্ঞান-মার্গে যোগ দেয়।
তার সম্পর্কে ও তার মতবাদ সম্পর্কে সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা (৬ষ্ঠ ধর্মশিক্ষা) দ্রষ্টব্য।

(ঘ) মার্কিওন ১৪৪ সালে খ্রিষ্টমণ্ডলী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে এমন দ্বৈতবাদ প্রবর্তন করে যা শ্রেয়তর এক ঈশ্বরে ও ন্যায়বান ও অমঙ্গলকর আরেক ঈশ্বরে কেন্দ্র করে; ন্যায়বান ও অমঙ্গলকর এই দ্বিতীয় ঈশ্বরই বিশ্বস্রষ্টা। আগে সে স্তোয়া মতবাদপন্থী হয়েছিল। মার্কিওন সম্পর্কেও সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা (৬ষ্ঠ ধর্মশিক্ষা) দ্রষ্টব্য।

(ঙ) 'এপিকুরোস' খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীর একজন দার্শনিক যাঁর জন্মস্থান এথেন্স। তাঁর মতবাদ খ্রিষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে। প্রাচীনকালের বহু নাম করা ব্যক্তিত্ব এই মতবাদের পন্থী ছিলেন, যেমন দেমোক্রিতোস, প্লুতার্কোস, সেনেকা ইত্যাদি। এই মতবাদ অনুসারে জগৎসংসারে ঈশ্বরের কোন হাত নেই, প্রকৃতিরও কোন নিজস্ব লক্ষ্য নেই, বরং প্রকৃতি নানা যান্ত্রিক কারণসমূহ দ্বারা চালিত; সত্য অনুভূতির উপর নির্ভরশীল; মানব আচরণের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তি নয় বরং দুঃখবিহীন সুখেই স্থিত, ও মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য

এমন অচল অবস্থা অর্জন করা যার নাম ἀταραξία (আতারাক্সিয়া)। স্তোয়াপন্থীদের মতে মানবাত্মা বস্তুগত ও মরণশীল।

(চ) জেনো সাইপ্রাস দ্বীপে খ্রিঃপূঃ ৩৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করে ২৬২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। 'স্তোয়া' বলে পরিচিত তাঁর মতবাদ অনুসারে প্রকৃতিই ঈশ্বর, আর সেই অনুসারে ঈশ্বর (বা বিশ্বযুক্তি) সর্বত্র বিরাজমান, এই অর্থে যে, স্বীয় যুক্তিক্ষমতা ও সিদ্ধতা-বিশিষ্ট জগৎই একপ্রকারে ঈশ্বর।
হেরাক্লিতোস এফেসসে খ্রিঃপূঃ ৫৪০ সালে জন্মগ্রহণ করে ৪৮০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মতবাদ অনুসারে আগুনই জগতের জড়বস্তুর ভিত্তি ও সেটার প্রতীক।

(ছ) 'এন্থিমেসিস' (বা 'এন্থুমেসিস') (ἐνθύμησις): ভালেন্তিনুসের মতবাদে এন্থিমেসিস এমন শক্তি যা জ্ঞানকে কুকামনা করা থেকে জনিত; এবং এওনগুলোর শেষ এওন 'একত্রোমা' বলে অভিহিত (ἔκτρωμα এর অর্থ অকালজাতক)। এখানে তের্তুল্লিয়ানুস ব্যঙ্গাত্মক ভাষা ব্যবহার করছেন: যখন সেই ভ্রান্তমতপন্থীরা তেমন অদ্ভুত এমনকি হাস্যকর নামে তাদের এওনদের চিহ্নিত করে, তখন আমাদের বোঝা উচিত যে, তাদের মতবাদও অদ্ভুত ও হাস্যকর।

(জ) ১ তি ১:৪।

(ঝ) তীত ৩:৯।

(ঞ) ২ তি ১:৪।

(ট) কল ২:৮।

(ঠ) 'আকাদেমিয়া' (Ἀκαδήμεια) ছিল এথেন্সে স্থাপিত প্লেটোর বিদ্যালয়ের নাম; স্থানটা এক বাগানে অবস্থিত যা 'আকাদেমোস' নামক এক বীরের স্মরণে 'আকাদেমোস বাগান' বলে নামকরণ করা হয়েছিল। একই পদে আমরা পড়ি, 'এথেন্স ও যেরুশালেমের মধ্যে সম্পর্ক কি?' যখন এথেন্স হলো শ্রেষ্ঠ মানব শিক্ষা-কেন্দ্র ও যেরুশালেম হলো ঐশশিক্ষা কেন্দ্র, তখন প্রশ্নের উত্তর হলো, এথেন্স ও যেরুশালেমের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই।

(ড) প্রজ্ঞা ১:১ দ্রঃ। একই পদে 'শলোমন-অলিন্দ' ও 'স্তোয়া' এর কথাও উল্লিখিত: শলোমন-অলিন্দে যিশু ও প্রেরিতদূতেরা শিক্ষা প্রদান করেছিলেন (যোহন ১০:২৩; প্রেরিত ৩:১১; ৫:১২); স্তোয়া মতবাদের দার্শনিকেরাও এথেন্সের একটা অলিন্দে শিক্ষা প্রদান করতেন, যেহেতু 'স্তোয়া' গ্রীক শব্দের অর্থ 'অলিন্দ'। তাই তের্তুল্লিয়ানুস বলতে চান, খ্রিষ্টিয়ান যারা, তাদের যখন শলোমন-অলিন্দ থাকে, তখন তারা কেন স্তোয়া-অলিন্দ থেকে শিক্ষা নিতে চায়?

৮ (ক) মথি ৭:৭।

(খ) লুক ১৬:২৯।

(গ) যোহন ৫:৩৯ দ্রঃ।

(ঘ) মথি ৭:৭।

(ঙ) ইশা ৪০:১৫ দ্রঃ।

(চ) মথি ৭:৮ দ্রঃ।

(ছ) মথি ১৫:২৪।

(জ) মথি ১৫:২৬ দ্রঃ।

(ঝ) মথি ১০:৫ দ্রঃ।

(ঞ) মথি ২৮:১৯ দ্রঃ।

(ট) যোহন ১৬:১৩।

৯ (ক) মথি ৭:৭।

(খ) 'আমাদেরই কাছে' অর্থাৎ কাথলিক মণ্ডলীর কাছে।

১০ (ক) মথি ৭:৭।

(খ) হেবিওন, অর্থাৎ সেই হেবিওনীয়রা যারা খ্রিষ্টিয়ান হয়েছিল কিন্তু ইহুদী প্রথাও মেনে নিতে ইচ্ছা করছিল। তারা বলত, খ্রিষ্টের জন্ম অলৌকিক নয়, বরং তাঁর জন্ম অন্য সকল মানুষের জন্মের মত। শিমোন সম্পর্কে প্রেরিত ৮:১৮ দ্রঃ।

১১ (ক) লুক ১৫:৮ দ্রঃ।

(খ) লুক ১১:৫ দ্রঃ।

(গ) লুক ১৮:২-৩ দ্রঃ।

(ঘ) মথি ৭:৮; লুক ১১:১০।

১৩ (ক) 'খ্রিষ্ট দ্বারা শেখানো এই [বিশ্বাসের] মানদণ্ড' : তের্তুল্লিয়ানুসের এই উক্তি ধর্মীয় দিক থেকে শুধু নয়, ঐতিহাসিক দিক থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ :
১। ঐতিহাসিক দিক থেকে আমরা জানতে পারি, যা আমরা বিশ্বাস-সূত্র বলে ডাকি, তা সেসময় বিশ্বাসের মানদণ্ড (regula fidei - রেগুলা ফিদেই) বলা হত। Regula লাতিন শব্দের অর্থ হলো এমন বস্তু যা পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত ছিল ; তাই বাংলায় অর্থ দাঁড়ায় মানদণ্ড বা মাপকাঠি। একই সময়ে গ্রীক মণ্ডলীগুলো এক্ষেত্রে σύμβολον (সিম্বলোন বা সুম্বলোন) শব্দটা ব্যবহার করত যার অর্থ 'পরিচয়-চিহ্ন' ও 'সঙ্কেত-বাক্য'। কালক্রমে লাতিন মণ্ডলীগুলোও মানদণ্ডের বদলে 'সিম্বলোন' শব্দটা ব্যবহার করতে লাগে যা লাতিন ভাষায় 'সুম্বলুম' দাঁড়ায়। বাংলায় বিশ্বাসের সিম্বলোন বা বিশ্বাসের সিম্বলুম শব্দদ্বয় অপ্রচলিত, 'বিশ্বাস-সূত্র'-ই প্রচলিত যা ধর্মীয় ক্ষেত্রে একই অর্থ বহন করে।।

২। ঐশতাত্ত্বিক দিক থেকে তের্তুল্লিয়ানুসের উপস্থাপিত বিশ্বাসের মানদণ্ড সম্পর্কে লক্ষণীয় প্রধান বিষয় এ, মানদণ্ডটা প্রেরিতদূতদের দ্বারা নয়, স্বয়ং খ্রিষ্ট দ্বারাই শেখানো হয়েছিল; এবং মানদণ্ডে খ্রিষ্টের সমাধিদান ও পাতালে তাঁর অবরোহণের কথা উল্লিখিত নয়।
এ থেকে আমরা শিখি যে, মানদণ্ডটা অর্থাৎ বিশ্বাস-সূত্র হঠাৎ করে নয়, বরং কালক্রমেই আবির্ভূত হয়েছিল ও মণ্ডলীর প্রয়োজন অনুসারে সম্বর্ধিত হয়েছিল।
এ সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত টীকা সাধু সিরিল লিখিত ধর্মশিক্ষা ও রুফিনুস লিখিত প্রেরিতদের বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা-তে পাওয়া যেতে পারে।

১৪ (ক) লুক ১৮:৪২।

(খ) মথি ১৫:১৪ দ্রঃ।

১৬ (ক) ১ তি ৬:৩-৪ দ্রঃ।

(খ) তীত ৩:১০ দ্রঃ। লক্ষণীয় বিষয়, পল দু'টো শাসনের পরে; তের্তুল্লিয়ানুস, সম্ভবত ভুলবশত, একটামাত্র শাসনের পরেই সম্পর্ক রাখতে বারণ করেন।

(গ) মথি ১৮:১৬ দ্রঃ।

২০ (ক) মথি ২৮:১৯ দ্রঃ।

(খ) সাম ৬৯:২৬; ১০৯:৮; প্রেরিত ১:২৩।

(গ) 'সাক্রামেন্ত': পুস্তকের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, 'রোমীয় সামরিক ভাষায় প্রচলিত 'সাক্রামেন্ত' শব্দটা তের্তুল্লিয়ানুসই প্রথম খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বে ব্যবহার করেন।' তিনি 'সাক্রামেন্ত' লাতিন শব্দ দ্বারা বাইবেলের 'রহস্য' শব্দটা অনুবাদ করেছিলেন। সেসময় থেকে মণ্ডলীর পিতৃগণ 'সাক্রামেন্ত' ও 'রহস্য' শব্দদ্বয় একই অর্থবাহক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন; প্রমাণ স্বরূপ, সাধু আম্ব্রোজ 'সাক্রামেন্তগুলি প্রসঙ্গ' ও 'রহস্যগুলি প্রসঙ্গ' নামক দু'টো পুস্তক লিখেছিলেন যা একই বিষয়, তথা বাপ্তিস্ম, এউখারিস্তিয়া ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত। কিন্তু মণ্ডলীর পিতৃগণ 'রহস্য' শব্দটা কেবল বাপ্তিস্ম, এউখারিস্তিয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যবহার করতেন না, বরং বাইবেলে যেমন, তেমনি তাঁরাও 'রহস্য' শব্দটা ঈশ্বরের সমস্ত **রহস্যময়** কর্মের বেলায় ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতেন। অন্য দিকে, মধ্যযুগ থেকে আজকাল পর্যন্ত 'সাক্রামেন্ত' শব্দটা প্রায়ই শুধু ৭টা সাক্রামেন্ত ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত, সেজন্য, পাঠক / পাঠিকাকে এ জটিল ব্যাপারে দিশেহারা না করার জন্য, এ পুস্তক ব্যাপী 'সাক্রামেন্ত' শব্দটা তের্তুল্লিয়ানুসের সাধারণ ধারণা অনুযায়ীই অনুবাদ করা হয়েছে তথা 'রহস্য' ও 'রহস্যময়' ব্যাপার বা বিষয়।
কিন্তু তবু এই অধ্যায়ে 'সাক্রামেন্ত' শব্দটাকে সংরক্ষণ করা হয়েছে, যেহেতু এখানে শব্দটা 'রহস্য' ধারণার পাশাপাশি সম্পূরক বা আনুসঙ্গিক আর একটা ধারণা বোঝায়; অর্থাৎ, এখানে 'সাক্রামেন্ত' বলতে তের্তুল্লিয়ানুস সেই সমস্ত রহস্যময় সত্য ও নির্দেশ বোঝান যা খ্রিষ্ট আপন শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন।

২১ (ক) মথি ১১:২৭; যোহন ৬:৪৬; ৭:২৮; ৮:১৯; ১০:১৫ দ্রঃ।

(খ) ২ থে ২:১৪ দ্রঃ।

২২ (ক) মার্ক ৪:৩৪।

(খ) মথি ১৩:১১ দ্রঃ।

(গ) মথি ১৬:১৮-১৯ দ্রঃ।

(ঘ) যোহন ২১:২০ দ্রঃ।

(ঙ) যোহন ১৯:২৬ দ্রঃ।

(চ) মথি ১৭:১-৮ দ্রঃ।

(ছ) মথি ১৮:১৬।

(জ) লুক ২৪:২৭ দ্রঃ। পুরো বাক্যটা ব্যঙ্গাত্মক বৈকি।

(ঝ) যোহন ১৬:১২-১৩।

২৩ (ক) গা ২:১১ দ্রঃ।

(খ) গা ১:১৩ দ্রঃ।

(গ) যোহন ৫:৩১ দ্রঃ।

(ঘ) গা ১:১৮ দ্রঃ।

(ঙ) গা ১:২৪ দ্রঃ।

(চ) গা ২:৯ দ্রঃ।

২৪ (ক) ১ করি ৯:২০-২২ দ্রঃ।

(খ) পিতর ও পল দু'জনে নিজেদের রক্তক্ষরণে নিজ নিজ শিক্ষা বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেছিলেন ও সাক্ষ্যমরণ বরণ করেছিলেন বিধায় তাঁরা সমকক্ষ। তের্তুল্লিয়ানুস বলতে চান, প্রৈরিতক অধিকারের দিক দিয়ে পলের তুলনায় পিতর প্রধান, কিন্তু শিক্ষাপ্রদান ও মৃত্যুবরণের দিক দিয়ে পিতর ও পল সমকক্ষ।

(গ) ২ করি ১২:২, ৪ দ্রঃ।

২৫ (ক) ১ তি ৬:২০ দ্রঃ।

(খ) ২ তি ১:১৪ দ্রঃ।

(গ) ১ তি ৬:১৩-১৪।

(ঘ) ২ তি ২:২।

(ঙ) ২ তি ২:২।

২৬ (ক) মথি ৭:৬।

(খ) মথি ১০:২৭ দ্রঃ।

(গ) লুক ১৯:২০-২৪ দ্রঃ।

(ঘ) মথি ৫:১৫ দ্রঃ।

(ঙ) ১ করি ১:১০ দ্রঃ।

(চ) মথি ৫:৩৭।

২৭ (ক) গা ৩:১।

(খ) গা ৫:৭।

(গ) গা ১:৬ দ্রঃ।

(ঘ) ১ করি ৩:১-২ দ্রঃ।

(ঙ) ১ করি ৮:২ দ্রঃ।

২৮ (ক) যোহন ১৪:২৬ দ্রঃ।

(খ) যোহন ১৫:২৬ দ্রঃ।

২৯ (ক) গা ১:৮ দ্রঃ।

৩০ (ক) 'এলেউথেরিউস' ১৭৪-১৮৯ সাল পর্যন্ত পোপ হয়েছিলেন।

(খ) ১ করি ১১:১৯ দ্রঃ।

(গ) মার্ক ১৪:২১ দ্রঃ।

(ঘ) তের্তুল্লিয়ানুস ব্যঙ্গ করেই মার্কিওনকে 'পবিত্রতম গুরু' বলে চিহ্নিত করেন, কেননা সেই মার্কিওন একেবারে দুশ্চরিত্র স্বভাবের মানুষ ছিল ও 'কৌমার্য সমর্থন' করত অর্থাৎ বিবাহ নিষেধ করত।

(ঙ) 'নিগিদিউস' সম্পর্কে কোন খবর নেই, কিন্তু কার্থাগোর চিত্রকর 'হের্মগেনেস' সম্পর্কে তের্তুল্লিয়ানুস নিজে অন্য একটা লেখায় ('হের্মগেনেসের বিপক্ষে' পুস্তকে) এই বর্ণনা দেন: 'তার অস্থির স্বভাবই তাকে ভ্রান্তমতের প্রতি আকৃষ্ট করে; বাচাল হওয়ায় সে নিজেকে সুবক্তা

মনে করে, ও নিজের নির্লজ্জতাকে সে মনের দৃঢ়তাই বলে। সে যে বিবেকাপন্ন তা তার পরচর্চায় ব্যক্ত হয়; তাছাড়া সে অনুচিত চিত্র আঁকে ও অবিরতই একটা বিবাহ থেকে অন্য বিবাহে ছুটে চলে। তার ভ্রান্তমত ঈশ্বর ও জড়বস্তুর মধ্যকার বিভেদের উপর নির্ভর করে; এবং স্তোয়া-মতবাদের পন্থী হওয়ায় সে বলে, ঈশ্বর জগৎকে সৃষ্টি করলেন, ও তেমন জড়বস্তু থেকে মানুষের দেহ ও আত্মা দু'টোই উৎপন্ন হল। তাছাড়া সেই ভ্রান্তমতপন্থী এমনটা সমর্থন করে যে, পিতা ও পুত্র হলেন একটামাত্র ব্যক্তি।'

৩১ (ক) মথি ১৩:২৪ দ্রঃ।

৩২ (ক) 'ক্লেমেণ্টকে পিতর দ্বারা বিশপপদে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছিল।' তের্তুল্লিয়ানুস এখানে সেকালে প্রচলিত একটা জনশ্রুতি উপস্থাপন করছেন, কেননা প্রকৃতপক্ষে সাধু ক্লেমেণ্ট আনুমানিক ৯০ খ্রিষ্টাব্দে পোপ পদে নিযুক্ত হন, অর্থাৎ সাধু পিতরের মৃত্যুর প্রায় ২৫ বছর পরে। সেসময় রোমের প্রথম চার পোপ বিষয়ক ধারণা অস্পষ্ট ছিল। সেকালের নানা দলিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আজকালে সমর্থিত পোপ-তালিকা হলো: সাধু পিতর (মৃত্যু ৬৬ খ্রিষ্টাব্দে), সাধু লিনুস (৬৬-৭৮ খ্রিষ্টাব্দ), সাধু আনাক্লেতুস (৭৮-৯০ খ্রিষ্টাব্দ), সাধু ক্লেমেণ্ট (৯০-৯৯ খ্রিষ্টাব্দ)।

(খ) 'সাক্রামেন্তের বিভিন্নতা': 'সাক্রামেন্ত' সম্পর্কে ২০ গ বিস্তারিত টীকা দ্রঃ। এপদে সাক্রামেন্ত বলতে কাথলিক ধর্মতত্ত্ব বোঝায়। সুতরাং ভ্রান্তমতগুলো প্রৈরিতিক নয় যেহেতু সেগুলোর ধর্মতত্ত্ব বিভিন্নতা দ্বারা দূষিত।

৩৩ (ক) ১ করি ১৫:২ দ্রঃ।

(খ) 'সেই মার্কিওন, আপেল্লেস, ভালেন্তিনুস ও সেই অন্যান্যরা যারা মাংসের পুনরুত্থান লঙ্ঘন করত ...': উল্লিখিত ভ্রান্তমতস্থীরা জ্ঞানমার্গপন্থী হওয়ায় 'মাংসের পুনরুত্থান' অস্বীকার করত কেননা, তাদের মতে, মাংস বা দেহ মূল্যহীন, কেবল জ্ঞান বা আত্মাই গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রতিবাদ করে তের্তুল্লিয়ানুস 'caro cardo salutis' (কারো কার্দো সালুতিস) প্রখ্যাত বাক্য ব্যবহার করেছিলেন, যার আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় 'মাংসই পরিত্রাণের কবজা', অর্থাৎ মাংসই সেই কবজা তথা সেই উপায় যার উপরে পরিত্রাণ নির্ভর করে, কেননা, তিনি বলে চলেন, 'যখন আত্মা ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত, তখন মাংসই প্রকৃতপক্ষে আত্মাকে তেমন নিবেদনের জন্য সক্ষম করে তোলে। কেননা মাংস অবশ্যই [বাপ্তিস্মে] প্রক্ষালিত হয় যাতে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা যেতে পারে। মাংস তৈলসিক্ত হয় যাতে আত্মাকে পবিত্রীকৃত করা যেতে পারে। মাংস [বাপ্তিস্মের] সীল দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হয় যাতে আত্মা দৃঢ়তা অর্জন করে। মাংসের উপর হস্তার্পণের ছায়া বিস্তার করা হয় যাতে মানবাত্মা পবিত্র আত্মা দ্বারা আলোপ্রাপ্ত হয়। মাংস খ্রিষ্টের দেহ ও রক্তে পুষ্ট হয় যাতে আত্মা ঈশ্বরে সমৃদ্ধি লাভ করে' (মাংসের পুনরুত্থান প্রসঙ্গ, ৮ অধ্যায়)।

সুতরাং, যখন সেই ভ্রান্তমতপন্থীরা 'বাণী হলেন মাংস' (যোহন ১:১৪) সত্যকে হেয়জ্ঞান ক'রে যিশুর দেহকেও হেয়জ্ঞান করত, তখন মণ্ডলীর যে সাক্রামেন্তসমূহ আত্মার কল্যাণের জন্য দেহের উপরে সম্পাদিত, সেই সমস্ত সাক্রামেন্তও অসার হয়ে যেত। অন্য দিকে, যখন

মাংস আত্মার জন্য প্রয়োজন, তখন বিশ্বাস-সূত্র অনুসারে খ্রিষ্টমণ্ডলী মাংসেরও পুনরুত্থান বিশ্বাস করে।

(গ) ১ তি ৪:৩ দ্রঃ।

(ঘ) ২ তি ২:১৮ দ্রঃ।

(ঙ) ১ তি ১:৪।

(চ) 'কেবল এক নামও-বিশিষ্ট নয় একটা এওন' : সেই এওনের প্রথম নাম ছিল Προών (প্রওন) অর্থাৎ প্রথম সত্তা, তার দ্বিতীয় নাম ছিল Προπάτωρ (প্রপাতোর) অর্থাৎ আদিপিতা, ও তার তৃতীয় নাম ছিল Βύθος (বিথোস বা বুথোস) অর্থাৎ গভীরতা। সেজন্য তের্তুল্লিয়ানুস বলেন, 'কেবল এক নামও-বিশিষ্ট নয় একটা এওন'।

(ছ) গা ৪:৯ দ্রঃ।

(জ) প্রকাশ ২:২০ দ্রঃ।

(ঝ) এই গায়ানা ভ্রান্তমত সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন তথ্য নেই।

(ঞ) ১ যোহন ৪:২; ২:২২ দ্রঃ।

(ট) প্রেরিত ৮:১৮।

৩৪ (ক) লুক ৬:৪০ দ্রঃ।

(খ) 'উপরে উল্লিখিত সেই পরবর্তী-নির্দেশক নিয়মের ভিত্তিতে', অর্থাৎ ৩১-৩২ অধ্যায় দ্রঃ।

৩৬ (ক) এশিয়া : রোম-সাম্রাজ্যের এশিয়া ছিল আজকাল তুরস্ক।

(খ) প্রকাশ ১:৯ দ্রঃ।

৩৮ (ক) 'ধর্মতত্ত্বের যন্ত্রসমূহ' : ভালেন্তিনুস সেই যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে শাস্ত্রকে রাখল কিন্তু সেটার অপব্যাখ্যা করল, এবং মার্কিওন সেই যন্ত্রপাতি দিয়ে শাস্ত্রকে পরিচ্ছেদিত করল অর্থাৎ শাস্ত্র থেকে নানা অংশ ছেদন করল।

৩৯ (ক) ১ করি ১১:১৯।

৪০ (ক) এই অধ্যায়ে 'সাক্রামেন্তগুলো' শব্দের অর্থ মোটামুটি আজকালে প্রচলিত অর্থের শামিল।

(খ) 'মিথ্রা'-উপাসনা প্রথম শতাব্দীর একটা আন্দোলন যা মিথ্রা নামক পারস্য সূর্য-দেবকে কেন্দ্র করত; আন্দোলনটা রোমে বিশেষভাবে ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীতে সৈন্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সেকালের প্রায়ই সকল খ্রিষ্টিয়ান লেখকগণ (যেমন সাধু ইউস্তিনুস, ১ম পক্ষসমর্থন ৬৬ অধ্যায়) মিথ্রা উপাসনাকে খ্রিষ্টধর্মের প্রত্যক্ষ শত্রু বলে গণ্য করতেন।

(গ) নুমা পম্পিলিউস (খ্রিঃপূঃ ৭১৫-৬৭৩), রোমের দ্বিতীয় রাজা; কথিত আছে, তিনি ছিলেন খুব ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি যিনি নিজ রাজত্বকালে কখনও যুদ্ধ করেননি।

৪১ (ক) মথি ৭:৬ দ্রঃ। এখানে এউখারিস্তীয় রুটির কথা নির্দেশিত।

৪৩ (ক) মথি ৭:৭।

(খ) সাম ১১১:১০; সিরা ১:১৬ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ।

৪৪ (ক) ২ করি ৫:১০।

বাপ্তিস্ম প্রসঙ্গ

প্রেরিতদূতগণ প্রভু যিশুর আদেশক্রমে বিশ্বের সকল মানুষকে বাপ্তিস্ম দিতে প্রেরিত হয়েছিলেন। এবিষয়ে আমরা বাইবেলের প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে ও সাধু পলের পত্রাবলিতে যথেষ্ট সাক্ষ্য পাই যে, আদিমণ্ডলী প্রভুর সেই আদেশ পালন করে বাপ্তিস্ম সম্পাদন করছিল। কিন্তু এবিষয়েও আমরা অবগত যে, কালক্রমে মণ্ডলীতে নানা তত্ত্ব ও ধর্মক্রিয়া উৎপন্ন হতে লাগল যা ভ্রান্তিজনক হওয়ায় বিশ্বাসীদের দিশেহারা করছিল।

২য় ও ৩য় শতাব্দীতে খ্রিষ্টমণ্ডলীর বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত পরম্পরাগত শিক্ষা ও ধর্মরীতি উপস্থাপন ক্ষেত্রে তের্তুল্লিয়ানুসই বিশেষভাবে প্রধান ব্যক্তিত্বের মধ্যে অন্যতম; এবং তাঁর লেখা 'বাপ্তিস্ম প্রসঙ্গ' কথাটা প্রমাণিত করে।

সেসময় গায়ানা ভ্রান্তমত বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত যা কিছু মণ্ডলীতে প্রচলিত ছিল তা ধ্বংস করবে বলে অভিপ্রায় করছিল; বস্তুত ভ্রান্তমতটা মণ্ডলীতে প্রবেশ করে যথেষ্ট বিশ্বাসীকে ভুল পথে কেড়ে নিচ্ছিল। সেজন্য, এ ভ্রান্তমত অনুসারে যারা বাপ্তিস্মকে নিষ্প্রয়োজন ও অকার্যকর মনে করছিল, তাদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে তের্তুল্লিয়ানুস ভ্রান্তিজনক তত্ত্বগুলো প্রতিরোধ করতে করতে নব-বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত বা দিশেহারা মানুষকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে বাপ্তিস্ম বিষয়ক ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন, যাতে করে এসত্য প্রকাশ পায় যে, বাপ্তিস্ম যে প্রয়োজন তা শুধু নয়, বরং বাপ্তস্ম হলো বিশ্বাসের সীল স্বরূপ। কেননা পরিত্রাণ পাবার লক্ষ্যে কেবল বিশ্বাসও যথেষ্ট নয়, কেবল বাপ্তিস্মও যথেষ্ট নয়; বরং বিশ্বাস ও বাপ্তিস্ম দু'টোই দরকার।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০

১। ভূমিকা

সুখী আমাদের জলের রহস্য! কারণ সেই রহস্য আমাদের আগেকার অন্ধতার অপরাধ ধৌত করায় আমরা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে মুক্তিলাভ করি। তেমন বিষয় সংক্রান্ত পুস্তক অপর্যাপ্ত হবে না, কেননা যাদের সবেমাত্র গঠন করা হচ্ছে, পুস্তকটা

কেবল তাদেরই নয়, কিন্তু তাদেরও শিক্ষাদান করবে যারা পরম্পরার যুক্তিকতা বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে সরলমনা হয়ে বিশ্বাস করেছে বলে তুষ্ট হয়ে অজ্ঞতাবশত অপরীক্ষিত তবুও সম্ভাব্য বিশ্বাস বহন করে থাকে। এর ফলাফল স্বরূপ, সম্প্রতিকালে এইখানে চলাচল করছিল গায়ানা ভ্রান্তমতের (ক) যে বিষাক্ত সাপ, তা সর্বোপরি বাপ্তিস্মকেই ধ্বংস ক'রে নিজের অধিক বিষাক্ত ধর্মতত্ত্ব দিয়ে বহুজনকে কেড়ে নিয়েছিল; এ এমন কিছু যা প্রকৃতি অনুযায়ী, কেননা সাপ ও কেউটে ও সেই রাজসাপ (খ) নিজেও সাধারণত শুষ্ক ও জলহীন যায়গায় ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ক্ষুদ্র মৎস্য এই আমরা আমাদের ΙΧΘΥΣ (গ) [ইখ্থিস (বা ইখ্থুস) - মৎস্য] যিশুখ্রিষ্টের আদর্শে জলেই জন্ম নিই, ও জলে অবিরত থেকে যাওয়ার মাধ্যমে ছাড়া অন্যভাবে রক্ষা পাই না। এভাবে, অখণ্ড ধর্মশিক্ষা প্রদানের ব্যাপারে যার কোন অধিকার ছিল না (ঘ), সেই দানবী (ঙ) ভাল করেই জানত সেই ক্ষুদ্র মৎস্যগুলো জল থেকে বের করে এনে কীভাবে সেগুলোকে বধ করতে হয়।

২। ঈশ্বরের কর্মসম্পাদনের পদ্ধতি

আচ্ছা, কিন্তু ভ্রষ্টতার যে শক্তি বিশ্বাসকে টলাতে পারে বা তা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করার ব্যাপারে বাধা দিতে পারে, সেই শক্তি কেমন মহৎ যে, বিশ্বাস যার উপর নির্ভর করে ঠিক সেই ক্ষেত্রেই তা আক্রমণ করে! কর্মে দৃশ্যমান যে ঐশকর্ম, সেটার সরলত্বের চেয়ে, এবং কর্মফলে প্রতিশ্রুত মাহাত্ম্যের চেয়ে আদৌ আর এমন কিছুই নেই যা মানুষের মন তত কঠিন করতে পারে। এর ফলে, তেমন সরলত্বে, বাহ্যিক আকর্ষণ ছাড়া, নবীন মহৎ কোন কর্মব্যবস্থা ছাড়া, এমনকি বিনা খরচেই যে মানুষকে জলে নামিয়ে দেওয়া হয়, ও অল্প ক'টা বচন উচ্চারিত হতে হতে তাকে নিমজ্জিত করা হলে সে যে আগের চেয়ে তত পরিষ্কার-নয় অবস্থায় এমনকি আগের চেয়ে আদৌ পরিষ্কার-নয় অবস্থায় পুনরায় উত্থিত হয়, তা এমন, যে অনন্তত্ব-লাভ আরও বেশি অবিশ্বাস্য বিষয় বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু এর বিপরীতে, প্রতিমাপূজার মহৎ ও রহস্যময় অনুষ্ঠানগুলো যদি আকর্ষণীয়তা, মহৎ কর্মব্যবস্থা ও খরচ থেকেই বিশ্বাস্যতা ও অধিকার অর্জন না করে, তাহলে আমি মিথ্যাবাদী। আহা, দুর্ভাগা অবিশ্বাস, তুমি যে প্রায়ই ঈশ্বরের কাছে তাঁর স্বীয় গুণাবলি

তথা সরলত্ব ও প্রতাপ অস্বীকার কর। তবে কী? এটাও কি বিস্ময়কর নয় যে, মৃত্যুকে প্রক্ষালন দ্বারা ধুয়ে ফেলা হয়? কিন্তু ব্যাপারটা তখনই আরও বেশি বিশ্বাসের যোগ্য, যখন যা বিস্ময়কর, তা বিস্ময়কর বলেই বিশ্বাস করা হয় না। কেননা যে কর্মগুলো সমস্ত বিস্ময়ের ঊর্ধ্বে, সেগুলো ছাড়া আর কোন্ কর্মগুলো ঈশ্বরের কর্মকে মানায়? আমরা নিজেরাও বিস্মিত হই, কিন্তু একারণে যে, আমরা বিশ্বাস করি। অপরদিকে অবিশ্বাস বিস্মিত হয় কিন্তু বিশ্বাস করে না, কেননা যা কিছু সহজ-সরল অবিশ্বাস তাতে অসার কিছু যেনই বিস্মিত হয়, ও যা কিছু মহৎ তাতে অবিশ্বাস্য যেনই বিস্মিত হয়। যদিও তুমি মনে কর সেকথা ঠিক, তবু উভয় বিষয় ক্ষেত্রে সেই ঐশবচনই যথেষ্ট যা আগে ঘোষিত হয়েছিল, তথা, *জগতের যা মূর্খ, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন জগতের প্রজ্ঞাকে লজ্জা দেবার জন্য, এবং মানুষের পক্ষে যা কঠিন, তা ঈশ্বরের পক্ষে সহজ* (ক)। কেননা ঈশ্বর প্রজ্ঞাবান ও পরাক্রমী হলে (এবং একথা তারাও অস্বীকার করে না যারা তাঁর পাশ কটিয়ে চলে), তবে এ যুক্তিসঙ্গত যে, প্রজ্ঞা ও পরাক্রমের যা যা বিপরীত তাতেই অর্থাৎ মূর্খতা ও অসাধ্যতায়ই তিনি নিজের কর্মকাণ্ডের কারণগুলো স্থিত করে থাকেন; কেননা যেকোন শক্তি যা দ্বারা আহূত হয়, তা থেকে নিজের মূলকারণ গ্রহণ করে।

৩। জলই ঐশকর্মের বেছে নেওয়া উপাদান

উপরে উচ্চারিত কথাকে নিয়মই যেন স্মরণ করা সত্ত্বেও আমরা মনে করি, ব্যাপারটা কেমন মূর্খ ও অসাধ্য যে, পুনঃপ্রতিষ্ঠা জল দ্বারা সাধিত হয় (ক)। কোন্ ভিত্তিতে এই জড়পদার্থ তেমন মর্যাদাপূর্ণ ভূমিকার যোগ্য হল? আমি মনে করি, তরলপদার্থের অধিকার পরীক্ষা করা দরকার আছে। আসলে এক্ষেত্রে প্রমাণ বহু, এমনকি আদি থেকেই বর্তমান। কেননা জল সেই বিষয়গুলোর একটা, যেগুলো জগৎ অলঙ্কৃত হবার আগে ঈশ্বরের সঙ্গে তখনও অগঠিত আকারে আরামে বিরাজ করছিল। শাস্ত্রে বলে, *আদিতে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করলেন। পৃথিবী ছিল অদৃশ্যমান ও অগঠিত, ও অন্ধকার অতল গহ্বরের উপর বিরাজ করত, এবং প্রভুর আত্মা জলরাশির উপরে চলাচল করতেন* (খ)। হে মানুষ, প্রথমত তোমাকে জলের বয়স মান্য করতে হয়, কারণ সেই জলের পদার্থ প্রাচীন; দ্বিতীয়ত, জলের যোগ্যতা, কারণ সেই জল ছিল

ঐশআত্মার আসন, এমন আসন যা সেকালে বিদ্যমান অন্যান্য পদার্থের চেয়ে তাঁর কাছে নিঃসন্দেহে বেশি গ্রহণযোগ্য। কেননা তারানক্ষত্রের অলঙ্কারের অনুপস্থিতিতে অন্ধকার ছিল একেবারে কদাকার, সেই গহ্বর ছিল বিষণ্ন, পৃথিবী অসজ্জিত, ও আকাশ অগঠিত; সেই যে জল সর্বদাই নিখুঁৎ, আনন্দময়, সরল, নিজেতেই শুচি, কেবল সেই জলই ঈশ্বরের জন্য যোগ্য বাহন যোগাচ্ছিল। এবং জলই যে একপ্রকারে ছিল সেই নিয়ন্ত্রণ-শক্তি যা দ্বারা জগতের বিন্যাস সেসময় থেকে ঈশ্বর দ্বারা স্থির করা হয়েছিল, এবিষয়ে কী বলব? কেননা স্বর্গীয় আকাশপরদা মাঝখানে ঝুলাবার জন্য তিনি জলরাশি পৃথক পৃথক করেছিলেন (গ), ও স্থলভূমি ঝুলাবার জন্য জলরাশিকে একস্থানে সরিয়ে দিয়েছিলেন (ঘ)। নিজ নিজ উপাদান দ্বারা জগৎকে সুবিন্যস্ত হওয়ার পর যখন বাসিন্দারা আবির্ভূত হলো, তখন জলই সর্বপ্রথমে প্রাণীদের উৎপাদন করার নির্দেশ (ঙ) গ্রহণ করেছিল। যা কিছু জীবন্ত, জলই সর্বপ্রথমে তা উৎপাদন করেছিল, যাতে বাপ্তিস্ম ক্ষেত্রে এমনটা বিস্ময়ের ব্যাপার না হয় যে, জল জীবনদান করতে জানে। বাস্তবিকই, মানুষকে গড়া কর্মকাণ্ডও কি জলের সহায়তায় (চ) সম্পন্ন হয়নি? পদার্থটা ভূমি থেকেই আগত বটে, কিন্তু সেই মাটি আর্দ্র ও রসপূর্ণ না হলে কাজে তত আসে না; চতুর্থ দিনে নিজ স্থানে সরিয়ে দেওয়া সেই জলই নিজের বাকি আর্দ্রতা দ্বারা সেই মাটিকে উপযুক্ত উপাদান করে তুলেছিল। আমি যদি সেসময় থেকে শুরু করে সর্বতভাবে বা দীর্ঘতর ভাবে সবকিছু বর্ণনা করতাম, এপদার্থের ‘অধিকার’ সংক্রান্ত সেই প্রমাণসমূহ তথা জলের কেমন প্রতাপ ও অনুগ্রহ, জল যে কতগুলো প্রতিভা-বিশিষ্ট যন্ত্রপাতি, কতগুলো ক্রিয়াকাণ্ড ও কেমন উপযোগী উপকরণ জগৎকে যুগিয়ে দেয়, এসমস্তও যদি ব্যাখ্যা করতাম, তবে ভয় হচ্ছে এমনটা মনে হবে, আমি বাপ্তিস্মের যুক্তিসমূহের চেয়ে বরং জলেরই প্রশংসা সংগ্রহ করেছি; যদিও এক্ষেত্রে আমাকে আরও দীর্ঘতর ভাবে এ শেখাতে হত যে, এবিষয়ে সন্দেহ করতে নেই যে, ঈশ্বর এই যে জড়পদার্থ তাঁর সমস্ত গড়া বস্তু ও কর্মকাণ্ড জুড়েই বিন্যস্ত করেছেন, তা তিনি তাঁর বিশিষ্ট রহস্যগুলো ক্ষেত্রেও প্রতীয়মান করেছেন, যাতে পার্থিব জীবনকে যা নিয়ন্ত্রণ করে, তা স্বর্গীয় জগতেও উপযোগিতা রাখে।

৪। ঐশআত্মা যে আদিতে জলরাশির উপর চলাচল করছিলেন, তা বাপ্তিস্মের প্রতীক

কিন্তু, এটাই যথেষ্ট হোক যে আমরা প্রারম্ভেই সেই সমস্ত বিষয় উপস্থাপন করেছি যেগুলোতে বাপ্তিস্মের সেই প্রাথমিক মূলকারণ স্বীকৃত যা রীতিমত বাপ্তিস্মের প্রতীক সম্পর্কে ঈশ্বরের সেই আত্মাকে চিহ্নিত করছিল যিনি যেমন আদি থেকে জলরাশির উপরে চলাচল করছিলেন, তেমনি বাপ্তিস্ম গ্রহণকারীদের জলের উপরে বিশ্রাম করবেন। কিন্তু পবিত্র কিছু পবিত্র অন্য কিছুর উপরে চলাচল করছিল, বা অন্য কথায়, যা উপরে চলাচল করছিল, তা যেটার উপরে চলাচল করছিল, তা থেকেই পবিত্রতা ধার নিচ্ছিল, কেননা সব ক্ষেত্রে যেমনটা এটা আবশ্যক যে, যা কিছু নিম্নস্থিত তা নিজের উপরে ঝুলন্ত যা কিছু রয়েছে তা থেকে তার গুণাবলি কেড়ে নেবে, তেমনি মহত্তর কারণে যা আধ্যাত্মিক, যেহেতু তার নিজের সূক্ষ্ম সত্তা দ্বারা তার পক্ষে ভেদ করা ও প্রবেশ করা সহজ, সেজন্য যা দৈহিক তাও সেটা থেকে সেটার গুণাবলি গ্রহণ করতে পারে। এভাবে পবিত্র আত্মা দ্বারা পবিত্রিত হয়ে জল-পদার্থটাও পবিত্রিত করার ক্ষমতা গর্ভধারণ করল।

এমন কেউ যেন না বলে, 'তবে, সেই যে জল আদিতে হয়েছিল, আমরা কি সত্যি সেই জলে নিমজ্জিত হই? না, ঠিক সেই জলে নয়, কেবল সেটার একটা অংশেই যেন, কেননা সেই জলের জাত অনন্য হলেও তবু তার প্রজাতি বহুবিধ। কারণ জাতের উপাদান যা, তা প্রজাতিতেও পুনরায় প্রবাহিত হয়। ফলে, মানুষ যে সাগরে বা পুকুরে, জলস্রোতে বা জলের উৎসে, হ্রদে বা জলকুণ্ডে প্রক্ষালিত হয়, তাতে কোন পার্থক্য নেই; তাদেরও মধ্যে কোন পার্থক্য নেই যাদের যোহন যর্দনে (ক) ও পিতর তিবেরিসে নিমজ্জিত করেছিলেন; আর সেই যে কঞ্চুকীকে ফিলিপ পথিমধ্যে এমনিই পাওয়া জলে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন (খ), তাতে তিনি পরিত্রাণের দিক দিয়ে [অন্যান্যদের তুলনায়] বেশি বা কম পাননি। অতএব, নিজের উৎপত্তির সেই আদিকালীন বিশেষ অধিকার গুণে যেকোন জল ঈশ্বরকে মিনতির পরে (গ) পবিত্রীকরণের রহস্যময় অধিকার রাখে। কেননা আত্মা তখনই স্বর্গ থেকে এসে সেই জলের উপরে অধিষ্ঠান করায় নিজে থেকে সেই জল পবিত্রিত করেন; আর এভাবে পবিত্রিত হয়ে সেই জল পবিত্রিত করার প্রভাবও পান করে।

যদিও সহজ-সরল ঘটনা ক্ষেত্রে তুলনাটাকে মানাতে পারে, তবু ময়লা দ্বারাই যেন পাপ দ্বারা কলঙ্কিত এই আমাদের পক্ষে সেই মলিনতা থেকে সেই জলে ধৌত হওয়া উচিত। কিন্তু যেমন পাপ আমাদের মাংসময় অবস্থায় দেখা দেয় না যেহেতু কেউই নিজের চামড়ায় প্রতিমাপূজা বা ব্যভিচার বা ছলনার কোন দাগ বহন করে না, তেমনি সেই ধরনের মানুষ সেই আত্মায়ই মলিন যে-আত্মা পাপের প্রণেতা। বেননা [পবিত্র] আত্মাই প্রভু, মাংস দাস। অথচ মানুষের আত্মা ও মাংস দু'টোই অপরাধের সহভাগী: আত্মা এজন্য অপরাধী যে, সে হুকুম দেয়; মাংস এজন্য যে, সে দাসত্ব করে। সুতরাং জল দূতদের মধ্যস্থতা দ্বারা এক প্রকারে নিরাময়-শক্তি অর্জন করার পর আত্মাও জলে দৈহিক ভাবে ধৌত হয় ও মাংসও একই জলে আধ্যাত্মিক ভাবে শুচীকৃত হয়।

৫। বিধর্মীদের দ্বারা তেমন জল ব্যবহার সম্পর্কে

কিন্তু তবু আধ্যাত্মিক প্রভাবগুলো সংক্রান্ত যেকোন জ্ঞান ক্ষেত্রে বিরোধী যারা, সেই বিজাতীয়েরা তাদের দেবতাগুলোকে একই কর্মফলতা আরোপ করে। হ্যাঁ, ওরা করে, কিন্তু বিধবা-জল ব্যবহার করায় ওরা নিজেদের প্রবঞ্চিত করে। কেননা কোন না কোন পবিত্র ধর্মানুষ্ঠানে, যেমন সেই তথাকথিত ইসিস ও মিথ্রার (ক) ধর্মানুষ্ঠানে, ওরা প্রক্ষালন দ্বারা দীক্ষিত হয়; সেই দেবতাগুলোকেও ওরা প্রক্ষালন দ্বারা মহিমান্বিত করে। তাছাড়া জল বহন করে ও তা ছিটিয়ে ছিটিয়ে ওরা জমিদারি, বাড়ি-ঘর, মন্দির ও গোটা শহরগুলোর জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি সম্পাদন করে। একথা নিশ্চিত যে, আপল্লিনারিস (খ) ও পেলুসিস (গ) ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা উপলক্ষে ওদের নিমজ্জিত করা হয়, ও স্পর্ধাভরে এমনটা সমর্থন করে যে, তেমন কর্মের ফলে ওরা পুনর্জন্ম লাভ করে ও নিজেদের কৃত মিথ্যা শপথ ক্ষেত্রে দায়মুক্তিও অর্জন করে। আরও, প্রাচীনদের মধ্যে যে কেউ নরহত্যা দায়ে নিজেকে কলুষিত করত, সে শুদ্ধতাদানকারী জলের অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়াত। সুতরাং, ধৌত করা-ই যে পদার্থের স্বকীয় গুণ, সেই জলের প্রকৃতি মাত্রই যখন শুদ্ধিকরণের দৈবলক্ষণে বিশ্বাস রাখতে ভক্তকে আশান্বিত করে, তখন মহত্তর কারণে, যাঁর দ্বারা জলের খোদ প্রকৃতি স্থির করা হয়েছিল, সেই ঈশ্বরের অধিকারগুণে সেই জল আর কতই না সত্যকার কার্যকারিতা প্রদান করবে। ওরা যদি মনে করে, ধর্মের গুণে

জল আরোগ্য দান করে, তাহলে জীবনময় ঈশ্বরের ধর্মের চেয়ে কোন্ ধর্ম অধিক শ্রেয়তর? তেমনটা মেনে নিয়ে আমরা এখানে সেই দিয়াবলের প্রচেষ্টাও স্বীকার করছি যে ঈশ্বরের যা, সেটার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, কেননা সে আপনজনদের মধ্যে বাপ্তিস্মও ব্যবহার করে থাকে। এতে সাদৃশ্যটা কি? অশুচি শুচিতা দান করে, ধ্বংসনকারী মুক্তিদান করে, অভিশপ্ত পাপক্ষমা সম্পাদন করে। যে অপরাধ সাধনে নিজেই উস্কানি দেয়, সেই অপরাধ মুছিয়ে দেওয়ায় সে নিজের কাজ ধ্বংস করবে বৈকি। সেই বিশ্বাসত্যাগীদেরই বিপক্ষে সাক্ষ্য হিসাবে এসমস্ত উপস্থাপন করা হয়েছে যারা ঈশ্বরের বিষয়গুলোতে সামান্যতম বিশ্বাস রেখে, সেই ঐশকর্মকাণ্ডের অনুকরণে ঈশ্বরের সেই প্রতিযোগীর সাধিত বিকৃত কর্মকাণ্ডে বিশ্বাস রাখে।

এমনটা কি হয় না যে, আদিতে ঐশআত্মার গর্ভগতি জাল ক'রে অশুচি আত্মাগুলোও অন্য সময় কোন রহস্য বাদে জলরাশির উপরে তাঁ দেয়? এব্যাপারে সাক্ষী হলো সেই সকল অন্ধকার স্থান, দূরবর্তী যত জলস্রোত, স্নানাগারের যত জলকুণ্ড, বাড়ি-ঘরের যত নালা অথবা যত কুণ্ড ও কুয়ো যেগুলো, বলা হয়, ক্ষতিকারক কোন অপদূতের প্রভাবে লোকদের কেড়ে নেয়। যত মানুষ ডুবে মারা গেছে বা উন্মাদনা বা ভয়েতে আক্রান্ত, তাদের ওরা 'এসিএতোস'(ঘ) বা শোথারোগে ও জলভীতিরোগে আক্রান্ত বলে থাকে।

আমরা এদের কথা উত্থাপন করছি কেন? যাতে এমনটা বিশ্বাস করা কারও কাছে কঠিন না লাগে যে, একদিকে ঈশ্বরের এক পবিত্র দূত মানুষের পরিত্রাণের লক্ষ্যে জল উপযোগী করতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, আর একদিকে একটা অপদূত মানুষের বিনাশের লক্ষ্যে সেই একই পদার্থের সঙ্গে অপবিত্র সংসর্গে ব্যস্ত থাকে। একটা দূত যে জলের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করে, তা যদি অচিন্তনীয় মনে হয়, তবে, একদিন যা ঘটবার কথা ছিল, তা সেটারই একটা উদাহরণ। হ্যাঁ, একটা দূত নেমে এসে বেথ্সাইদা জলকুণ্ডের জলে কাঁপন জাগালেন (ঙ)। যারা অসুস্থতার কারণে বিলাপ করত, তারা লক্ষ রাখত; কারণ যে কেউ সকলের আগে জলে নেমে যেত, প্রক্ষালনের পরে সে আর বিলাপ করত না। যে নিয়ম অনুসারে যা কিছু মাংসময় তা সবসময়ই আধ্যাত্মিক কিছুর প্রতীক হিসাবে অগ্রেই ঘটে, সেই নিয়ম অনুসারে এই দৈহিক আরোগ্যলাভের প্রতীক আধ্যাত্মিক আরোগ্যলাভের কথা গাইছিল। তাই ঈশ্বরের অনুগ্রহ মানুষদের মাঝে

এগোতে এগোতে মহত্তর শক্তি জলকে ও দূতকে আরোপ করা হচ্ছিল। যারা শারীরিক দোষ নিরাময় করত, তারা এখন আত্মাকে আরোগ্য দান করে; যারা সাময়িক পরিত্রাণ সাধন করত, তারা এখন অনন্ত পরিত্রাণ ফিরিয়ে আনে; যারা বছরে একবার মাত্র মুক্তিদান করত, অপরাধের প্রক্ষালন দ্বারা মৃত্যু বিলীন হয়েছে বিধায় তারা এখন প্রতিদিন জাতিগুলোকে রক্ষা করে। দোষ দূরীকৃত হলে দণ্ডও দূরীকৃত হয়। তাই, যে মানুষকে একদিন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া হয়েছিল (চ), সেই মানুষকে ঈশ্বরের সাদৃশ্যে ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে আনা হয়। প্রতিমূর্তিটা বাহ্যিক রূপে, ও সাদৃশ্যটা অনন্তত্বে পরিগণিত। কেননা মানুষ ঈশ্বরের ফুৎকার দ্বারা ঈশ্বরের যে আত্মাকে পেয়েছিল কিন্তু অপরাধের দ্বারা হারিয়ে ফেলেছিল, সে ঈশ্বরের সেই আত্মাকে ফিরে পাচ্ছে।

৬। পবিত্র আত্মার অগ্রবর্তী দূত সম্পর্কে

আমরা যে জলে পবিত্র আত্মাকে পাই তা নয়, কিন্তু সেই জলে শুচীকৃত হয়ে আমাদের সেই দূতের অধীনে পবিত্র আত্মার জন্য প্রস্তুত করা হয় (ক)। এক্ষেত্রেও একটা প্রতীক আগে থেকে দেওয়া হয়েছিল, কারণ এইভাবে প্রভুর অগ্রদূত সেই যোহন প্রভুর পথ প্রস্তুত করেছিলেন (খ)। তেমনি বাপ্তিস্মের মধ্যস্থ সেই দূতও, আমাদের উপরে যাঁর আসবার কথা, সেই পবিত্র আত্মার জন্য পথ সরল করেন, তিনি সেই অপরাধ-প্রক্ষালনের মাধ্যমেই তা করেন যে-অপরাধ-প্রক্ষালনকে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় সীলমোহরযুক্ত বিশ্বাস অনুনয় ক'রে অর্জন করে। আচ্ছা, প্রতিটি কথা তিনজন সাক্ষীর প্রমাণে স্থির করা হবে (গ) বচনটার ভিত্তিতে, যখন আশীর্বাদের দ্বারা আমরা বিশ্বাসের সেই সাক্ষীত্রয়কে ও পরিত্রাণের সেই জামিনত্রয়কে পেয়ে থাকি, তখন মহত্তর কারণে আমাদের প্রত্যাশা-প্রাপ্তির নিশ্চয়তা ক্ষেত্রে ঐশনামত্রয়ের সংখ্যাও কি যথেষ্ট হবে না? তাছাড়া, যখন বিশ্বাস-স্বীকৃতি ও পরিত্রাণ-শপথ সেই তিন সাক্ষীর অধীনে অঙ্গীকৃত হয়েছে, তখন অবশ্যই মণ্ডলীর উল্লেখও যোগ করা হবে, কেননা যেখানে সেই তিনজন, তথা পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা বিরাজিত, সেখানে সেই মণ্ডলী বিরাজিত, যে মণ্ডলী তিনজনকে নিয়ে এক দেহ (ঘ)।

৭। তৈললেপন

তারপর, জলকুণ্ড থেকে বের হয়ে আমাদের আশীর্বাদিত তৈললেপনে লেপন করা হয় (ক); এ এমন প্রাচীন রীতি (খ) যা অনুসারে, যাজকত্ব বরণ অনুষ্ঠানে মানুষকে একটা শিঙের তেল দিয়ে অভিষিক্ত করা হত, সেই সময় থেকে যখন আরোনকে মোশি দ্বারা তৈলাভিষিক্ত করা হয়েছিল (গ); এজন্য আরোন সেই খ্রিষ্মা [মলম] থেকে 'খ্রিষ্ট' বলে অভিহিত যা এমন তৈলাভিষেক যা আত্মিক হয়ে ওঠার পর প্রভুর জন্য উপযুক্ত নাম যুগিয়ে দিল; কেননা তিনি পিতা ঈশ্বর দ্বারা আত্মায় তৈলাভিষিক্ত হয়েছিলেন যেইভাবে প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে লেখা আছে, *আর আসলে, যাঁকে তুমি তৈলাভিষিক্ত করেছ, ওরা তোমার সেই পবিত্র পুত্রের বিরুদ্ধে এই নগরীতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে* (ঘ)। এমনটা আমাদের ক্ষেত্রেও তৈলাভিষেকটা মাংসময় ভাবে [তথা দেহের উপর দিয়ে] দৌড়োয় কিন্তু আত্মিক উপকারে আসে: ঠিক সেইভাবে যেভাবে আমরা জলে নিমজ্জিত হওয়ায় বাপ্তিস্ম-কর্মও মাংসময়, কিন্তু আমরা অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়ায় তার কর্মফল আত্মিক।

৮। হস্তার্পণ

এরপর, আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মাকে অনুনয় ও আহ্বান করতে করতে আমাদের উপরে একটা হাত প্রসারিত হয় (ক)। হাওয়া জলে ডেকে আনা (খ) ও উপরে হাত দু'টো প্রসারণ দ্বারা সেই জল ও হাওয়ার পদার্থগত মিলন সঞ্জীবিত করা যখন মানব বুদ্ধিমত্তাকে এমনটা দেওয়া হয় যার ফলে তত স্পষ্ট এক সুর ধ্বনিত হয়, তখন ঈশ্বরকে কি এমনটা দেওয়া হবে না যে, তিনি তাঁর নিজের জল-চলিত যন্ত্র থেকে পবিত্র হাত দু'টো দ্বারা মহত্তম আধ্যাত্মিক সুর ধ্বনিত করবেন? কিন্তু আগেরটা যেমন, এটাও তেমনি সেই প্রাচীন রহস্যময় অনুষ্ঠান-রীতি থেকে আগত যা অনুসারে যাকোব যোসেফ-সঞ্জাত নিজের পৌত্র এফ্রাইম ও মানাশেকে আশীর্বাদ করেছিলেন; সেসময় তিনি তাদের উপরে হাত দু'টো বিপরীত ভাবে, এমনকি একটার উপরে একটাকে এমন অনুপ্রস্থ ও তির্যক ভাবে প্রসারিত করেছিলেন যে, সেই হাত দু'টো খ্রিষ্টকে অঙ্কিত করায় খ্রিষ্টেতে ভাবী আশীর্বাদের পূর্বপ্রতীক হয়ে উঠেছিল (গ)। হ্যাঁ, সেসময়ে পবিত্রতম আত্মা পিতা থেকে শুদ্ধীকৃত ও আশীর্বাদিত দেহগুলোর উপরে খুশি-স্বচ্ছন্দে নেমে আসেন; বাপ্তিস্মের

জলে কেমন যেন নিজের আদিকালীন আসন চিনে নিয়ে তিনি সেই জলের উপরে বিশ্রাম করেন; হ্যাঁ, সেই তিনি, যিনি কপোতের আকারে প্রভুর উপরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন (ঘ) যাতে পবিত্র আত্মার স্বরূপ সেই প্রাণীর সরলতা ও নির্মলতা দ্বারা ঘোষিত হয়; কেননা দৈহিক গঠনের দিক দিয়েও কপোত পিত্তবিহীন। আর সেই অনুসারে তিনি বলেন, *কপোতের মত সরল হও* (ঙ)। এটাও পূর্বকালীন প্রতীকের প্রমাণ ছাড়া হয় না। কেননা যা দ্বারা প্রাচীন শঠতা মুছিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যেমন প্লাবনের সেই জলের পরে, তথা, বলতে গেলে, জগতের বাপ্তিস্মের পরে একটা কপোতই হয়েছিল এমন ঘোষণাকারী দূত যা পৃথিবীর কাছে স্বর্গীয় ক্রোধ প্রশমিত হয়েছে বলে ঘোষণা করেছিল; ও যেমন সেই কপোত জাহাজ থেকে প্রেরিত হয়ে জলপাইগাছের একটা কচি ডাল সঙ্গে করে ফিরে এসেছিল যা এমন চিহ্ন যা জাতিসমূহের মধ্যেও শান্তির পূর্বচিহ্ন স্বরূপ (চ), তেমনি একই আত্মিক ব্যবস্থা ক্রমে পৃথিবী তথা আমাদের মাংস তার প্রাচীন অপরাধ বিলুপ্ত হওয়ার পর জলপ্রক্ষালন থেকে বের হতেই পবিত্র আত্মার সেই কপোত ঈশ্বরের শান্তি বহন করতে করতে তার কাছে উড়ে আসে, সেই যে কপোত প্রেরিত হয়েছিল সেই স্বর্গ থেকে যেখানে জাহাজের প্রতীক স্বরূপ মণ্ডলী বিরাজিত। কিন্তু জগৎ পুনরায় অপরাধ করেছিল, আর এক্ষেত্রে যুক্তিক্রমে বাপ্তিস্ম জলপ্লাবনের সঙ্গে তুলনাযোগ্য নয়। সেজন্য জগতের ভাগ্য হলো আগুন, যেইভাবে সেই মানুষেরও পক্ষে ভাগ্য আগুন যে মানুষ বাপ্তিস্মের পরে [নিজের জীবনে] অপরাধ ফিরিয়ে আনে; যাতে করে এটাও আমাদের সাবধান-বাণীর চিহ্ন হিসাবে মেনে নেওয়া হয়।

৯। লোহিত সাগর ও শৈল থেকে নির্গত জল

সুতরাং, কতগুলো প্রকৃতির আহ্বান, কতগুলো অনুগ্রহের আহ্বান, কতগুলো শৃঙ্খলার মহৎ অনুষ্ঠান, পূর্বচিহ্ন ও প্রার্থনা জল সম্পর্কিত ধর্মানুষ্ঠানকে বিন্যাস করেছে? আর আসলে, প্রথমত, যখন জনগণ মিশর থেকে মুক্ত হয়ে জলের মধ্য দিয়ে পার হওয়ায় মিশর-রাজের প্রতাপ এড়িয়েছিল, তখন জলই সমস্ত সৈন্য-সহ খোদ রাজাকে নিঃশেষিত করেছিল (ক)। এর চেয়ে আরও স্পষ্টতর কোন্ প্রতীক বাপ্তিস্ম রহস্যে প্রকাশিত? এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জাতিগুলোকে জগৎ থেকে জল দ্বারাই মুক্ত করা হয়, এবং তাদের

প্রাচীন স্বৈরশাসক সেই দিয়াবলকে তারা জলে অভিভূত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়। আরও, মোশির লাঠি দ্বারা জলকে তার তিক্ততা-দোষ থেকে তার উপকারী মিষ্ট অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয় (খ)। অবশ্যই সেই কাঠ ছিল সেই খ্রিষ্ট যিনি বিষাক্ত ও তিক্ত প্রকৃতির কোন বস্তুর শিরাকে নিজ থেকে বাপ্তিস্মের অধিক স্বাস্থ্যকর জলে ফিরিয়ে এনেছিলেন। এটি হলো সেই জল যা জনগণের সঙ্গে চলন্ত সেই শৈল থেকে অবিরত জনগণের জন্য প্রবাহিত হত (গ), কেননা যখন খ্রিষ্টই সেই শৈল, তখন আমরা নিঃসন্দেহে সেই বাপ্তিস্ম দেখতে পাই যা খ্রিষ্টে আশীর্বাদিত। বাপ্তিস্মের স্বীকৃতি ক্ষেত্রে ঈশ্বর ও তাঁর খ্রিষ্টের দৃষ্টিতে কেমন মহৎ জলের অনুগ্রহ। জল ছাড়া খ্রিষ্ট কোথাও থাকেন না যেহেতু তিনি নিজেই জলে বাপ্তিস্ম নেন (ঘ); বিয়ে বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি নিজের প্রতাপের প্রথম পরীক্ষাসমূহ জল দিয়ে প্রবর্তন করেন (ঙ); উপদেশ দানকালে তিনি তৃষ্ণার্তদের নিজের চিরকালীন জলের ধারে আহ্বান করেন (চ); ভালবাসা সম্পর্কে উপদেশ দানকালে তিনি নানা দয়াকর্মের মধ্যে গরিবকে দেওয়া সেই 'এক ঘটি জল' উল্লেখ করেন (ছ); তিনি একটা কুয়োর ধারে আবার শক্তি যোগান (জ), জলের উপর দিয়ে হাঁটেন (ঝ), স্বেচ্ছায় সমুদ্র পার হন (ঞ), জল দিয়ে শিষ্যদের প্রতি সেবাকর্ম সম্পাদন করেন (ট)। বাপ্তিস্ম বিষয়ক সাক্ষ্যদান যন্ত্রণাভোগের সময় পর্যন্ত চলে: যখন তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয় তখন জল উপস্থিত হয়, পিলাতের হাত দু'টোও জলকে জানে (ঠ), যখন তাঁকে বিঁধিয়ে দেওয়া হয় তখন তাঁর পাশ থেকে জল নিঃসৃত হয়; সৈন্যের সেই বর্শা বিষয়টা জানে (ড)।

১০। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বাপ্তিস্ম

আমাদের সীমিত ক্ষমতা যতদূর অনুমোদন দিয়েছে, ততদূর আমরা সেই সমস্ত সাধারণ বিষয়ে কথা বলেছি যা বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত ধর্মকে নির্মাণ করে। এখন, এবারও আমার সাধ্যমত, আমি গৌণ কোন না কোন বিষয় ব্যাখ্যা ক'রে 'বাপ্তিস্ম' বিষয়বস্তু সম্পর্কে যা বাকি রয়েছে, সেদিকে এগিয়ে চলব। যোহন দ্বারা প্রচারিত বাপ্তিস্ম সেসময়ও এমন একটা প্রশ্নের সম্মুখীন ছিল যা স্বয়ং প্রভু দ্বারাও ফরিশীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল, তথা, বাপ্তিস্ম ছিল স্বর্গীয় নাকি একেবারে পার্থিব (ক); আর এসম্পর্কে ওরা সঙ্গত উত্তর দিতে সক্ষম ছিল না যেহেতু বিশ্বাসী না হওয়ায় ওরা তা বুঝতেও অক্ষম

ছিল। কিন্তু আমরা ক্ষুদ্রতম বিশ্বাসের অধিকারী হলেও ধারণা করতে পারি যে, সেই বাপ্তিস্ম অবশ্যই স্বর্গীয় ছিল (তথাপি কার্যক্ষমতা ক্রমে নয়, আদেশ ক্রমেই স্বর্গীয়, যেহেতু আমরা পড়ি যে, যোহনকে একর্ম সম্পাদন করার জন্য প্রভু দ্বারা পাঠানো হয়েছিল), কিন্তু স্বরূপে সেই বাপ্তিস্ম ছিল মানবীয়, কেননা স্বর্গীয় কিছুই আরোপ না ক'রে বরং স্বর্গীয় বিষয়গুলোর পূর্বব্যবস্থা করত, অর্থাৎ সেই বাপ্তিস্ম এমন অনুতাপের উদ্দেশে নিযুক্ত ছিল যা মানুষের ক্ষমতায় রয়েছে। আর আসলে, বিশ্বাস করতে অনিচ্ছুক সেই বিধানপণ্ডিতেরা ও ফরিশীরা অনুতাপও করেনি। কিন্তু অনুতাপ মানবীয় ব্যাপার হলে তবে বাপ্তিস্মও অবশ্যই একই ধরনের হবে, নইলে বাপ্তিস্ম স্বর্গীয় হলে তবে পবিত্র আত্মাকে ও পাপক্ষমাকে দু'টোই প্রদান করত। কিন্তু কেউই পাপ ক্ষমা করতে পারে না বা নিজে থেকে [পবিত্র] আত্মাকে মঞ্জুর করতে পারে না, কেবল ঈশ্বর পারেন। প্রভু নিজেও বলেছিলেন, তিনি পিতার কাছে আগে আরোহণ না করলে আত্মা আদৌ নেমে আসবেন না (খ)। আর প্রভু যা তখনও প্রদান করতেন না, অবশ্যই দাস তা যুগিয়ে দিতে পারত না। এবিষয়ে আমরা প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে দেখি যে, যারা যোহনের বাপ্তিস্ম পেয়েছিল তারা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করেনি, এমনকি শোনা কথার মতও তাঁকে জানত না (গ)। অতএব, যা স্বর্গীয় কিছুই প্রদান করত না, তা স্বর্গীয় ছিল না; এমনকি, যোহনে যা স্বর্গীয় ছিল তথা সেই নবীয় আত্মা, গোটা আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে প্রভুতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর তাঁর সেই নবীয় আত্মা একেবারে ব্যর্থ হয়েছিল; বাস্তবিকই যোহন একথা জিজ্ঞাসা করতে লোক পাঠিয়েছিলেন, যাঁর বিষয়ে তিনি প্রচার করেছিলেন ও যাঁকে আগমনকারী বলে চিহ্নিত করেছিলেন, তিনি ছিলেন সেই ব্যক্তি কিনা (ঘ)।

তাই অনুতাপের বাপ্তিস্ম বিষয়ে এমনভাবে ব্যবহার করা হত তা যেন সেই পাপক্ষমা ও পবিত্রীকরণের অগ্রগামী বস্তু, যে পাপক্ষমা ও পবিত্রীকরণ খ্রিষ্টে আসবার কথা। কেননা পাপক্ষমার উদ্দেশে অনুতাপের বাপ্তিস্ম সম্পর্কে যোহন যা প্রচার করতেন (ঙ), তা ভাবী পাপক্ষমাকেই লক্ষ করছিল; যদি একথা সত্য যে অনুতাপ আগে আসে, আর আসলে তা সত্য বটে, তবে পাপক্ষমা পরেই আসে; আর এটি হলো 'পথ প্রস্তুত করা' উক্তির অর্থ (চ), কেননা যে প্রস্তুত করে, সে নিজে যে কাজ সম্পন্ন করে তা নয়, বরং সে এমনটা করে যাতে অন্য একজন তা সম্পন্ন করে। যোহন নিজেই তো স্বীকার করেন,

স্বর্গীয় বিষয়গুলো তাঁর নিজেরই নয় বরং খ্রিষ্টেরই; তিনিই বলেছিলেন, *পৃথিবী থেকে যে আসে, সে তো পার্থিব বিষয়ে কথা বলে; স্বর্গ থেকে যিনি আসেন, তিনি সবার ঊর্ধ্বে* (ছ); আরও, যোহন বলেছিলেন, তিনি কেবল অনুতাপের উদ্দেশেই বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর পরে যিনি আসছিলেন, তিনি আত্মা ও আগুনেই বাপ্তিস্ম দেবেন (জ); অবশ্যই একারণে যে, প্রকৃত ও স্থায়ী বিশ্বাস পরিত্রাণের উদ্দেশে জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে, কিন্তু ভান করা ও দুর্বল বিশ্বাস বিচারের উদ্দেশে আগুনে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে (ঝ)।

১১। 'প্রভু বাপ্তিস্ম সম্পাদন করেননি' অভিযোগ সম্পর্কে

কিন্তু কেউ না কেউ বলে, 'দেখ, প্রভু এসেছিলেন, কিন্তু বাপ্তিস্ম দেননি, কেননা আমরা এ পাঠ করি যে, *যিশু নিজে বাপ্তিস্ম দিতেন না, তাঁর শিষ্যেরাই দিতেন* (ক)।' এ কেমন যেন যোহন এমনটা প্রচার করেছিলেন যে প্রভু নিজেরই হাতে বাপ্তিস্ম দেবেন। অবশ্যই তাঁর কথা এভাবে ধরতে নেই, তাঁর কথা বরং সাধারণ ভাবে ও সরল অর্থেই উচ্চারিত হয়েছিল, সেইভাবে যেভাবে, উদাহরণ যোগে, আমরা বলে থাকি, 'সম্রাট আজ্ঞা প্রকাশ করেছেন' বা ' প্রদেশপাল একজনকে কশাঘাত করেছেন'। জিজ্ঞাসা করি, সম্রাট কি নিজেই প্রকাশ করেন? অথবা প্রদেশপাল কি নিজেই কশাঘাত করেন? যার সেবাকর্মী তার কথামত কাজ সম্পাদন করে, সেই মনিবের বেলায় সবসময়ই বলা হয়, সে-ই করেছে। সুতরাং 'তিনি তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন' বচনটা, তোমরা 'প্রভু দ্বারা' বা 'প্রভুতে' বাপ্তিস্ম পাবে অর্থ অনুসারে গ্রহণযোগ্য।

কিন্তু, তিনি যে বাপ্তিস্ম দিতেন না, এব্যাপার যেন কাউকে দিশেহারা না করে। কেননা তিনি কিসের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম দেবেন? অনুতাপের উদ্দেশেই কি বাপ্তিস্ম দেবেন? তবে সেই অগ্রদূত সম্পর্কে আর কী হবে? নাকি বাপ্তিস্ম দেবেন এমন পাপক্ষমার উদ্দেশে যা তিনি কথা দ্বারা অর্পণ করছিলেন? নাকি সেই নিজেরই উদ্দেশে, যাঁকে বিনম্রতার খাতিরে লুকোচ্ছিলেন? নাকি সেই পবিত্র আত্মার উদ্দেশে, যিনি তখনও পিতা থেকে নেমে আসেননি? নাকি সেই মণ্ডলীর উদ্দেশে, যাকে তাঁর প্রেরিতদূতেরা তখনও স্থাপন করেননি? আর এভাবে ঠিক তাই ঘটত সেই 'যোহনের বাপ্তিস্ম' এর ব্যাপারে যা

সেবাকর্মী হিসাবে তাঁর শিষ্যেরা বাপ্তিস্ম দেবার জন্য ব্যবহার করতেন, সেই যে বাপ্তিস্ম দ্বারা যোহন অগ্রদূত হিসাবে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন। এমনটা যেন মনে না করি যে, এখানে অন্য কোন বাপ্তিস্মের কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে, কারণ অন্য কোন বাপ্তিস্ম ছিল না, কেবল খ্রিষ্টের সেই বাপ্তিস্ম ছিল যা পরবর্তীকালীন, এবং এবিষয়ে একথা বলা বাহুল্য যে, তেমন বাপ্তিস্মও সেসময় তাঁর শিষ্যদের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া সম্ভব ছিল না, কেননা প্রভুর গৌরব তখনও পূর্ণতা লাভ করেনি, যন্ত্রণাভোগ ও পুনরুত্থান দ্বারা অর্জিত সেই প্রক্ষালনের কার্যকারিতাও তখনও স্থাপিত হয়নি; কারণ প্রভুর যন্ত্রণাভোগ দ্বারা ছাড়া আমাদের মৃত্যুও বাতিল হতে পারে না, তাঁর পুনরুত্থান দ্বারা ছাড়া আমাদের জীবনকেও আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

১২। পরিত্রাণলাভের জন্য বাপ্তিস্মের প্রয়োজন

তথাপি, *জল থেকে জন্ম না নিলে কেউ জীবন পাবে না* (ক), বিশেষভাবে প্রভুর এবচন অনুসারে যখন এমনটা বিহিত যে, বাপ্তিস্ম ছাড়া কারও পক্ষে পরিত্রাণ অর্জনীয় নয়, তখন সাথে সাথে কারও না কারও পক্ষ থেকে এ খুঁতখুঁতে এমনকি দুঃসাহসী সন্দেহ জেগে ওঠে, তথা, যখন আমরা দেখি যে, পল বাদে (খ), প্রেরিতদূতেরা প্রভুতে বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত ছিলেন না, তখন সেই নির্দেশ ভিত্তি ক'রে কেমন করে পরিত্রাণ তাঁদের পক্ষে অর্জনীয়? বস্তুত, যেহেতু তাঁদের মধ্যে পলই মাত্র খ্রিষ্টের বাপ্তিস্মের পোশাক পরিধান করেছিলেন, সেজন্য, খ্রিষ্টের জলের অভাবী যারা, হয় সেই নির্দেশ রক্ষার্থে বাকি সেই সকলের পক্ষে পরিত্রাণ অর্জনীয় নয়, না হয়, বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত নয় যারা, যদি তাদেরও জন্য পরিত্রাণ অর্জনীয় বলে স্থিরীকৃত রয়েছে, তবে সেই নির্দেশ বাতিল হয়। আমি সেই ধরনের সন্দেহমূলক কথা নিজে শুনেছি, আর এবিষয়ে প্রভুই আমার সাক্ষী; তাই কেউই যেন আমাকে এতই হীন জ্ঞান না করে যে, আমি লেখনীর গর্বের খাতিরে এমনিই এমন ধারণা কল্পনা করেছি যা অন্যদের দিশেহারা করে তুলবে। আর এখন, আমার সাধ্যমত, আমি তাদের উত্তর দেব যারা একথা সমর্থন করে যে, প্রেরিতদূতেরা বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত ছিলেন না।

কেননা প্রেরিতদূতেরা যদি যোহনের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে থাকতেন ও প্রভুর বাপ্তিস্মের জন্য বাসনা পোষণ করে থাকতেন, তবে যেহেতু প্রভু সেক্ষেত্রে এটা স্থির করেছিলেন যে, বাপ্তিস্ম একটামাত্র (হ্যাঁ, যিনি সর্বাঙ্গেই স্নাত হতে ইচ্ছুক ছিলেন, সেই পিতরকে প্রভু বলেছিলেন, *যে স্নান করেছে, তার ধৌত হওয়ার আর প্রয়োজন নেই* [গ], এবং একথা এমন যা তিনি বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত-নয় কারও কাছে আদৌ বলতেন না), তবে, সেই জল-রহস্য ধ্বংস করার লক্ষ্যে যারা সমর্থন করে প্রেরিতদূতেরা ছিলেন যোহনেরও বাপ্তিস্মবিহীন, তাদের বিরুদ্ধে এখানে আমাদের পাক্কা একটা প্রমাণ রয়েছে। সারা বিশ্ব জুড়ে প্রভুর পথ উন্মুক্ত করার জন্য যাঁদের নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, 'প্রভুর পথ' তথা যোহনের বাপ্তিস্ম যে তাঁদের জন্য প্রস্তুত করা হয়নি, একথা কি বিশ্বাস্য হতে পারে? অনুতাপ করা যাঁর কোন দরকার ছিল না, সেই প্রভু নিজেও যখন বাপ্তিস্ম পেয়েছিলেন, তখন কি, পাপীদের জন্য তা দরকার ছিল না? আর সেই যে অন্যেরা বাপ্তিস্ম পায়নি? বেশ, তারা তো খ্রিষ্টের সঙ্গী ছিল না, তারা ছিল বিশ্বাসের শত্রু, বিধানপণ্ডিত ও ফরিশী। এ থেকে উপযোগী আর একটা ধারণা ভেসে ওঠে, তথা, যেহেতু প্রভুর প্রতিদ্বন্দ্বীরা বাপ্তিস্ম পেতে চাচ্ছিল না, সেজন্য যাঁরা প্রভুর অনুসরণ করছিলেন তাঁরা নিশ্চয় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন ও এব্যাপারে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে একমত ছিলেন না; বিশেষভাবে একারণে যে, তাঁরা অবিরত যাঁকে আঁকড়িয়ে ধরে ছিলেন, সেই প্রভু যোহনের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে তাঁর প্রশংসা করে বলেছিলেন, *নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের চেয়ে মহান কেউ নেই* [ঘ]।

অন্য কেউ স্পষ্টভাবে যথেষ্ট অতিরঞ্জিতই একথা উপস্থাপন করে যে, প্রেরিতদূতেরা তাঁদের সেই ক্ষুদ্র নৌকায় থাকতে যখন তরঙ্গের জল তাঁদের উপরে ছিটিয়ে পড়ছিল ও প্লাবিত করছিল, তখনই তাঁরা বাপ্তিস্ম-কর্তব্যটা পূরণ করেছিলেন; আরও, পিতর নিজেও জলের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যথেষ্ট পরিমাণে ডুবে গেছিলেন [ঙ]। যাই হোক, আমার মতে, সমুদ্রের ক্ষুব্ধতায় গায়ে জল ছিটে লাগা ও নিজে বাধাগ্রস্ত হওয়া একটা জিনিস, এবং ধর্মের নির্দেশের প্রতি বাধ্যতা গুণে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা আলাদা জিনিস। কিন্তু তবুও সেই ক্ষুদ্র নৌকা মণ্ডলী সংক্রান্ত একটা প্রতীক তুলে ধরে বটে, কেননা মণ্ডলীও তরঙ্গের আঘাতে তথা নির্যাতন ও প্রলোভন দ্বারা সমুদ্রে তথা জগতে

আলোড়িত হচ্ছে আর একই সময়ে প্রভু সহিষ্ণুতার খাতিরে কেমন যেন ঘুমিয়ে থাকেন যে পর্যন্ত, অবশেষে, পবিত্রজনদের প্রার্থনা দ্বারা জাগরিত হয়ে জগৎকে সংযত করেন ও তাঁর আপনজনদের কাছে নিস্তব্ধতা ফিরিয়ে আনেন।

আচ্ছা, তাঁরা যে অন্য যেকোন ভাবে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন বা শেষ পর্যন্ত স্নাত-নয় অবস্থায় এগিয়ে চলেছিলেন যার ফলে পিতরকে উদ্দেশ করে প্রভু সেই একমাত্র প্রক্ষালন বিষয়ে যে কথা উচ্চারণ করেছিলেন সেই কথা একপ্রকারে আমাদের সঙ্গেও সম্পর্কিত, তা যাই হোক, তথাপি প্রেরিতদূতের পরিত্রাণ বিষয়ে বিচার করা যথেষ্ট দুঃসাহসী ব্যাপার, কেননা, এমনটা হতে পারে যে, তাঁরা যে আগে প্রথম মনোনয়নের পাত্র ও পরে অবিচ্ছিন্ন অন্তরঙ্গতার পাত্র হয়েছিলেন, তেমন অগ্রাধিকারই সরাসরিভাবে বাপ্তিস্মের অনুগ্রহ সঞ্চার করেছিল, যেহেতু, আমার মতে, তাঁরা তাঁরই অনুসরণ করছিলেন যিনি প্রতিটি বিশ্বাসীকে পরিত্রাণ দানের অঙ্গীকার করছিলেন; তিনি বলতেন, *তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে* ও *তোমার পাপ ক্ষমা করা হল* [চ], অবশ্যই বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও যদি তুমি বিশ্বাস কর। প্রেরিতদূতেরা যদি তেমনটার অভাবী ছিলেন, তবে আমি জানি না কোন্ বিশ্বাসের ফলে প্রভুর একমাত্র বচনে দাঁড়িয়ে উঠে একটা মানুষ শুল্কঘরটা সবসময়ের মত ছেড়ে গেছিলেন [ছ], দ্বিতীয় একজন পিতাকে, নৌকা ও যে ব্যবসার উপর তাঁর জীবিকা নির্ভর করছিল তাও বিসর্জন দিয়েছিলেন [জ], তৃতীয় একজন নিজের পিতার সমাধি-কর্ম অবজ্ঞা ক'রে, *যে কেউ নিজের পিতা বা মাতাকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়* [ঝ] প্রভুর এ সর্বোচ্চ আজ্ঞা শুনবার আগেও তা পূরণ করেছিলেনম। [সুতরাং স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, এই তিনজন বিশ্বাসের অভাবী ছিলেন না]।

১৩। বাপ্তিস্ম সম্পর্কে অন্যান্য অভিযোগ

এই যে, সেই দুর্বৃত্তেরা জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা তুলে ধরছে। সেই অনুসারে ওরা নাকি বলে, 'যার বিশ্বাস যথেষ্ট, তার পক্ষে বাপ্তিস্ম প্রয়োজন হয় না, কেননা আব্রাহাম এমন রহস্য দ্বারা ঈশ্বরের কাছে প্রীত হলেন যা জলের নয়, বিশ্বাসেরই একটা রহস্য [ক]।' কিন্তু সব ক্ষেত্রে শেষ বিষয়গুলোই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ঘটায়, এবং শেষ

কথাই আগের কথার উপর প্রাধান্য পায়। সেই প্রাচীনকালে, প্রভুর যন্ত্রণাভোগ ও পুনরুত্থানের আগে, এমন পরিত্রাণ ছিল যা নগ্ন বিশ্বাস দ্বারা অর্জন করা যেত। কিন্তু আজকালে যখন সেই বিশ্বাস বিকশিত হয়ে এমন বিশ্বাস হয়ে উঠেছে যা তাঁর জন্মে, যন্ত্রণাভোগে ও পুনরুত্থানে বিশ্বাস রাখে, তখন সেই বর্ধিত রহস্যে যোগ করা হয়েছে বাপ্তিস্ম-স্বীকৃতি ও বিশ্বাসকে এক প্রকার কাপড়-পরানো, সেই যে বিশ্বাস আগে নগ্ন ছিল ও এখন তার স্বকীয় বিধান ছাড়া থাকতে পারে না। কেননা বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত বিধান জারি করা হয়েছে ও সেটার সূত্রটা স্থির করা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, *তোমরা যাও, জাতিসকলকে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিস্ম দিয়ে শিক্ষাদান কর* (খ)। এই বিধানের সঙ্গে *আত্মা ও জল থেকে পুনরায় জন্ম না নিলে কেউ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে না* (গ) এবচনের সংযোজন বাপ্তিস্মের প্রয়োজনীয়তার উদ্দেশে বিশ্বাসকে আবদ্ধ করেছে। আর সেই অনুসারে সেসময় থেকে সকল বিশ্বাসীকে বাপ্তিস্ম দেওয়া হত। সেসময়ে পলও যখন বিশ্বাস করেছিলেন তখন বাপ্তিস্ম পেয়েছিলেন; আর এটা হলো সেই আদেশের অর্থ যে আদেশ প্রভু অন্ধতা-আঘাত দানকালে উচ্চারণ করেছিলেন, *ওঠ, দামাস্কে প্রবেশ কর; তোমাকে যে কী করতে হবে তা তোমাকে দেখানো হবে* (ঘ), অর্থাৎ, বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর, কেননা বাপ্তিস্মই ছিল সেই একমাত্র জিনিস যা বিষয়ে পল অভাবী ছিলেন। সেবিষয় ছাড়া তিনি ইতিমধ্যে যথেষ্ট কিছু শিখেছিলেন, এবং সেই নাজারেথীয় যে প্রভু ও ঈশ্বরের পুত্র তা তিনি বিশ্বাস করেছিলেন।

১৪। পল যে বাপ্তিস্ম দেবার জন্য প্রেরিত হননি, সেসম্পর্কে

কিন্তু ওরা স্বয়ং প্রেরিতদূতের বিষয়টা উল্ট ক'রে প্রতিবাদ করে, কেননা তিনি বলেছিলেন, *কারণ খ্রিষ্ট বাপ্তিস্ম দিতে আমাকে প্রেরণ করেননি* (ক), কেমন যেন এই যুক্তির জোরে বাপ্তিস্ম বাতিল করা হয়। কেননা যদি এমনটাই হত, তবে কেন তিনি গাইউস ও ক্রিস্পসকে, ও স্তেফানাসের বাড়ির সকলকে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন? (খ)। যাই হোক, যদিও খ্রিষ্ট তাঁকে বাপ্তিস্ম দিতে প্রেরণ করে না থাকেন, তবু তিনি অন্যান্য প্রেরিতদূতদের বাপ্তিস্ম দেওয়ার আদেশ করেছিলেন। কিন্তু এসমস্ত কথা করিন্থীয়দের কাছে সেকালের অবস্থা-পরিস্থিতি সম্পর্কেই লেখা হয়েছিল, কেননা তাদের মধ্যে বিভেদ

ও দলাদলি [সেই মণ্ডলীকে] আলোড়িত করছিল আর সেইসঙ্গে একজন পলের উপর, ও আর একজন আপল্লোসের উপর দায়িত্ব আরোপ করছিল। একারণে, এই ভয়েতে যে এমনটা মনে হতে পারে যে তিনি সমস্ত অনুগ্রহদান নিজের জন্য দাবি করছেন, সেজন্য শান্তিপ্রিয় সেই প্রেরিতদূত বলেছিলেন, বাপ্তিস্ম দিতে নয়, প্রচার করতেই তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল। কেননা প্রচারকর্ম পূর্ববর্তী, বাপ্তিস্ম প্রদান পরবর্তী, আর সেজন্য প্রচারকর্ম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ছিল। কিন্তু আমি মনে করি, যাঁর পক্ষে প্রচার করা বিধেয় ছিল, তাঁর পক্ষে বাপ্তিস্ম প্রদান করাও বিধেয় ছিল।

১৫। বাপ্তিস্ম একক

বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত তর্কাতর্কিতে অন্য কোন বিষয় আলোচ্য কিনা, তা আমি জানি না। উপরে যা উল্লেখ করিনি, তা আমি অবশ্যই হাতে নেব, পাছে এমনটা না মনে হয়, আমি আসন্ন চিন্তাধারার গতি ছিন্ন করতে চাই। আমাদের কাছে বাপ্তিস্ম একটামাত্র, যেভাবে প্রভুর সুসমাচার ও প্রেরিতদূতের পত্রাবলি অনুসারেও তা একটামাত্র, কেননা তিনি বলেন, *ঈশ্বর এক, বাপ্তিস্ম এক, ও স্বর্গে মণ্ডলী এক* (ক)। কিন্তু তবু এটা বাঞ্ছনীয় যে, ভ্রান্তমতপন্থীদের বিষয়ে কোন্ নিয়ম পালনীয়, সেসম্পর্কে কেউ না কেউ আলোচনা করবে; কেননা ব্যাপারটা আমাদের লক্ষ করে। তথাপি আমাদের জীবনধারণের নিয়মের সঙ্গে ভ্রান্তমতপন্থীদের কোন সম্পর্ক নেই, এমনকি ওরা যে যোগাযোগ থেকে বিচ্যুত তা প্রমাণ করে, ওরা আমাদের কাছে বিধর্মী। আমার কাছে যা আদিষ্ট, ওদের মধ্যে তা চিনে নিতে আমি বাধ্য নই, কারণ আমাদের ও ওদের কাছে একই ঈশ্বর নেই, এক খ্রিষ্টও নেই, অর্থাৎ একই খ্রিষ্টও নেই। এর ফলে ওদের বাপ্তিস্মও আমাদেরটার সঙ্গে এক নয় যেহেতু একই নয়; যখন ওরা ধর্মসম্মত ভাবে বাপ্তিস্মের অধিকারী নয়, তখন এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ওরা কোন বাপ্তিস্মের অধিকারী নয়, যেইভাবে মানুষ যা বিষয়ে অভাবী, তা গণিত হতে পারে না (খ); এভাবে ওরা তেমনটাও গ্রহণ করতে পারে না, যেহেতু সেটা ওদের নেই (গ)। কিন্তু এবিষয়ে আমাদের দ্বারা গ্রীক ভাষায় পুরাপুরি আলোচনা করা হয়ে গেছে। সুতরাং জলকুণ্ডে আমরা একবার মাত্র প্রবেশ করি, অপরাধ একবার মাত্র ধৌত হয়, কারণ বারে বারে অপরাধ করা উচিত নয়। কিন্তু ইহুদী সেই ইস্রায়েল

প্রতিদিন বারবার নিজেকে ধৌত করে, যেহেতু সে প্রতিদিন দূষিত হয়, এবং যাতে আমাদের মধ্যেও দূষণ প্রচলিত না হয়, সেজন্যই একক প্রক্ষালন সংক্রান্ত সেই নিয়ম স্থির করা হয়েছিল। সুখী সেই জল, যা একবার মাত্র ধৌত করে, যা পাপীর কাছে খেলার ব্যাপার নয়, যা বারে বারে সম্পাদিত মলিনতা দ্বারা কলুষিত না হয়ে তাকে পুনরায় দূষিত করে না যাকে সে প্রক্ষালিত করেছে।

১৬। রক্তে সেই দ্বিতীয় বাপ্তিস্ম

প্রকৃতপক্ষে আমাদের দ্বিতীয় একটা প্রক্ষালন রয়েছে, এমন একটা যা আগেরটার মত এক ও একই; অর্থাৎ রক্তে বাপ্তিস্ম, যা বিষয়ে প্রভু বলেছিলেন, *এমন বাপ্তিস্ম আছে, যে-বাপ্তিস্মে আমাকে বাপ্তিস্ম নিতে হবে* (ক), অথচ ইতিমধ্যে তাঁর বাপ্তিস্ম হয়েছিল। কারণ যোহন যেমনটা লিখেছিলেন, সেই অনুসারে *তিনি জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছিলেন* (খ) যাতে তিনি জলে বাপ্তিস্ম নিতে পারেন ও রক্তে গৌরবান্বিত হতে পারেন, এর ফলে যাতে তিনি একইভাবে আমাদের 'জলে আহূত, রক্তে মনোনীত' করে তুলতে পারেন। এ বাপ্তিস্ম দু'টো তিনি নিজের বিদ্ধ পাশের ক্ষত থেকে নিঃসৃত করেছিলেন (গ), যারা তাঁর রক্তে বিশ্বাস রাখবে তারা যেন জলে ধৌত হয়, যারা জলে ধৌত হয়েছিল তারা যেন রক্তও পান করতে পারে। এটাই সেই বাপ্তিস্ম যা এখনও নেওয়া-নয় বাপ্তিস্মকে কার্যকর করে ও হারানো বাপ্তিস্মটাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

১৭। বাপ্তিস্ম সম্পাদনের প্রভাব

আমাদের এ ক্ষুদ্র আলোচনা সমাপ্ত করতে গিয়ে বাপ্তিস্ম প্রদান ও গ্রহণ ব্যাপারে পালনীয় পদ্ধতি সম্পর্কে দু'টো কথা বলা বাকি রয়েছে। প্রদানের অধিকার মহাযাজকের অর্থাৎ বিশপের, পরপর, পুরোহিতের ও পরিসেবকের, তথাপি বিশপের অধিকার ছাড়া নয়, এবং তেমনটা মণ্ডলীর সম্মানার্থে, কেননা যখন সেই সম্মান সংরক্ষিত তখন শান্তি সংরক্ষিত। তাছাড়া, গণশ্রেণিভুক্ত যেকোন একজনও সেই অধিকারের অধিকারী, কেননা যা সমানভাবে গৃহীত তা সমানভাবে প্রদানও করা যেতে পারে। বিশপ বা পুরোহিত বা পরিসেবক উপস্থিত না থাকলে তবে অন্য শিষ্যদের ডাকা যেতে পারে। প্রভুর বাণী যেন

কারও দ্বারা গোপন করে রাখা না হয়; একই প্রকারে, যে বাপ্তিস্ম ঈশ্বরেরই বলে গণ্য, সেই বাপ্তিস্মও সবার দ্বারা প্রদান করা যেতে পারে। কিন্তু এর তুলনায় গণশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে শ্রদ্ধা ও বিনয় সংক্রান্ত এই নিয়ম কেমন মহত্তর দায়িত্বের ব্যাপার, একথা ভেবে যে, এ অধিকারগুলো তাঁদেরই যাঁরা তাদের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিত্ব; তাই এমনটা না হোক যে তারা বিশপের স্বকীয় ভূমিকা নিজেদের উপর আরোপ করে। বিশপীয় পদ বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলো দলাদলির মাতা। পবিত্রতম সেই প্রেরিতদূত বলেছিলেন, *সবই বিধেয়, কিন্তু সবই মঙ্গলজনক নয়* (ক)। যদি কোন সময়ে স্থান বা কাল বা ব্যক্তি সংক্রান্ত অবস্থা-পরিস্থিতি তেমনটা করতে তোমাকে বাধ্য না করে, তবে প্রয়োজনে সেই নিয়ম ব্যবহার্য বটে, কেননা যখন বিপদাপন্নের অবস্থা জরুরী তখন সাহায্যকারীর ধ্রুব সাহস ব্যতিক্রম হিসাবে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য, একারণে যে, যা স্বাধীনভাবে প্রদান করতে পারত সে যদি তা প্রদান করায় বিরত থাকে, তবে সে হারানো একটা মানুষের বিষয়ে দায়ী হবে।

কিন্তু যে খামখেয়ালী স্ত্রীলোক শিক্ষাদানের দায়িত্ব জোরপূর্বক দখল করেছে, সে বাপ্তিস্ম প্রদানেরও অধিকার যে নিজে থেকে পাবে তা নয়, যদি না আগেকার সেই পশুর মত নতুন এমন একটা পশু আবির্ভূত হয় যার ফলে, আগেরটা যেমন বাপ্তিস্ম বাতিল করেছিল, অন্য কয়েকটা নিজ অধিকারে তা প্রদান করবে। কিন্তু সেই যে সমস্ত লেখা ভুলভাবে পলের লেখা বলে গণ্য, সেগুলো যখন থেক্লার আদর্শকে স্ত্রীলোকদের পক্ষে শিক্ষা ও বাপ্তিস্ম প্রদানের অনুমোদন বলে সমর্থন করে (খ), তখন ওরা জেনে নিক যে, এশিয়ায় যে পুরোহিত পলের খ্যাতি বৃদ্ধির লক্ষ্যেই যেন নিজে থেকে মেলা কিছু যুগিয়ে সেই লেখা বানিয়েছিল, সে দণ্ডিত হবার পর ও সে যে পলের প্রতি ভালবাসার খাতিরেই তেমনটা করেছিল তা স্বীকার করার পর পদত্যাগ করেছিল। এ কি অবিশ্বাস্য মনে হবে না যে, যিনি একটি স্ত্রীলোককে শিক্ষালাভ করার অনুমতিও দেননি, তিনি স্ত্রীলোকদের শিক্ষা ও বাপ্তিস্ম প্রদানের অধিকার দেবেন? তিনি বলেছিলেন, *তারা নীরব থাকুক*, ও *বাড়িতে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করুক* (গ)।

১৮। বাপ্তিস্ম প্রদান সংক্রান্ত বিষয়

কিন্তু বাপ্তিস্ম প্রদান যাঁদের দায়িত্ব, তাঁরা জানেন যে বাপ্তিস্ম এমন কিছু যা চিন্তা-ভাবনা না করে প্রদান করতে নেই। *যে কেউ তোমার কাছে ভিক্ষা করে, তাকে দাও* (ক) বচনটা তার নিজের বিষয়বস্তুকে লক্ষ করে বটে যা বিশেষভাবে অর্থদান ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এর বিপরীতে এই আজ্ঞাই বরং মনোযোগ সহকারে লক্ষ করার বিষয়, তথা, *যা পবিত্র তা কুকুরদের দিয়ো না, তোমার মণিমুক্তাও শূকরদের সামনে ফেলো না* (খ) ও *কারও উপরে হাত রাখতে বেশি ব্যস্ত হয়ো না, পরের পাপের অংশী হয়ো না* (গ)। যখন সেই ফিলিপ তত সহজেই সেই কঞ্চুকীকে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন, তখন এসো, এ ভাবি যে, প্রভু নিজের প্রসন্নতায় স্পষ্ট ও প্রকাশ্য ভাবে এতে হাত দিয়েছিলেন (ঘ): হ্যাঁ, আত্মা ফিলিপকে সেপথে এগিয়ে যেতে আদেশ করেছিলেন, এটাও দেখা গিয়েছিল যে, কঞ্চুকী অলস মানুষ ছিলেন না, এমন মানুষও ছিলেন না যিনি সাথে সাথেই বাপ্তিস্ম পাবার বাসনা করছিলেন, বরং প্রার্থনার খাতিরে মন্দিরে যাবার পর তিনি পবিত্র শাস্ত্রে নিবিষ্ট ছিলেন; তাঁকে তেমন অবস্থায়ই পাওয়া গেছিল যখন প্রভু তাঁর কাছে এমন এক প্রেরিতদূতকে (ঙ) প্রেরণ করেছিলেন যাঁকে আত্মা কঞ্চুকীর রথে যোগ দিতে আদেশ করেছিলেন। শাস্ত্র ঠিক সময়মতই তাঁর বিশ্বাসের সহায়তায় আসে, যাচনায় সাড়া দেওয়া হয় (চ), প্রভুর দিকে অঙুলিনির্দেশ করা হয়, বিশ্বাস ইতস্তত করে না, জলের জন্য অপেক্ষা করা দরকার হয় না এবং কর্মটা সম্পন্ন হওয়া মাত্র প্রেরিতদূতকে কেড়ে নেওয়া হয়। পলকেও কিন্তু সাথে সাথেই বাপ্তিস্ম প্রদান করা হয়েছিল (ছ), কেননা তাঁর অতিথিসেবক সেই শিমোন সাথে সাথেই তাঁকে *নিযুক্ত একটা মনোনীত পাত্র* (জ) বলে চিনে নিয়েছিলেন। ঈশ্বরের প্রসন্নতা আগে পূর্বলক্ষণ উপস্থাপন করে, [বাপ্তিস্ম গ্রহণ সংক্রান্ত] প্রতিটি যাচনা প্রবঞ্চনা করতে পারে ও প্রবঞ্চিত হতে পারে।

তাই প্রতিটি মানুষের অবস্থা-পরিস্থিতি ও মন-মানসিকতা, এমনকি বয়স অনুসারে বাপ্তিস্ম স্থগিত করা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু বিশেষভাবে শিশুদের ক্ষেত্রে। কেননা যখন বাপ্তিস্মের তত প্রয়োজন হয় না, তখন বাপ্তিস্ম প্রদান কেনই বা তত প্রয়োজন যে, ধর্মপিতা-মাতাদেরও বিপদাপন্ন করা হবে? কেননা তাঁরাও মরণশীলতার কারণে নিজেদের অঙ্গীকার পূরণে ব্যর্থ হতে পারেন ও [যাদের পক্ষে তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন] তাদের

কুস্বভাবের প্রবৃত্তিতে আশাভ্রষ্ট হতে পারেন। বস্তুত প্রভু বলেন, *তাদের আমার কাছে আসতে বাধা দিয়ো না* (ঝ); সুতরাং ওরা যখন বড় হচ্ছে তখনই তাদের আসতে দাও, যখন ওরা শিখছে, যখন ওরা সেই আসাটা সম্পর্কে শিখছে, তখনই ওদের আসতে দাও। ওরা যখন খ্রিষ্টকে জানতে সক্ষম হবে, তখনই খ্রিষ্টিয়ান হোক। নিরপরাধী বয়স কেন পাপক্ষমার জন্য অতিব্যস্ত? যখন জাগতিক ক্ষেত্রে আরও বেশি সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়, তখন পার্থিব বিষয়ে যার উপর নির্ভর করা যায় না, ঐশবিষয়েই কি তার উপরে নির্ভর করা যাবে? ওরা পরিত্রাণ যাচনা করতে শিখুক, যাতে এমনটা দেখা যায় যে, যে যাচনা করছে, তুমি তাকেই দান করছ।

এর চেয়ে হীনতম নয় এমন যুক্তির ভিত্তিতে অবিবাহিত যারা তাদেরও বাপ্তিস্ম স্থগিত করা দরকার, কেননা তাদের মধ্যে সমান একটা প্রলোভন ওত পেতে রয়েছে: কুমার-কুমারীদের বেলায় তাদের পরিপক্কতা সংক্রান্ত প্রলোভন, ও বিধবাদের বেলায় তাদের স্বাধীনতা সংক্রান্ত প্রলোভন, যতদিন না তারা হয় বিবাহ করে, না হয় কৌমার্য পালনের জন্য দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। যে কেউ বাপ্তিস্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করে, সে সেটার বিলম্বের চেয়ে সেটার গ্রহণটা বেশি ভয় করবে; অখণ্ড বিশ্বাসই পরিত্রাণলাভ ক্ষেত্রে নিশ্চিত।

১৯। বাপ্তিস্মের জন্য উপযুক্ত কাল

বাপ্তিস্মের জন্য পাস্কা [দিবসত্রয়ের শুক্রবার] অধিক উপযুক্ত পরিবেশ অর্পণ করে, কেননা প্রভুর সেই যন্ত্রণাভোগ পূর্ণতা লাভ করে যেখানে আমরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি। এমনটা প্রতীকাকারে ব্যাখ্যা করা অযুক্তিকর বিবেচিত হবে না যে, প্রভু নিজের শেষ পাস্কা উদ্‌যাপন করতে গিয়ে, যাঁদের ব্যবস্থাপনার জন্য পাঠানো হয়েছিল তাঁদের তিনি বলেছিলেন, *তোমরা এমন একজন লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবে যে জল বহন করছে* (ক)। তিনি জল-চিহ্নের মাধ্যমেই পাস্কা পালনের স্থান নির্দিষ্ট করছেন। তারপর, বাপ্তিস্ম প্রদানের আনন্দময় পরিবেশ হলো পঞ্চাশত্তমী, কারণ সেটায়ও শিষ্যদের মধ্যে প্রভুর পুনরুত্থান বারে বারে প্রমাণিত হয়েছিল ও প্রভুর আগমন পরোক্ষভাবে পরিলক্ষিত ছিল যেহেতু, যখন তিনি স্বর্গে পুনরায় গৃহীত হয়েছিলেন, সেসময় দূতেরা শিষ্যদের বলেছিলেন, তিনি যেভাবে স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন, তিনি সেভাবে ফিরে আসবেন (খ),

অবশ্যই, সেই পঞ্চাশত্তমী দিনে। কিন্তু যেরেমিয়াও যখন বলেন, *আমি সেই পর্বদিনে পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে তাদের জড় করব* (গ), তখন তিনি সেই পাস্কা ও পঞ্চাশত্তমী দিনের কথা বলছেন, যে দিনটা যথার্থই পর্বদিন। যাই হোক, প্রতিটি দিন প্রভুরই, যেকোন ক্ষণ ও যেকোন সময় বাপ্তিস্মের জন্য উপযুক্ত; যদি কাল ক্ষেত্রে বিভিন্নতা থাকতে পারে, তবু অনুগ্রহ ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই।

২০। বাপ্তিস্ম গ্রহণে প্রস্তুতি ও বাপ্তিস্ম প্রাপ্তির পর আচরণ

যারা বাপ্তিস্ম নিতে উদ্যত হচ্ছে, তাদের পক্ষে ঘনঘন প্রার্থনা করা, ও উপবাস ও জানুপাত-সহ রাত্রিজাগরণে প্রার্থনা অর্পণ করা উচিত। তারা অতীতের সমস্ত পাপ স্বীকার করবে যাতে যোহনের বাপ্তিস্মের অর্থ ব্যক্ত করতে পারে; শাস্ত্রে বলে, *তারা নিজেদের পাপ স্বীকার করে বাপ্তিস্ম নিত* (ক)। আমাদের বেলায় এটা ধন্যবাদ জ্ঞাপনের বিষয়ই যে, আমরা এখন আমাদের শঠতা বা দুষ্কর্ম প্রকাশ্যে স্বীকার করছি; কেননা আমরা একই সময়েই, মাংস ও আত্মাকে দমন দ্বারা আমাদের অতীতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি ও সেইসঙ্গে আগন্তুক প্রলোভনসমূহের জন্য আগে থেকে রক্ষাফলক উত্তোলন করি; তিনি তো বলছেন, *প্রার্থনা কর, যেন প্রলোভনে না পড়* (খ)। এবং আমি মনে করি, তাঁরা এজন্যই প্রলোভনের অধীন হয়েছিলেন যে, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তাতে যখন প্রভুকে ধরা হয়েছিল তখন তাঁরা তাঁকে একা ফেলে রেখে চলে গেছিলেন; আর যিনি তাঁর সঙ্গে থেকে গেছিলেন ও খড়্গ ব্যবহার করেছিলেন, তিনি তিন তিনবারও তাঁকে অস্বীকার করেছিলেন; কেননা আগে এবচনটাও উচ্চারিত হয়েছিল যে, 'প্রলোভনে পরীক্ষিত হয়নি এমন কেউই স্বর্গীয় রাজ্য পাবে না'। প্রক্ষালনের পর পরে, চল্লিশ দিন উপবাস করার পর প্রভু নিজেও চারদিক থেকে প্রলোভনে আক্রান্ত হয়েছিলেন (গ)।

কেউ না কেউ বলবে, 'তবে প্রক্ষালনের পর আমাদেরও উপবাস করা উচিত।' আচ্ছা, প্রয়োজনীয় আনন্দের বা পরিত্রাণ সংক্রান্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কারণ বাদে, কে নিষেধ করছে? কিন্তু আমি যতটুকু বুঝি সেই অনুসারে আমি মনে করি, প্রভু প্রতীকাকারেই ইস্রায়েলের উপরে সেই অভিযোগ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন [যা ইস্রায়েল তাঁর বিষয়ে উত্থাপন করেছিল]। কেননা সাগর পার হবার পর ও চল্লিশ বছর ধরে প্রান্তরে

চালিত হওয়ার পর সেই জনগণ, সেখানে ঐশখাদ্য দ্বারা পুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বরের চেয়ে নিজেদের পেট ও গলার জন্যই বেশি চিন্তিত ছিল (ঘ)। সেজন্য বাপ্তিস্মের পরে মরু যায়গায় গন্ডিবদ্ধ হয়ে প্রভু চল্লিশ দিন উপবাস রাখায় এ দেখিয়েছিলেন যে, ঈশ্বরের মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের বাণীতেই বাঁচে (ঙ); এও দেখিয়েছিলেন যে, পেট-ভরা বা অতিরিক্ত পেটুকতা সংক্রান্ত প্রলোভনগুলো অনাহার দ্বারা নিষ্পেষিত করা যায়।

তাই, হে ধন্য সকল, ঈশ্বরের অনুগ্রহ যাদের অপেক্ষায় রয়েছে, যখন তোমরা তোমাদের নবজন্মের পবিত্রতম জলকুণ্ড থেকে আরোহণ করবে ও তোমাদের মাতার সাক্ষাতে তোমাদের ভাইদের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রথমবারের মত হাত দু'টো বাড়াবে, তখন পিতার কাছে এ যাচনা রাখ, প্রভুর কাছে এ যাচনা রাখ যাতে সেই অপর্যাপ্ত অনুগ্রহের, সেই অনুগ্রহদানসমূহ সংক্রান্ত বিতরণের (চ) ভাগী হতে পার। তিনি তো বলেন, *যাচনা কর, তোমরা পাবেই* (ছ); হ্যাঁ, তোমরা যাচনা করেছ ও পেয়েছ, তোমরা দরজায় ঘা দিয়েছ ও তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। আমি এটুকু মাত্র প্রার্থনা করি: তোমরা যখন যাচনা কর, তখন যেন পাপী তের্তুল্লিয়ানুসের কথাও মনে রাখ।

---

১ (ক) 'গায়ানা' (অথবা 'কাইন-জাতীয়') ভ্রান্তমত তের্তুল্লিয়ানুসের সময়ে এমন শিক্ষা প্রচার করছিল যা অনুসারে মণ্ডলীতে প্রচলিত বাপ্তিস্ম-তত্ত্ব ও ধর্মরীতি নিষ্প্রয়োজন ও অকার্যকর বলে সমর্থন করছিল।

(খ) 'রাজসাপ' নামক সাপটা সেই নামে অভিহিত কেননা একটা সাদা দাগ রাজমুকুটই যেন তার মাথা অলঙ্কৃত করে। অন্যান্যদের মতে সাপটা 'রাজসাপ' বলে অভিহিত কেননা সাপটা ছোট্ট হলেও তার বিষ মারাত্মক।

(গ) 'ΙΧΘΥΣ' (ইখ্থিস বা ইখ্থুস) গ্রীক ভাষার একটা শব্দ যার অর্থ মৎস্য কিন্তু যা দ্বারা খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা যিশুকে বুঝত, কেননা শব্দটার প্রতিটি অক্ষর যিশুকে লক্ষ করে:
Ι = Ἰησοῦς (ইয়েসুস)- যিশু
Χ = Χριστός (খ্রিস্তোস)- খ্রিষ্ট
Θ = Θεοῦ (থেউ) - ঈশ্বরের
Υ = Υἱός (উইয়োস বা ইয়োস)- পুত্র
Σ = Σωτήρ (সতের)- ত্রাণকর্তা

এজন্য আদিমণ্ডলীকালে বহু খ্রিষ্টিয়ান ঘর, কবর ও অন্যান্য বস্তু একটা মৎস্য-চিত্র দ্বারা খ্রিষ্ট-সাক্ষ্যই যেন চিহ্নিত করত।

(ঘ) ১ তি ২:১২ দ্রঃ।

(ঙ) 'দানবী', অর্থাৎ সেই গায়ানা ভ্রান্তমত যা ভুলভ্রান্তি শিখিয়ে সাপের মত খ্রিষ্টিয়ানদের বিশ্বাস ধ্বংস করত। কারও মতে দানবী হলো সেই ভ্রান্তমতের নেত্রী কুইন্তিল্লা যে ভ্রান্তিজনক ধর্মতত্ত্ব শেখাত।

২ (ক) ১ করি ১:২৭; মথি ১৯:২৬ দ্রঃ।

৩ (ক) তের্তুল্লিয়ানুস অবশ্যই ব্যঙ্গাত্মক কথা বলছেন।

(খ) আদি ১:১-২ দ্রঃ।

(গ) আদি ১:৬ দ্রঃ।

(ঘ) আদি ১:৯ দ্রঃ।

(ঙ) আদি ১:২০ দ্রঃ।

(চ) আদি ২:৭ দ্রঃ।

৪ (ক) মথি ৩:৬ দ্রঃ।

(খ) প্রেরিত ৮:২৬-৪০ দ্রঃ।

(গ) 'ঈশ্বরকে মিনতির পর' : বাপ্তিস্ম সম্পদনে যে জল ব্যবহৃত, সেই জল আশীর্বাদের সময়েই ঈশ্বরকে মিনতি করা হয়।

৫ (ক) 'ইসিস' ছিল প্রাচীন মিশরের উর্বরতা-দেবি যাকে বিশেষভাবে নারীদের দ্বারা পূজা করা হত।
'মিথ্রা'-উপাসনা প্রথম শতাব্দীর একটা আন্দোলন যা মিথ্রা নামক পারস্য সূর্য-দেবকে কেন্দ্র করত; আন্দোলনটা রোমে বিশেষভাবে ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীতে সৈন্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সেকালের প্রায়ই সকল খ্রিষ্টিয়ান লেখকগণ (যেমন সাধু ইউস্তিনুস, ১ম পক্ষসমর্থন ৬৬ অধ্যায়) মিথ্রা উপাসনাকে খ্রিষ্টধর্মের প্রত্যক্ষ শত্রু বলে গণ্য করতেন।

(খ) আপল্লিনারিস ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা রোমেই বিশেষভাবে পালিত ছিল।

(গ) 'পেলুসিস' ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা সম্পর্কে কোন তথ্য নেই; হয় তো শব্দটা সেই 'এলেইসিস' ক্রীড়া-প্রতিযোগিতাকে লক্ষ করে যা সেকালে খুবই প্রচলিত ছিল।

(ঘ) 'এসিএতোস' : অজানা শব্দ।

(ঙ) যোহন ৫:৪ দ্রঃ।

(চ) আদি ২:৭ দ্রঃ।

৬ (ক) দেখা যাচ্ছে, তের্তুল্লিয়ানুসের সময়ে কার্থাগো-মণ্ডলীতে (ও হয় তো রোম-মণ্ডলীতেও), প্রক্ষালিত ব্যক্তি পবিত্র আত্মাকে সরাসরি পেত না, কেবল ঐশঅনুগ্রহই পেত, পরেই অর্থাৎ বিশপের হস্তার্পণে দৃঢ়ীকরণকালেই সে ঐশঅনুগ্রহের পূর্ণতা পাবার ক্ষণেই পবিত্র আত্মাকে পেত। আজকালেও, বালকদের বাপ্তিস্ম বাদে, প্রার্থী প্রক্ষালিত হওয়ার পর পবিত্র আত্মার পূর্ণতা লাভ করার জন্য তাকে দৃঢ়ীকৃত করা হয়।

(খ) ইশা ১১:৩; মথি ৩:৩; মার্ক ১:৩; লুক ১:৭৬; ৩:৪ দ্রঃ।

(গ) মথি ১৮:১৬ দ্রঃ।

(ঘ) মথি ১৮:২০ দ্রঃ।

৭ (ক) 'আশীর্বাদিত তৈললেপনে লেপন করা হয়': সেসময় বাপ্তিস্ম দানকালে দু'টো তৈললেপন সম্পাদিত হত, বুকে ও কাঁধে প্রথম তৈললেপন, ও প্রক্ষালনের পরে খ্রিষ্মা মলম দিয়ে মাথায় দ্বিতীয় তৈললেপন তথা তৈলাভিষেক। কাঁধে তৈললেপন বাদে এই রীতি আজকালও প্রচলিত।

(খ) 'প্রাচীন রীতি' তথা পুরাতন নিয়মে মোশির বিধান।

(গ) ১ শামু ১৩:১৬; যাত্রা ৩০:৩০; লেবীয় ৮:১ ইত্যাদি।

(ঘ) প্রেরিত ৪:২৭ দ্রঃ।

৮ (ক) সেকালে যেমন, তেমনি আজকালেও বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দৃঢ়ীকৃত করা হয়।

(খ) 'হাওয়া জলে ডেকে আনা, ইত্যাদি'; এখানে তের্তুল্লিয়ানুস জল-চালিত এমন বাদ্যযন্ত্রের কথা বলছেন যা সেসময়ে রোমে খুবই প্রচলিত ছিল। বাদ্যযন্ত্রটা শ্রোতাদের কাছে পরিচিত ছিল বিধায় তিনি অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন; কিন্তু আজকালের পাঠক / পাঠিকা এই আমরা সেই বিষয়ে অন্ধকারে আছি। তাছাড়া তিনি একপ্রকার কাব্যিক বর্ণনা দেন। সেজন্য এবিষয়ে দু'টো কথা ব্যয় করা বাঞ্ছনীয়। বুঝা যাচ্ছে, বাদ্যযন্ত্রটা হাওয়া ও জলের বিশিষ্ট সমন্বয়ের ফলে ও বাদকের হাতের চাপে নানা সুর জনিত করত। তাই, তিনি 'হাওয়া জলে ডেকে আনা' ইত্যাদি বাক্যটার সংক্ষিপ্ত অর্থ এটি হতে পারে: যখন মানুষ হাওয়া ও জলের সমন্বয়ে ও হাতের চাপে সেই সমন্বয়ের ফলে সুন্দর সুন্দর সুর ধ্বনিত করতে পারে, তখন অবশ্যই ঈশ্বর পবিত্রই হাত দু'টো দ্বারা জল-চালিত নিজের বাদ্যযন্ত্র থেকে আধ্যাত্মিক সুর ধ্বনিত করতে পারবেন।।

(গ) কেন সেই হাত দু'টো খ্রিষ্টকে অঙ্কিত করে? কারণ তির্যক ভাবে প্রসারিত হাত দু'টো দেখতে সেই X এর মত যা Χριστός (খ্রিস্তোস - খ্রিষ্ট) নামের প্রথম অক্ষর ও যা গ্রীস দেশে প্রচলিত ক্রুশের সদৃশ।

(ঘ) মথি ৩:১৬ দ্রঃ।

(ঙ) মথি ১০:১৬।

(চ) আদি ৮:৮ ও পরবর্তী পদগুলো দ্রঃ। কপোতের চিহ্ন আদিমণ্ডলীর খ্রিষ্টিয়ানদের মাঝেও প্রচলিত ছিল।

৯ (ক) যাত্রা ১৪:২৭-৩০ দ্রঃ।

(খ) যাত্রা ১৫ দ্রঃ।

(গ) যাত্রা ১৭:৬; ১ করি ১০:৪ দ্রঃ।

(ঘ) মথি ৩:১৩-১৭ দ্রঃ।

(ঙ) যোহন ২:১-১১ দ্রঃ।

(চ) যোহন ৭:৩৭-৩৮ দ্রঃ।

(ছ) মথি ১০:৪২ দ্রঃ।

(জ) যোহন ৪:৬ দ্রঃ।

(ঝ) মথি ১৪:২৫ দ্রঃ।

(ঞ) মার্ক ৪:৩৬ দ্রঃ।

(ট) যোহন ১৩:১-১২ দ্রঃ।

(ঠ) মথি ২৭:২৪ দ্রঃ।

(ড) যোহন ১৯:৩৪ দ্রঃ।

১০ (ক) মথি ২১:২৫ দ্রঃ।

(খ) যোহন ১৬:৬-৭ দ্রঃ।

(গ) প্রেরিত ১৯:২ দ্রঃ।

(ঘ) মথি ১১:৩ দ্রঃ। বাপ্তিস্মদাতা যোহন যে ঈশ্বরের আত্মাকে কখনও হারিয়েছিলেন ও খ্রিষ্ট সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন, তা সম্ভবত কেবল তের্তুল্লিয়ানুসেরই ধারণা। বস্তুত পরবর্তীকালীন পিতৃগণ সেবিষয় ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন।

(ঙ) মার্ক ১:৪ দ্রঃ।

(চ) লুক ১:৭৬ দ্রঃ।

(ছ) যোহন ৩:৩১ দ্রঃ।

(জ) মথি ৩:১১ দ্রঃ।

(ঝ) 'দুর্বল বিশ্বাস বিচারের উদ্দেশে আগুনে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে'। মনে হচ্ছে তের্তুল্লিয়ানুস খ্রিষ্টের দেওয়া বাপ্তিস্ম সম্পর্কে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের উচ্চারিত বাণী (তথা খ্রিষ্ট আত্মা ও আগুনে বাপ্তিস্ম দেবেন) ব্যাখ্যা ক'রে দ্বিমুখী বাপ্তিস্ম বোঝাচ্ছেন, তথা প্রকৃত বিশ্বাসীর জন্য জলে বাপ্তিস্ম, ও নকল বিশ্বাসীর জন্য জাহান্নামের আগুনে বাপ্তিস্ম। যাই হোক, পরবর্তীকালীন পিতৃগণের ব্যাখ্যা অনুসারে, পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম শুধু পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনেই ঘটেছিল যখন প্রেরিতদূতগণ 'আগুনের মতই যেন কতগুলো জিহ্বা' (প্রেরিত ২:৩) দেখেছিলেন ও পবিত্র আত্মাকে পেয়েছিলেন।

১১ (ক) যোহন ৪:২।

১২ (ক) যোহন ৩:৫; ৬:৪৭ ইত্যাদি দ্রঃ।

(খ) প্রেরিত ৯:১৮ দ্রঃ।

(গ) যোহন ১৩:১০।

(ঘ) মথি ১১:১১।

(ঙ) মথি ১৪:৩০ দ্রঃ।

(চ) লুক ১৭:১৯; ১৮:৪২ এবং মথি ৯:২; লুক ৫:২০; ৭:৪৮।

(ছ) মথি ৯:৯; মার্ক ২:১৪; লুক ৫:২১ দ্রঃ।

(জ) মথি ৪:২২; মার্ক ১:২০ দ্রঃ।

(ঝ) মথি ১০:৩৭।

১৩ (ক) আদি ১৫ দ্রঃ।

(খ) মথি ২৮:১৯ দ্রঃ।

(গ) যোহন ৩:৫ দ্রঃ।

(ঘ) প্রেরিত ৯:১৮ দ্রঃ।

১৪ (ক) ১ করি ১:১৭ দ্রঃ।

(খ) ১ করি ১৬:১৫ দ্রঃ।

১৫ (ক) এফে ৪:৫ দ্রঃ। সম্ভবত 'স্বর্গে মণ্ডলী এক' উক্তি দ্বারা তের্তুল্লিয়ানুস 'তিনি ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন' উক্তিটা (এফে ৪:৮) লক্ষ করছেন।

(খ) উপ ১:১৫ দ্রঃ।

(গ) কাথলিক মণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন এমন ব্যক্তি বাপ্তিস্ম দিলে, সেই বাপ্তিস্ম কি বিধেয় ও কার্যকর? তের্তুল্লিয়ানুসের মতে সেই বাপ্তিস্ম অবৈধ ও অকার্যকর 'কারণ আমাদের ও ওদের কাছে একই ঈশ্বর নেই, এক খ্রিষ্টও নেই, অর্থাৎ একই খ্রিষ্টও নেই। এর ফলে ওদের বাপ্তিস্মও আমাদেরটার সঙ্গে এক নয় যেহেতু একই নয়।' কয়েক বছর পরে, একই কার্থাগো মণ্ডলীতে, সাধু চিপ্রিয়ানুসও তেমন ব্যক্তির সম্পাদিত বাপ্তিস্ম অবৈধ ও অকার্যকর বলে গণ্য করেন, কারণ 'Habere non potest Deum patrem qui ecclesiam non habet matrem (হাবেরে নন পতেস্ত্ দেউম পাত্রেম কুই এক্লেসিয়াম নন হাবেত্ মাত্রেম্ - মণ্ডলী যার মাতা নয়, সে ঈশ্বরকে পিতা বলে পেতে পারে না)। কিন্তু পোপ স্তেফান, ২৫৬ সালে, তেমন বাপ্তিস্ম বৈধ ও কার্যকর বলে গণ্য করেন; এবং আজকাল পর্যন্ত মণ্ডলী একই কথা সমর্থন করে, কেননা যদিও একটি মানুষ জল ঢালে ও 'আমি তোমাকে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি' সূত্রটা উচ্চারণ করে, তবু প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং খ্রিষ্টই বাপ্তিস্ম দেন; ফলে খ্রিষ্ট নিজে যা সম্পাদন করেন, মণ্ডলী তা অবৈধ বা অকার্যকর বলে গণ্য করতে পারে না।

১৬ (ক) লুক ১২:৫০।

(খ) ১ যোহন ৫:৬।

(গ) যোহন ১৯:৩৪।

১৭ (ক) ১ করি ৬:১২।

(খ) তের্তুল্লিয়ানুস 'পলের কার্যবিবরণী' নামক অপ্রামাণিক একটা গ্রীক লেখার দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন যার অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি কেবল কোপ্তীয় ভাষায় অনুবাদে এখনও রয়েছে। মূল গ্রীক লেখাটা আনুমানিক ১৬০ খ্রিষ্টাব্দে স্মির্নায় (তুরস্কে) মোটামুটি প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর বর্ণনা অনুসারে রচিত। লেখাটার 'পল ও থেক্লা' নামক একটা অংশ আলাদা ভাবে প্রচলিত ছিল, ও সেটার যথেষ্ট পাণ্ডুলিপি এখনও রয়েছে। পুস্তিকা থেকে জানা যায়, থেক্লা ছিলেন ইকোনিয়ম ও পিসিদিয়া প্রদেশের আন্তিওখিয়া-নিবাসী একজন মহিলা যিনি সাধু পলের মাধ্যমে খ্রিষ্টবিশ্বাস গ্রহণ করেন ও তাঁর দ্বারা ধর্মশিক্ষা, বাণীপ্রচার ও বাপ্তিস্ম প্রদানের অনুমোদন গ্রহণ করেন।

(গ) ১ করি ১৪:৩৪-২৫ দ্রঃ।

১৮ (ক) লুক ৬:৩০ দ্রঃ।

(খ) মথি ৭:৬ দ্রঃ।

(গ) ১ তি ৫:২২ দ্রঃ।

(ঘ) প্রেরিত ৮:২৬-৪০ দ্রঃ।

(ঙ) 'প্রেরিতদূত'; প্রকৃতপক্ষে ফিলিপ ছিলেন পরিসেবক। কিন্তু সেসময় যেকোন পরিব্রাজক বাণীপ্রচারককে 'প্রেরিতদূত' বলে চিহ্নিত করা স্বাভাবিক ছিল।

(চ) 'যাচনায় সাড়া দেওয়া হয়' : ফিলিপ সাড়া দিয়ে রথে ওঠেন, কঞ্চুকী ফিলিপের উপদেশে সাড়া দিয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন।

(ছ) প্রেরিত ৯:১৮ দ্রঃ।

(জ) প্রেরিত ৯:১৫ দ্রঃ। লক্ষণীয় বিষয় : বাপ্তিস্ম দেন যিনি তাঁর নাম আনানিয়াস, শিমোন নয়।

(ঝ) মথি ১৯:১৪।

১৯ (ক) মার্ক ১৪:১৩ দ্রঃ।

(খ) প্রেরিত ১:১১ দ্রঃ।

(গ) যেরে ৩১:৮ দ্রঃ।

২০ (ক) মথি ৩:৬ দ্রঃ।

(খ) মথি ২৬:৪১।

(গ) মথি ৪:১-১০ দ্রঃ।

(ঘ) যাত্রা ১৬:৩ দ্রঃ।

(ঙ) মথি ৪:৪ দ্রঃ।

(চ) হিব্রু ২:৪ দ্রঃ।

(ছ) মথি ৭:৭ দ্রঃ।

অনুতাপ প্রসঙ্গ

আমরা যা 'পুনর্মিলন' বা 'পাপস্বীকার' সাক্রামেন্ত বলে থাকি, তের্তুল্লিয়ানুসের সময়ে সেই ব্যবস্থা মণ্ডলীতে ছিল না। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে, কেবল ৪র্থ শতাব্দীতেই মহাপ্রাণ সাধু বাসিল এমন ব্যবস্থার কথা বলেন যা অনুসারে অনুতপ্ত খ্রিষ্টভক্ত পুরোহিতের কাছে নিজের পাপ স্বীকার করতে পারে।

সুতরাং তের্তুল্লিয়ানুস 'অনুতাপ প্রসঙ্গ' পুস্তিকায় যা কিছু বলেন, তা দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রচলিত ব্যবস্থা ব্যক্ত করে। তিনি বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করতে পারেন বটে, কিন্তু সেই ক্ষমা পাবার আগে মানুষের অনুতাপ করা দরকার। অর্থাৎ, বাপ্তিস্মের মাধ্যমে ঈশ্বরের দয়ার পাত্র হবার আগে মানুষকে অনুতাপ করতে হবে।

তবে একটা প্রশ্ন দাঁড়ায়, বাপ্তিস্ম পাবার পর, যদি কোন মানুষ গুরুতর পাপ করে, তাহলে সে কি করে পুনরায় ঈশ্বরের ক্ষমা পেতে পারবে? তের্তুল্লিয়ানুস সেকালে প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করে বলেন, পাপী মানুষ পুনরায় অনুতাপ-ব্যবস্থার দেওয়া সুযোগ গ্রহণ ক'রে প্রকাশ্যে নিজের পাপ স্বীকার করবে ও কড়া ও প্রকাশ্য প্রায়শ্চিত্ত অনুশীলন করবে। তবেই সেই পাপী মানুষ ঈশ্বরের ক্ষমা লাভ করবে। কিন্তু এই সুযোগ একবারই মাত্র প্রদান করা হবে; অর্থাৎ, পাপী মানুষ তৃতীয় বারের মত অনুতাপ-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করতে পারবে না। এই অনুতাপ-ব্যবস্থা 'এক্সোমলোগেসিস' বিশেষ শব্দ দ্বারা চিহ্নিত।

এক্ষেত্রে, কোন্ কোন্ পাপ এত গুরুতর যার জন্য এক্সোমলোগেসিস-ব্যবস্থা দরকার হতে পারে? 'পালক' নামক প্রাচীন লেখা অনুসারে (যা প্রৈরিতিক পিতৃগণ-এ অন্তর্ভুক্ত), খ্রিষ্টবিশ্বাস ত্যাগ, নরহত্যা ও ব্যভিচার, এই তিন পাপ গুরুতর বলে গণ্য।

শেষ কথা। রোম মণ্ডলী যে বাইবেল ব্যবহার করত, তা ছিল মূল গ্রীক ভাষা থেকে লাতিন ভাষায় অনূদিত বাইবেল; সেই অনুসারে, গ্রীক ভাষায় 'মনপরিবর্তন' শব্দটা লাতিন ভাষায় 'অনুতাপ' শব্দটা দ্বারা অনূদিত হয়। সুতরাং, গ্রীক ভাষায় 'মনপরিবর্তন কর' ও লাতিন ভাষায় 'অনুতাপ কর' বাক্য দু'টো আলাদা মনে হতে পারে, কেননা এমনটা মনে করতে পারি যে, অনুতাপ মনেরই অনুভূতির ব্যাপার মাত্র। কিন্তু তের্তুল্লিয়ানুস স্পষ্টই দেখান যে খ্রিষ্টীয় 'অনুতাপ' একটা অনুভূতি নয়, বরং কৃত অপকর্মের পরে সাধিত এমন বাস্তব ও প্রকাশ্য পদক্ষেপ যা 'মনপরিবর্তনের' শামীল।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১। অনুতাপ বিষয়ে বিধর্মীদের ভুলধারণা

যে ধরনের মানুষ আমরাও একসময় ছিলাম (ক), তথা অন্ধ ও ঈশ্বরের আলোবিহীন, অনুতাপ বলতে তারা, কেবল প্রাকৃতিক দিক দিয়ে, মনের এমন তীব্র অনুভূতি বোঝে যা পূর্বকালীন সিদ্ধান্তজনিত ঘৃণা থেকে আগত। তথাপি ওরা অনুতাপের যুক্তি থেকে তত দূরে রয়েছে যত দূরে ওরা সেই ঈশ্বর থেকে রয়েছে যিনি যুক্তির প্রণেতা। কেননা যুক্তি ঈশ্বরেরই জিনিস, একারণে যে, এমন কিছুই নেই যা বিশ্বনির্মাতা ঈশ্বর যুক্তি অনুসারে ছাড়া যুগিয়ে দিয়েছেন, স্থির করেছেন, বিন্যাস করেছেন; এমন কিছুই নেই যা সম্পর্কে তিনি ইচ্ছা করেছেন তা অযুক্তির সঙ্গে ব্যবহৃত বা উপলব্ধ হবে। সুতরাং ঈশ্বর বিষয়ে যারা অজ্ঞ তারা অবশ্যই তাঁর সমস্ত কিছুর বিষয়েও অজ্ঞ, কারণ বাইরের লোকদের কাছে ধনাগার আদৌ উন্মুক্ত নয়। আর এইভাবে যুক্তির হাল ছাড়া সারা জীবনযাত্রা ধরে বেয়ে বেয়ে ওরা জগতের উপরে প্রায়ই আসন্ন ঝড় (খ) এড়াতে জানে না। আর শুধু তা নয়, অনুতাপ-প্রয়োগ ক্ষেত্রে ওরা যে কেমন অযৌক্তিক ভাবে ব্যবহার করে, তা এ ক'টা মাত্র কথা দ্বারাও প্রমাণ করা যথেষ্ট, যেহেতু ওরা নিজেদের শুভকর্ম ক্ষেত্রেও তা প্রয়োগ করে থাকে। বাস্তবিকই ওরা বিশ্বাস, ভালবাসা, সরলতা, ধৈর্য, দয়া বিষয়ে ততখানি অনুতাপ করে, এসমস্ত গুণাবলি যতখানি অকৃতজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে; তাতে ওরা শুভকর্ম সাধন করেছে বিধায় নিজেদের অভিশাপ দেয়, ও যে ধরনের অনুতাপ প্রধানত উত্তম কর্মে আরোপিত, তা ওরা নিজেদের মনে শক্ত করে ধরে রাখে, ও যত্ন সহকারেই এমনটা মনে রাখে যাতে পরবর্তীকালে শুভ তেমন কিছু আর কখনও না করে। অপরদিকে, অপকর্ম ক্ষেত্রে ওদের দুশ্চিন্তা হালকা। এক কথায়, অনুতাপের দ্বারা ন্যায়কর্ম সাধনের চেয়ে ওরা আরও সহজে অনুতাপ দ্বারা দুষ্কর্ম সাধন করে।

২। অনুতাপ যে ঐশবিষয়, সেসম্পর্কে

কিন্তু ওরা যদি ঈশ্বরের ভাগীদার ও এর ফলে যুক্তিরও ভাগীদার মানুষের মত ব্যবহার করত, তবে ওরা সর্বপ্রথমে যুক্তির গুরুত্ব বিচার-বিবেচনা করত ও সেই যুক্তিকে অশুভ সংশোধনের যুক্তির লক্ষ্যে কখনও ব্যবহার করত না। এক কথায়, ওরা অনুতাপ করা ক্ষেত্রে মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখত যেহেতু কমপক্ষে ঈশ্বরভীতির খাতিরেই অপরাধ করা ক্ষেত্রেও মাত্রা বজায় রাখত। কিন্তু যেখানে ভীতি নেই সেখানে একই প্রকারে সংশোধন নেই, যেখানে সংশোধন নেই সেখানে অনুতাপ অবশ্যই অসার, কেননা ঈশ্বর যা বুনেছিলেন সেটার ফল তথা মানুষের পরিত্রাণ নেই।

কেননা, মানবজাতির প্রথমজন সেই আদমকে নিয়ে শুরু করা যে মানব দুঃসাহসিকতা, সেটার ততখানি ও তত বড় পাপের পর, জগতের যৌতুক-সহ মানুষকে দণ্ডিত করার পর, তাকে পরমদেশ থেকে বিতাড়িত করার পর ও মৃত্যুতে বশীভূত করার পর যখন তিনি পুনরায় নিজের করুণায় ফিরে এসেছিলেন, তখন নিজের সেই প্রাথমিক ক্রোধজনিত দণ্ড বাতিল করে নিজের কর্ম ও প্রতিমূর্তিকে ক্ষমা মঞ্জুর করবেন বলে সন্ধিবদ্ধ হয়ে সেসময় থেকেও অনুতাপকে নিজেতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই তিনি নিজের জন্য একটা জনগণকে সংগ্রহ করলেন ও নিজের মঙ্গলময়তার বহু উপকার দানে সেই জনগণের পুষ্টি সাধন করলেন, এবং সেই জনগণকে বহুবার অতি অকৃতজ্ঞ পাওয়া সত্ত্বেও সর্বদাই অনুতাপের উদ্দেশে তাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানালেন ও ভাববাণী দেবার জন্য নবীদের কণ্ঠ প্রেরণ করলেন। তিনি চরমকালে নিজের আত্মা দ্বারা বিশ্বজগৎকে যে অনুগ্রহ দ্বারা আলোকিত করার কথা (ক), বারে বারে সেই অনুগ্রহ দান করবেন বলে অঙ্গীকার করে তিনি অগ্রদূত হিসাবে অনুতাপের বাপ্তিস্মকে যেতে আদেশ করলেন (খ), যাতে আব্রাহামের বংশের জন্য নিরূপিত সেই প্রতিজ্ঞার উদ্দেশে যাদের অনুগ্রহ দ্বারা আহ্বান করছিলেন, আগে থেকেই অনুতাপের চিহ্ন ও সীল দ্বারা তাদের মিলিত করতে পারেন। এব্যাপারে যোহন নীরব না থেকে বলে ওঠেন, *অনুতাপে প্রবেশ কর* (গ), কেননা সেসময়ও পরিত্রাণ জাতিসকলের কাছে কাছে আসছিল, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞামত প্রভু পরিত্রাণ নিয়ে আসছিলেন। অগ্রদূত হিসাবে যোহন তাঁরই দিকে সেই অনুতাপ চালিত করছিলেন যা মানুষের মনকে শুদ্ধ করার জন্য নিরূপিত, যাতে প্রাচীন

ভুলভ্রান্তি যা কিছু দূষিত করেছিল, মানুষের অন্তরে অজ্ঞতা যা কিছু কলুষিত করেছিল, অনুতাপ সেই সবকিছু মুছিয়ে দিয়ে ও উচ্ছেদ ক'রে, ও বাইরে ফেলে দিয়ে ঊর্ধ্ব থেকে আসন্ন পবিত্র আত্মার জন্য মানুষের বুকের আবাস শুচীকৃত অবস্থায় প্রস্তুত করতে পারে, যাতে করে সেই আত্মা নিজের স্বর্গীয় মঙ্গলদান নিয়ে সেখানে প্রবেশ করে খুশী-সচ্ছেন্দে অবস্থান করতে পারেন। এ মঙ্গলদানগুলোর সংক্ষিপ্ত শিরোনাম একটামাত্র, তথা মানব পরিত্রাণ, যার পূর্ব ধাপ হলো অতীতের পাপকর্ম বিলুপ্তি। এটাই অনুতাপের প্রকৃত কারণ, যত্ন সহকারে ঐশকরুণার কর্মকাণ্ডকে সম্পাদন করা এটাই অনুতাপের কর্ম। যা কিছু মানুষের উপকারে আসে, তা ঈশ্বরের কাজে উপযোগিতা রাখে।

অবশেষে, প্রভুকে জানার ফলে আমরা অনুতাপের যে যুক্তি শিখি, সেই যুক্তি স্থিরীকৃত একটা পদ্ধতি পালন করে তথা, যাতে শুভ কর্ম ও চিন্তার উপরে কখনও কেমন যেন 'হিংসাত্মক হাত' না তোলা হয়। কেননা ঈশ্বর শুভকর্ম ক্ষেত্রে কখনও ভর্ৎসনা করেন না যেহেতু সেই শুভকর্মগুলো তাঁরই, এবং তিনি যখন সেগুলোর প্রণেতা ও রক্ষাকর্তাও, তখন তিনি অবশ্যই সেগুলোর গ্রহীতাও; তাই যখন তিনি গ্রহীতা তখন তিনি প্রতিফলদাতাও। অতএব, যখন মানুষের অকৃতজ্ঞতা শুভকর্মতেও অনুতাপকে যুক্ত করে, তখন সেই অকৃতজ্ঞতা ব্যাপারটা বুঝে নিক; কৃতজ্ঞতাও ব্যাপারটা বুঝে নিক যদি কৃতজ্ঞতা অর্জন করার আকাঙ্ক্ষা শুভকর্মকে প্রণোদিত করে: দু'টোই পার্থিব ও মরণশীল। কেননা কৃতজ্ঞ মানুষকে উপকার করায় তোমার লাভ কতটুকু হয়েছে? বা অকৃতজ্ঞ মানুষকে উপকার করায় তোমার ক্ষতি কতটুকু হয়েছে? শুভকর্ম ক্ষেত্রে স্বয়ং ঈশ্বরই ঋণী, অপকর্ম ক্ষেত্রেও ঠিক তাই; কেননা বিচারক যেকোনো মামলার প্রতিফলদাতা। তাই, যেহেতু বিচারক হলেন সেই ন্যায়ের ঈশ্বর যাঁর কাছে সেই ন্যায় অতি প্রিয় হওয়ায় তিনি তা আদায় ও রক্ষার ব্যাপারে নেতৃত্ব রাখেন, এবং যেহেতু তিনি সেই ন্যায়েই তাঁর ধর্মনীতির সমস্ত সমষ্টি নির্ধারণ করেন, সেজন্য এমনটা কি সন্দেহের বিষয় হবে যে, আমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি অনুতাপ ক্ষেত্রেও ঈশ্বরের কাছে ন্যায় আরোপণীয়? এবং তেমন কর্তব্য এমন, যা তখনই মাত্র পূরণ করা যেতে পারে যখন অনুতাপ কেবল পাপকর্মে সম্পর্কিত। তাছাড়া পাপ বাদে অন্য কোনও কর্ম অপকর্ম নামের যোগ্য নয়, একই প্রকারে শুভকর্ম সম্পাদনে কেউই কখনও অপরাধ করে

না। কিন্তু সে যখন কোন অপরাধ করে না, তখন কেন সে অপরাধের ক্ষেত্র সেই অনুতাপ অন্যায়ভাবে দখল করে? সে কেন নিজের মঙ্গলময়তার উপর এমন কর্ম চাপাচ্ছে যা অপকর্মেরই যোগ্য? তাতে এমনটা হয় যে, একটা বিষয় যখন সেখানে প্রয়োগ করা হয় যেখানে উচিত নয়, তখন যেখানে উচিত সেখানে তা অবহেলা করা হয়।

৩। মাংসময় ও আধ্যাত্মিক পাপ

তবে, কোন্ কোন্ বিষয়ে অনুতাপ ন্যায্য ও দেয় বলে বিবেচিত হতে পারে, অর্থাৎ পাপ বলে যে কি চিহ্নিত করা যেতে পারে, সেসম্পর্কে মনে হয়, অবস্থা-পরিস্থিতিই এমন দাবি রাখে আমি সেগুলো চিহ্নিত করব, কিন্তু ব্যাপারটা নিষ্প্রয়োজনও মনে হতে পারে। কেননা যখন মানুষ প্রভুকে জানে, তখন স্রষ্টা মুখ ফিরিয়ে মানবাত্মার দিকে তাকালে (ক) সেই আত্মা আপনা আপনিই সত্য জ্ঞানে ভেসে ওঠে, এবং প্রভুর আজ্ঞাগুলোর কাছে প্রবেশাধিকার পেয়ে সেই আত্মা সেগুলো দ্বারা সাথে সাথেই এশিক্ষা পায় যে, ঈশ্বর যা বিষয়ে বিরত থাকতে আজ্ঞা করেন, তা-ই পাপ বলে বিবেচনাযোগ্য; কেননা, যখন এ সর্বস্বীকৃত কথা যে ঈশ্বর মহান ও মঙ্গলময়, তখন অবশ্যই অমঙ্গল ছাড়া অন্য কিছুই মঙ্গলের কাছে অগ্রাহ্য নয়, কেননা বিপরীত বিষয়গুলোর মধ্যে কোন বন্ধুত্ব থাকে না।

তথাপি, পাপগুলোর মধ্যে ক'টা ক'টা যে মাংসময় অর্থাৎ দৈহিক ও ক'টা ক'টা যে আধ্যাত্মিক, এবিষয়ে অল্প কথা ব্যয় করা যেন বিরক্তিকর মনে না হয়। কেননা যেহেতু মানুষ এ দ্বিবিধ সত্তার সমন্বয় দিয়ে গঠিত, সেজন্য, সে এমন কিছু দ্বারাই অপরাধ করে যা দ্বারা সে নিজে গঠিত। কিন্তু দেহ ও আত্মা যে দু'টো, এজন্যই যে পাপগুলো পরস্পরের মধ্যে ভিন্ন তা নয়; এমনকি এভিত্তিতে পাপগুলো মহত্তর কারণেই সমান, কারণ সেই দু'টো একদেহ হয়; যদি না একজন পাপগুলোর সত্তার পার্থক্য অনুসারেই নিজের পাপগুলো এমনভাবে নির্ণয় করে যার ফলে সে একটা পাপ অন্য পাপের চেয়ে লঘু বা ভারী গণ্য করে। বস্তুতপক্ষে মাংস ও আত্মা দু'টোই ঈশ্বরের সৃষ্টবস্তু: একটা তাঁর হাতে তৈরী, একটা তাঁর প্রাণবায়ু দ্বারা সম্পন্ন (খ)। তাই, যেহেতু দু'টোই সমানভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেজন্য সেই দু'টোর যেটাই অপরাধ করুক না কেন, সেটা

সমানভাবেই ঈশ্বরকে অপমান করে। যখন সেইসময় দেহ ও আত্মা দু'টোকেই হয় জীবনের উদ্দেশে, না হয় বিচারের উদ্দেশে সমানভাবে উত্থিত করা হবে যেহেতু দু'টোই সমানভাবে হয় অপরাধ করেছিল না হয় নিরপরাধী জীবন যাপন করেছিল, তখন জীবনে, মরণে ও পুনরুত্থানে যার সহভাগিতা ও সংযোগ এত অন্তরঙ্গ, সেই মাংস ও আত্মার ক্রিয়াকর্ম নির্ণয় করা কি তোমার উপর নির্ভর করে? সবকিছুর আগে আমাদের পক্ষে এ স্পষ্টভাবে স্থির করা উচিত, যাতে আমরা বুঝতে পারি যে, আত্মা ও দেহ দু'টোরই জন্য অনুতাপের প্রয়োজনীয়তা যেমন, সেটার চেয়ে দেহ বা আত্মা যেটাই অপরাধ করে থাকে, সেটার জন্য অনুতাপের প্রয়োজনীয়তা কম নয়। দু'টোর দোষ সমান, বিচারক তথা ঈশ্বরও সমান, ফলে অনুতাপের ঔষধও সমান।

পাপগুলো যে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক বলে অভিহিত, এর কারণ হলো যে, প্রতিটি অপরাধ হয় কর্মের না হয় চিন্তার ব্যাপার; এর ফলে, কর্মে যা স্থিত তা দৈহিক, কারণ দেহের মত কর্মটাও দেখা ও স্পর্শ করা যায়; মনে যা স্থিত তা আধ্যাত্মিক, কারণ আত্মা দেখাও যায় না, ধরাও যায় না। এ দ্বারা এটা দেখানো হয় যে, কর্ম সম্পর্কিত অপরাধ শুধু নয়, ইচ্ছা সম্পর্কিত অপরাধও এড়ানো ও অনুতাপ দ্বারা শোধন করা দরকার। কেননা ইচ্ছার অন্ধকার বিঁধিয়ে দিতে অক্ষম হওয়ায় যখন মানব সীমাবদ্ধতা কেবল কর্ম সম্পর্কিত দোষ বিচার করে, তখন সেই ভিত্তিতে আমরা যেন ইচ্ছার দোষগুলো ঈশ্বরের দৃষ্টিতে হালকা মনে না করি। ঈশ্বর তো স্বনির্ভরশীল। যেকোন অপরাধ যেখান থেকে উদ্গত হোক না কেন, তাঁর দৃষ্টি থেকে কিছুই দূরে নয়, কেননা তিনি অজ্ঞও নন, অপরাধ বিচারে আনাতেও অবহেলা করেন না। নিজের স্পষ্ট দৃষ্টিক্ষমতা ক্ষেত্রে তিনি না দেখার ভানও করেন না, অতিরিক্তও আদায় করেন না। তবে কি? ইচ্ছাই যে কর্মের উৎস এবিষয়ে কি বলব? কেননা অপরাধ ক্ষেত্রে যদি ভাগ্য বা আবশ্যকতা বা অজ্ঞতা দোষী বলে সাব্যস্ত করা হয়, তবে সেগুলোই নিজেদের বিচার করুক; কিন্তু সেই সমস্ত নির্দোষী হলে, তবে ইচ্ছা দ্বারা ছাড়া কোনও পাপকর্ম নেই। তাই যখন ইচ্ছাই কর্মের উৎস, তখন ইচ্ছা যখন দোষ ক্ষেত্রে প্রথম, তখন মহত্তর কারণে সেই ইচ্ছা কি দণ্ডের যোগ্য নয়? আরও, যখন কোন না কোন অসুবিধা সেই ইচ্ছা পূরণের ব্যাপারে বাধা দেয়, তখন সেক্ষেত্রেও ইচ্ছা নির্দোষী নয়, কেননা নিজেই নিজেকে দোষী বলে সাব্যস্ত করেছে;

আরও, নিজের যা করার কথা ছিল, কোন না কোন কারণে যদি ইচ্ছা তা পূরণ করে না থাকে, তবে নিজের প্রত্যাশিত কর্মের ব্যাপারে ব্যর্থতা বিষয়েও সে নির্দোষী বলে সাব্যস্ত হবে না। যখন প্রভু এমনটা নির্ধারণ করেন যে, যে মানুষ বাস্তবক্ষেত্রে পরের বিবাহ-শয্যা দখল করেছে সে-ই মাত্র যে ব্যভিচারী তা নয়, বরং সেও ব্যভিচারী যে দৃষ্টির কুকামনা দ্বারা একটা স্ত্রীলোককে দূষিত করেছে (গ), তখন তিনি যদি ইচ্ছারও পাপকর্ম নিষেধ না করেন, তাহলে কেমন করে দেখাতে পারেন যে, নিজেই বিধানে নতুন একটা নিয়ম যোগ করছেন? (ঘ)। সেই অনুসারে, মনের পক্ষে এটা যথেষ্ট বিপজ্জনক যে, যা করা নিষেধ সে তা-ই নিজের সামনে দাঁড় করাবে ও দুঃসাহসের সঙ্গে ইচ্ছা দ্বারা সেই কুকর্ম সম্পন্ন করবে। আর এই ইচ্ছার প্রভাব যখন তত বড় যে নিজের তৃপ্তি সম্পূর্ণরূপে পূরণ না করেও কর্মের খাতিরে লিপ্ত হয়, তখন তার সেই সাধিত কর্মের খাতিরে ইচ্ছাও শাস্তি পাবে। 'আমি ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু তবু কিছুই করিনি' বলা একেবারে অর্থহীন। বরং তুমি যখন ইচ্ছা করছ তখন কর্মটা সম্পাদন করতে বাধ্য, না হয়, তুমি যখন কর্মটা সম্পন্ন কর না, তখন তা না-ই ইচ্ছা করতে বাধ্য, তাতে তোমার বিবেকের স্বীকৃতি দ্বারা তুমি নিজের দণ্ড উচ্চারণ কর। কেননা তুমি যদি কোন একটা শুভকর্ম বাসনা করতে, তাহলে তা সম্পন্ন করার জন্য ব্যস্ত হতে; তেমনিভাবে, যেহেতু তুমি একটা অপকর্ম সম্পন্ন কর না, সেজন্য তোমার পক্ষে সেই অপকর্মকে বাসনা করা উচিত ছিল না। তুমি যেইখানে দাঁড়াবে না কেন, সেখানে তুমি সেই দোষে আবদ্ধ থাকবেই, কারণ হয় তুমি অপকর্ম ইচ্ছা করেছ, না হয় শুভকর্ম সম্পন্ন করনি।

৪। অনুতাপের জন্য আবেদন

সুতরাং, কর্মসাধনে বা ইচ্ছায় মাংস বা আত্মা দ্বারা কৃত সমস্ত পাপকর্মের জন্য যিনি বিচারের মাধ্যমে দণ্ড নির্ধারণ করেছেন, সেই ঈশ্বর অনুতাপের মাধ্যমে ক্ষমাও মঞ্জুর করবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন; তিনি লোকদের বলেছিলেন, 'অনুতাপ কর, আর আমি তোমাকে বাঁচাব', আরও, *আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু ঈশ্বরের উক্তি—আমি মৃত্যুর চেয়ে অনুতাপেই প্রীত* (ক)। সুতরাং, যেহেতু মৃত্যুর চেয়ে অনুতাপ প্রাধান্য পায়, সেজন্য অনুতাপ হলো জীবন। আমার মত পাপী যে তুমি (না, বরং আমার চেয়ে কম পাপী যে

তুমি, কেননা আমি পাপকর্মে আমার প্রাধান্য স্বীকার করি), জাহাজডুবি ব্যক্তি যেমন কোন একটা তক্তা ধরে রাখে তেমনি তুমি ইতস্তত না করে অনুতাপের নির্ভরযোগ্যতা ধর, সেটাকে আঁকড়িয়ে ধর। সেটাই পাপ-তরঙ্গে নিমজ্জিত সেই তোমাকে উঠিয়ে নেবে ও ঐশদয়া-বন্দরে তোমাকে বয়ে নিয়ে যাবে। অপ্রত্যাশিত সুখের সুবিধা কেড়ে নাও, যাতে সেই তুমি যে সময় সময় ঈশ্বরের দৃষ্টিতে *কলসির এক জলবিন্দুই* ছাড়া, *'খামারে ছড়িয়ে পড়া ধুলো'* ছাড়া, ও *'কুমোরের পাত্র'*(খ) ছাড়া অন্য কিছুই নও, সেই তুমি যেন হতে পার সেই 'বৃক্ষের মত যা জলস্রোতের ধারে রোপিত হয়ে চিরন্তন পাতায় সমৃদ্ধ হয়ে যথাসময় ফল বহন করে (গ) ও যা কোন আগুন বা কুড়াল দেখবে না (ঘ)। সত্য খুঁজে পেয়ে (ঙ) ভুলত্রুটির জন্য অনুতাপ কর, ঈশ্বর যা ভালবাসেন না তুমি তা-ই ভালবেসেছ বলে অনুতাপ কর; আমরা নিজেরাও আমাদের দাসদের তা-ই ঘৃণা না করতে দিই না যাতে নিজেরা অপমান বোধ করি; কেননা শ্রদ্ধার মানদণ্ড মনের সমতুল্যতায় স্থিত।

অনুতাপের উপকার গণনা করা বিস্তারিত ব্যাপার, সেজন্য তেমন ব্যাপার মহত্তর বাক্‌শক্তির হাতে তুলে দেওয়া উচিত। তথাপি, আমাদের সঙ্কীর্ণ কার্যক্ষমতার খাতিরে, এসো, আমরা সেই বিষয়ের উপর জোর দিই যা ঈশ্বর মঙ্গলকর ও উৎকৃষ্ট বলে নির্দেশ করেছেন। ঐশনির্দেশ সম্পর্কে আলোচনা করা আমার মতে দুঃসাহস স্বরূপ, কেননা একটা নির্দেশ যে মঙ্গলকর, সেজন্যই যে আমরা তা শুনতে বাধ্য তা নয়, বরং ঈশ্বর নিজেই যে তা নির্দেশ করেছেন, সেইজন্য আমরা তা পালন করতে বাধ্য। আমাদের শ্রদ্ধা দেখানোর ব্যাপারে ঐশমাহাত্ম্যই প্রাধান্যের অধিকারী; হ্যাঁ, যে সেবা করে, তার উপকারিতার চেয়ে, আজ্ঞা করেন যিনি, তাঁরই অধিকার আগে আসে। অনুতাপ করা ভাল, নাকি ভাল না? কেন ভাবছ? ঈশ্বর তো আজ্ঞা করছেন। আর আসলে তিনি কেবল আজ্ঞা করছেন না, কিন্তু উৎসাহিতও করছেন; তিনি পুরস্কার তথা পরিত্রাণের দিকে আহ্বান করছেন; এমনকি দিব্যি দিয়েও তিনি আহ্বান করছেন; 'আমার জীবনেরই দিব্যি' বলে তিনি ইচ্ছা করেন মানুষ তাঁর উপর বিশ্বাস রাখবে। যাদের ব্যাপারে ঈশ্বর দিব্যি দিয়ে শপথ করেন, আহা, কেমন সুখী সেই আমরা। প্রভু যখন দিব্যি দিয়ে শপথ করেন, তখনও আমরা যদি তাঁকে বিশ্বাস না করি, তবে, আহা, কেমন দুর্ভাগা সেই আমরা। অতএব, যা ঈশ্বর ততখানি প্রশংসা করেন, যা বিষয়ে তিনি মানব রীতি

অনুসারেও দিব্যি দিয়ে শপথ করে সাক্ষ্য দেন, অবশ্যই আমরা অতি গাম্ভীর্যের সঙ্গে তা মেনে নিতে ও রক্ষা করতে বাধ্য, যাতে ঐশঅনুগ্রহের তেমন অঙ্গীকারে নিষ্ঠাবান থেকে আমরা সেটার ফল ও উপকার লাভেও নিষ্ঠাবান হতে পারি।

৫। অনুতাপের পরে পাপকর্মে না ফিরে যাওয়া

কেননা আমি এ বলছি যে, যে অনুতাপ ঈশ্বরের অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে প্রদর্শিত হয় ও জারীকৃত হওয়ার পর প্রভুর অনুগ্রহের কাছে আমাদের ফিরিয়ে আনে, আমরা যখন সেটাকে শিখি ও বহন করি, তখন আমাদের পুনঃপুনঃ অপরাধ করার ফলে তা যেন কখনও মুছিয়ে দেওয়া না হয়। নিজের পক্ষসমর্থনের জন্য এখন অজুহাত হিসাবে অজ্ঞতাও আর থাকে না, কেননা প্রভুকে জানার পর ও তাঁর আজ্ঞাবলি মেনে নেওয়ার পর, এক কথায়, পাপের জন্য অনুতাপের উপর নির্ভর করার পর তুমি পাপকর্ম সাধনে ফিরে গিয়েছ। এভাবে তুমি অজ্ঞতা থেকে যতখানি নিজেকে বিচ্ছিন্ন কর, ততখানি দোষ-চেতনায় নিজেকে আবদ্ধ কর। কেননা পাপ করার ব্যাপারে যখন অনুতাপ করার কারণ ছিল এ যে, তুমি প্রভুকে ভয় করতে শুরু করেছিলে, তখন, ভয়ের খাতিরে যা তুমি করেছিলে, কেন তা বিচ্ছিন্ন করতে প্রীত হয়েছ? কেননা দোষ-চেতনা ছাড়া আর এমন কিছু নেই যা ভয়কে উলট পালট করে। যখন ঈশ্বর মানুষের সামনে এত প্রকাশ্য ও তাঁর স্বর্গীয় উপকারের খাতিরে তিনি এত উপলব্ধ যে ঈশ্বর বিষয়ে অজ্ঞতা সম্ভবপর নয়, তখন প্রভু বিষয়ে অজ্ঞ যারা, যখন এমন কোন ব্যতিক্রমও নেই যা তাদেরও দণ্ড থেকে রক্ষা করতে পারে, তখন তিনি যখন জ্ঞাত হন তখন তাঁকে যে অপমান করা হয়, তা কতই না বিপজ্জনক ব্যাপার হয়? ঈশ্বরের সহায়তায় মঙ্গল-অমঙ্গল বিষয়ে জ্ঞান পাবার পর, যা বর্জনীয় ও যা ইতিমধ্যে বর্জন করেছে, তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার পর যে কেউ পুনরায় তাতে লিপ্ত হওয়ায় নিজের জ্ঞানের কাছেও তথা ঈশ্বরের উপহারের কাছেও অপমানজনক ব্যবহার ক'রে ঈশ্বরকে তুচ্ছ করে, সে উপহার বিসর্জন দেওয়ায় দাতাকেও ত্যাগ করে, উপকারকে সম্মান না করায় উপকর্তাকেও অস্বীকার করে। সেই মানুষ কেমন করে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয় হতে পারে যখন তাঁর

উপহার তার নিজের কাছে গ্রহণীয় নয়? এতে দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বর সম্পর্কে সে দোষ-চেতনায় দোষী শুধু নয়, অকৃতজ্ঞও বৈকি।

তাছাড়া, যে মানুষ অনুতাপের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী সেই দিয়াবলকে অস্বীকার করেছিল ও তেমনটা করায় তাকে প্রভুর অধীনে বশীভূত করেছিল, শত্রুর কাছে ফিরে যাওয়ায় সেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে আবার দাঁড় করায় ও তার কাছে নিজেকেই আনন্দোচ্ছ্বাসের বিষয় করে, যার ফলে নিজের শিকার ফিরে পেয়ে সেই ধূর্তজন পুনরায় প্রভুর বিপক্ষে আনন্দ করে, সেই মানুষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এমন পাপ করে যা লঘু নয়। এমনকি, (একথা উচ্চারণ করা যতই বিপজ্জনক হোক, তবু গেঁথে তোলার লক্ষ্যে সেকথা উপস্থাপন করা আবশ্যক), সে কি প্রভুর আগে দিয়াবলকে দাঁড় করাচ্ছে না? এমনটা মনে হচ্ছে, উভয় সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করেছিল, সে সেবিষয়ে তুলনাই করেছে, সে পুনরায় যার দাস হতে পছন্দ করেছে, সে বিচারমঞ্চে তাকেই শ্রেয় বলে বিচার করেছে। এভাবে পাপের অনুতাপ দ্বারা যে প্রভুর কাছে প্রায়শ্চিত্ত করতে শুরু করেছিল, সে নিজের অনুতাপের বিষয়ে অনুতাপ করায় দিয়াবলের কাছে প্রায়শ্চিত্ত করবে ও তেমনটা করে সে ঈশ্বরের কাছে ততখানি নিজেকে ঘৃণ্য করবে যতখানি ঈশ্বরের সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করবে।

কিন্তু কেউ না কেউ বলে, হৃদয় ও মন দিয়ে ঈশ্বরের দিকে তাকালে তিনি প্রসন্ন যদিও মানুষের ব্যবহার সেই মনোভাবের অনুরূপ নয়, আর সেই অনুসারে ওরা নিজেদের ঈশ্বরভীতি ও বিশ্বাস রক্ষা ক'রে পাপ করে চলে, অর্থাৎ কিনা, ওরা নিজেদের শুচিতা বজায় রেখে বিবাহ-শয্যা লঙ্ঘন করে, নিজেদের সন্তানসুলভ কর্তব্য বজায় রেখে পিতামাতাকে বিষ খাওয়ায়। এভাবে এমনটা হবে যে, নিজেদের ঈশ্বরভীতি বজায় রেখে পাপকর্ম সাধন করতে করতে ওরা নিজেদের ক্ষমা বজায় রেখে জাহান্নামে বিচ্যুত হবে। এটাই শঠতার প্রথম একটা উদাহরণ, ওরা ভয় পায় বিধায়ই পাপ করে। তাই আমি মনে করি, ওরা যদি ভয় না পেত তবে পাপ করত না। সুতরাং, যখন ভয়-ই হলো অপমান করার অজুহাত, তখন যে কেউ এমনটা ইচ্ছা করে না ঈশ্বর অপমানিত হবে, সে তাঁকে আদৌ শ্রদ্ধা না করুক। কিন্তু তেমন মনোভাব কেবল এমন মিথ্যাবাদীদেরই বীজ থেকে

উৎপন্ন হয়েছে দিয়াবলের সঙ্গে যাদের বন্ধুত্ব অবিচ্ছেদ্য, যাদের অনুতাপ কখনও বিশ্বাসযোগ্য ছিল না।

৬। চিন্তা-ভাবনা না করে বাপ্তিস্ম গ্রহণীয় নয়

অতএব, অনুতাপ-ব্যবস্থা একবারই মাত্র উপভোগ করা ও তা চিরকাল ধরে রাখা সম্পর্কে আমাদের ক্ষুদ্রতা যে বিনীত পরামর্শ উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছে, সেই পরামর্শ ঈশ্বরের কাছে সেই নিবেদিত সকলকে লক্ষ করে যারা ঈশ্বরের প্রসন্নতা অর্জন করার জন্য কেমন যেন পরিত্রাণের লক্ষ্যে প্রতিযোগী স্বরূপ; কিন্তু বিশেষভাবে সেই যুবা শিক্ষানবিশদেরই লক্ষ করে যারা এইমাত্র নিজেদের কান ঐশবচন দিয়ে শিশিরসিক্ত করতে চলেছে (ক) ও এখনও প্রথম শিশুকালের কুকুরশাবকের মত এখনও নিখুঁৎ-নয় এমন চোখ দিয়ে অনিশ্চিত ভাবে এদিক ওদিক চলাফেরা করতে চেষ্টা করছে; ওরা বলে, ওরা অতীত কাজকর্ম অস্বীকার করে বটে, ও অনুতাপ ধারণ করে রাখে, কিন্তু তা সম্পন্ন করতে অবহেলা করে। কেননা খোদ সেই বাসনার লক্ষ্যই আগেকার কোন একটা কিছু বাসনা করতে ওদের অস্থির করে তোলে; ঠিক সেই ফলগুলোর মত, যেগুলো, যখন পাকার সময়ে টক ও তিক্ত হতে শুরু করে ঠিক তখনও কোন না কোন স্থানে নিজ নিজ সৌন্দর্য দেখায়।

তাছাড়া, বাপ্তিস্মের উপরে রাখা অযথা আস্থা অনুতাপ সম্পর্কে সব ধরনের বিলম্ব ও মতামত অনুপ্রবেশ করায়, কেননা, অতিনিশ্চিত পাপক্ষমা লাভ বিষয়ে নিজেকে নিশ্চিত বোধ করতে করতে মানুষ ইতিমধ্যে মধ্যবর্তী সময়কাল চুরি ক'রে তা পাপ না করার শিক্ষাকাল না ক'রে তা বরং পাপ করার অবসরকালে পরিণত করে। আরও, অনুতাপের শর্ত পূরণ না করা ও অপরাধের ক্ষমা দাবি করা, এ কেমন যুক্তিহীন! এ এমনটা যেন মূল্য শোধ না করা ও মালের জন্য হাত পাতা। কেননা অনুতাপই সেই মূল্য যা প্রভু ক্ষমার জন্য স্থির করেছেন; এই অনুতাপকেই প্রভু দায়মুক্তি উদ্ধারের উদ্দেশ্যে ক্ষতিপূরণ হিসাবে উপস্থাপন করেন। তাই, যখন দর কষাকষির সময়ে বিক্রেতা আগে টাকাটা ছেঁড়া বা জাল বা অব্যবহার্য কিনা সেটাকে পরীক্ষা করে, তখন সেইমত আমরা বিশ্বাস করি

যে, তেমন দামী মাল এমনকি অনন্ত জীবনকেই মঞ্জুর করতে গিয়ে প্রভু আমাদের অনুতাপ-পরীক্ষার উপর অবলম্বন করেন।

[ওরা বলে চলে:] 'কিন্তু ইতিমধ্যে এসো, আমরা তেমন অনুতাপ বাস্তবায়ন স্থগিত করি; আমি মনে করি, এটা স্পষ্ট প্রকাশ পাবে যে, আমরা তখনই শুচীকৃত যখন পাপের ক্ষমা পাই।' না, মোটেই না, বরং আমরা যে শুচীকৃত তা সেসময়ই স্পষ্ট হবে যখন ক্ষমা বিলম্বের সময়ে দণ্ড তখনও সম্ভাব্য; তা সেসময়ই স্পষ্ট হবে যখন আমরা তখনও মুক্তি পাবার যোগ্য নই যাতে করে ক্ষমার যোগ্য হতে পারি; তা সেসময়ই স্পষ্ট হবে যখন ঈশ্বর হুমকি দিতে দিতে তখনও মাপ করেননি। কেননা, মুক্তিলাভের ফলে যার অবস্থা পালটে গেছে এমন কোন্ দাস আগেকার কৃত চুরি ও পলায়ন সংক্রান্ত অভিযোগ নিজের উপর চাপায়? সৈন্যশিবির ত্যাগ করে চলে যাবার পর কোন্ সৈন্য নিজের আগেকার সাধিত ক্ষতের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে? পাপী মানুষ ক্ষমা পাবার আগেই বিলাপ করতে বাধ্য, কেননা অনুতাপের কাল একইসময়ে বিপদ ও ভীতির কাল।

আমি এমনটা অস্বীকার করি না যে ঐশউপকার, তথা অপরাধ মুছিয়ে দেওয়াটা সেই লোকের জন্য সবদিক দিয়ে নিশ্চিত যে-লোক জলে নামতে উদ্যত হচ্ছে; কিন্তু যে জন্য আমাদের শ্রম করতে হয় তা এমনটা হলো যেন আমরা সেই ঐশউপকার অর্জন করতে পারি। কেননা তুমি যে তত অবিশ্বাস্য অনুতাপের মানুষ, সেই তোমাকে কেই বা যেকোনো [আশীর্বাদিত নয় এমন] জলের একটামাত্র চিটাও মঞ্জুর করবে? হ্যাঁ, চালাকি করে এগিয়ে যাওয়া ও নিযুক্ত সেবাকর্মীকে তোমার মিথ্যামিথ্যি দিয়ে বিভ্রান্ত করা সহজ; কিন্তু ঈশ্বর নিজের ধনের উপর নজর রাখেন ও এমনটা দেন না যে অযোগ্য যারা তারা তা চুরি করবে। কেননা তিনি কী বলেন? *গুপ্ত এমন কিছু নেই, যা প্রকাশিত হবে না* [খ]। তোমার কর্মের উপর যতই অন্ধকার টান না কেন, *ঈশ্বর আলো* [গ]। তথাপি এমন কেউ না কেউ এমনটা ভাবে যে, ঈশ্বর যা দেবেন বলে অঙ্গীকৃত হয়েছেন, তিনি কেমন যেন তা অযোগ্যদের উপরেও প্রদান করতে বাধ্য; তাতে ওরা তাঁর উদারতাকে দাসত্বে পরিণত করে। কিন্তু ঈশ্বর যদি বাধ্যবাধকতার খাতিরে মৃত্যুর প্রতীক [ঘ] আমাদের মঞ্জুর করতেন, তবে তিনি অনিচ্ছাকৃত ভাবেই তা করতেন। কেননা কেইবা অনিচ্ছাকৃত ভাবে যা দান করেছে, তা চিরকালের মত রাখতে দেবে? কেননা কি এমনটা হয় না যে,

অনেকে পরবর্তীকালে পতিত হয়? এই দানটা কি অনেকের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হয় না? এরা অবশ্যই সেই মানুষ যারা সেই ধন চুরি করে, যারা অনুতাপ-বিশ্বাসের কাছে এগিয়ে গিয়ে বালুর উপরে একটা ঘর গাঁথে যার পতন অবশ্যম্ভাবী (ঙ)।

অতএব, যে কেউ প্রাথমিক শ্রোতা-পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত, সে যেন এই ভিত্তিতে নিজেকে না ভোলায় যে, তার পক্ষে এখনও পাপ করা বিধেয়। না; যেইমাত্র তুমি প্রভুকে জান, তোমাকে তাঁকে ভয়ও করতে হয়; যেইমাত্র তুমি তাঁর উপর চোখ নিবদ্ধ করেছে, তোমাকে তাঁকে শ্রদ্ধাও করতে হয়। কিন্তু তুমি যখন তাঁর বিষয়ে অজ্ঞ ছিলে, যখন সেই আগেকার সমস্ত সবকিছুতে শুধু হাতে বসে থাক, তখন তুমি যে এখন তাঁকে জেনেছ, তাতে তোমার কী লাভ? আরও, ঈশ্বরের সিদ্ধতাপ্রাপ্ত দাস থেকে কীবা তোমাকে পৃথক করে? এমন এক খ্রিষ্ট আছেন কি যিনি জলসিঞ্চিতদের জন্য, এবং আর এক খ্রিষ্ট যিনি শ্রোতাদের জন্য? প্রত্যাশা বা পুরস্কার কি আলাদা? বিচারের ভয় কি আলাদা? অনুতাপের প্রয়োজনীয়তা কি আলাদা? প্রক্ষালনের মুদ্রাঙ্কনটা বিশ্বাসেরই মুদ্রাঙ্কন, সেই যে বিশ্বাস অনুতাপে বিশ্বাস দ্বারা শুরু হয় ও সমাপ্ত হয়। আমরা যেন অপরাধ করাটা বন্ধ করি সেজন্য নয়, বরং আমরা অপরাধ করাটা বন্ধ করেছি সেজন্যই আমরা প্রক্ষালিত হই, যেহেতু অন্তরে আমরা ইতিমধ্যেই ধৌত। কেননা শ্রোতার [তথা শিক্ষার্থীর] প্রথম বাপ্তিস্ম হলো খাঁটি ভীতি। তারপর, যদি প্রভুকে উপলব্ধি কর, তাহলে [দ্বিতীয় বাপ্তিস্ম হলো] দৃঢ় বিশ্বাস, এমন বিবেক যা অনুতাপকে একবার চিরকালের মত আঁকড়িয়ে ধরেছে।

অন্যথা, এমনটা যদি হত যে, বাপ্তিস্মের জলের পরেই আমরা পাপ করাটা বন্ধ করেছি, তাহলে এমনটা বোঝা যাবে যে, আমরা স্বাধীন ইচ্ছার খাতিরে নয়, বাধ্যবাধকতার খাতিরেই নিরপরাধিতা পরিধান করি। তাই মঙ্গলময়তায় কে উৎকৃষ্ট? সে-ই কি, খারাপ হওয়া যার পক্ষে বিধেয় নয়, নাকি সে-ই যার কাছে তেমনটা হওয়া খারাপ লাগে? সে-ই কি, দুষ্কর্ম থেকে মুক্ত হতে যে বাধ্য, নাকি সে-ই যে মুক্ত হতে প্রীত? তবে যে কেউ প্রভুর কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে, তার পক্ষে যদি পাপ করাটা বন্ধ করা দরকার না হয় যদি না তাকে বাপ্তিস্ম দ্বারা তা করতে বাধ্য করা না হয়, তাহলে এসো, যতক্ষণ অর্গলের দৃঢ়তা প্রতিরোধ না করে, ততক্ষণ যেন আমাদের হাত চুরি করা

থেকে দূরে না রাখি, যতক্ষণ আমাদের দেহের অভিভাবকেরা আমাদের প্রতিরোধ না করে, ততক্ষণ যেন আমাদের চোখ ব্যভিচারের তীব্র কামনা থেকে সংযত না রাখি। কিন্তু যে কেউ তেমন মনোভাব পোষণ করে, আমি জানি না, বাপ্তিস্মের পরে সে পাপ করাটা বন্ধ করেছে বিধায় বেশি কষ্ট পাবে, নাকি সে তা থেকে রেহাই পেয়েছে বিধায় বেশি আনন্দ পাবে। তাই এটাই সমীচীন যে, শ্রোতারা [শিক্ষার্থীরা] বাপ্তিস্ম বাসনা করবে কিন্তু চিন্তা-ভাবনা না করে তা নেবে না। কেননা যে তা বাসনা করে, সে তা সম্মান করে; চিন্তা-ভাবনা না করে যে তা নেয়, সে তা অবজ্ঞা করে; একজনে শালীনতা, অপর একজনে স্পর্ধা প্রকাশ পায়; এ সদিচ্ছা প্রকাশ করে, ও অবহেলা করে; এ তা পাবার যোগ্য হবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে, ও দাবীকৃত পুরস্কার হিসাবে তা নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করে; এ নেয়, ও দখল করে। তুমি কাকে যোগ্য বলে বিচার-বিবেচনা করতে? সে-ই নয় কি, যে নিজেকে বেশি ধৌত করেছে? তুমি কাকে বেশি ধৌত বলে বিচার-বিবেচনা করতে? সে-ই নয় কি, যে প্রকৃত অনুতাপের শর্ত পূরণ করেছে বিধায় বেশি ভীত? কেননা, পাছে সে বাপ্তিস্ম পাবার যোগ্য পরিগণিত না হয়, সেজন্য সেসময়ও অপরাধ করতে সে ভয় করেছিল। অপরদিকে, চিন্তা-ভাবনা না করে যে বাপ্তিস্ম নিয়েছিল, যেহেতু সে দেয় বলে তা নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সেজন্য সেবিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সে ভয় করতে পারল না; এভাবে সে অনুতাপের শর্তও পূরণ করেনি, কারণ অনুতাপের যন্ত্র তথা ভীতি তার ছিল না। চিন্তা-ভাবনা না করে বাপ্তিস্ম নেওয়া অশ্রদ্ধার ফল: সেটা অন্বেষীকে স্ফীত করে, দাতাকে অবজ্ঞা করে। আর এভাবে সেটা সময় সময় প্রতারণা করে, কারণ নিজের কাছে তা-ই প্রতিজ্ঞা করে যা এখনও দেয় হয়নি, এর ফলে যাঁর দান করার কথা, তিনি সবসময় অপমানিত হন।

৭। পতিতদের অনুতাপ সম্পর্কে

হে খ্রিষ্ট প্রভু, অনুতাপ-ব্যবস্থা সম্পর্কে শেখা ও শোনার আশীর্বাদ তোমার দাসদের কাছে মঞ্জুর করা হোক, সেইভাবে, যেভাবে শ্রোতা [শিক্ষার্থী] হিসাবে তাদের পাপ না করাও মানায়, অর্থাৎ অনুতাপ সম্পর্কে যেন এখন থেকে তাদের শেখার মত বা দাবি করার মত আর কিছু দরকার না থাকে (ক)। দ্বিতীয় প্রত্যাশা, এমনকি এক্ষেত্রে শেষ

প্রত্যাশার কথার উল্লেখ যোগ করা বিরক্তিকর ব্যাপার; পাছে অনুতাপের বাকি সহায়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এমনটা মনে হয়, আমরা পাপ করার অতিরিক্ত একটা স্থানের দিকে অঙুলিনির্দেশ করছি। দূর হোক যে এমন একজন আমাদের কথা সেইভাবে বুঝবে, কেমন যেন যেহেতু অনুতাপ করার জন্য একটা উপায় রয়েছে সেজন্য এখনও পাপ করার একটা উপায়ও থাকে, ও কেমন যেন স্বর্গীয় দয়া মানব দুঃসাহসের জন্য একটা অবকাশ রাখে। ঈশ্বর উৎকৃষ্ট বিধায় কেউই যেন যতবার ক্ষমা পায় ততবার পাপ করায় নিকৃষ্ট না হয়। এও নিশ্চিত যে, পাপ করার মত আর কোন উপায় না পেয়ে অবশেষে সে রেহাই পাবার উপায় পাবেই। আমরা একবার রেহাই পেয়েছি; তবে যদিও মনে করতে পারি আমরা দ্বিতীয় বারের মত অবশ্যই রেহাই পাব, কেনই বা নিজেদের বিপদের সম্মুখীন করব? অনেকেই জাহাজডুবিতে মুক্তি পেয়ে সেসময় থেকে বলে, তারা জাহাজ ও সমুদ্র দু'টোই প্রত্যাখ্যান করবে, ও সেই বিপদের কথা স্মরণ করায় ঈশ্বরের উপকার তথা নিজেদের পরিত্রাণ মান্য করে। আমি তাদের সেই ভীতির প্রশংসা করি, তাদের সেই শ্রদ্ধা পছন্দ করি; তারা এমনটা ইচ্ছা করে না, তারা দ্বিতীয় বারের মত ঐশকরুণার জন্য বোঝা হবে; তারা ভয় করে পাছে এমনটা মনে হয় যে, যা লাভ করেছে তা তারা মাড়িয়ে দিচ্ছে; তারা যা একবার ভয় করতে শিখেছে, অবশ্যই শুভ চিন্তা সহকারে দ্বিতীয় বারের মত সেটার অভিজ্ঞতা করতে এড়াচ্ছে। এভাবে তাদের দুঃসাহসিকতার সীমা হয়ে ওঠে তাদের ভীতির সাক্ষ্য স্বরূপ। হ্যাঁ, মানুষের ভীতি ঈশ্বরের প্রতি সম্মান।

তথাপি, সেই একগুঁয়ে শত্রু শঠতা বিষয়ে কখনও একটা অবকাশ নেয় না; এমনকি, সে যখন পূর্ণ রূপে অনুভব করে, একটা মানুষ মুক্ত, তখন সে পুরাপুরিই হিংস্র হয়ে ওঠে; যখন মনে হয় সে নিঃশেষিত হচ্ছে, ঠিক তখনই সে জ্বলে ওঠে। সে যে বিলাপ করবে ও ক্রন্দন করবে তা আবশ্যকীয়, একারণে যে, পাপের ক্ষমা মঞ্জুর করা হয়েছে বিধায় মানুষের জন্য মৃত্যুজনক ততখানি কর্ম উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগে যা ছিল তারই, সেই দণ্ডের ততখানি দাগ মুছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে এতে মনে কষ্ট পায় যে, খ্রিষ্টের দাস সেই পাপী একদিন তার নিজের ও তার দূতদের বিচার করবে (খ)। এভাবে সে তার উপরে নজর রাখে, তাকে আক্রমণ করে ও অবরুদ্ধ করে এই আশায়

যে, সে কোন রকমে মাংসময় কামুকতা দ্বারা তার চোখ আঘাত করবে অথবা জাগতিক প্রলোভন দ্বারা তার মন জড়াবে বা পার্থিব ভীতি দ্বারা তার বিশ্বাস উলটিয়ে দেবে বা জঘন্য প্রথা দ্বারা তাকে নিরাপদ পথ থেকে ছিনিয়ে নেবে; পদস্খলন বা প্রলোভন ক্ষেত্রে সে কখনও অভাবী নয়। তাই, তার এ সমস্ত বিষ আগে থেকে দেখে প্রভু, যদিও ক্ষমার দরজা বাপ্তিস্মের অর্গল দিয়ে রুদ্ধ ও বন্ধ করা হয়েছিল, তবু এমনটা দিয়েছেন যাতে সেই দরজা কোন রকমে কিছুটা খোলা থাকে; তিনি বারান্দায় (গ) সেই দ্বিতীয় অনুতাপ বসালেন যা তাদের জন্য দরজা খুলবে যারা তাতে ঘা দেয়; কিন্তু এবার একবার মাত্র, কেননা এটা হলো সেই দ্বিতীয় বার; কিন্তু তা আর কখনও খুলবে না কারণ শেষবার তা বৃথা খোলা হয়েছিল। আসলে, এই 'একবার'ও কি যথেষ্ট নয়? তুমি তো এমনটা পেয়েছ যা পাবার যোগ্য ছিলে না, কারণ যা পেয়েছিলে তা তুমি হারিয়ে ফেলেছিলে। যদি প্রভুর ক্ষমাশীলতা তোমাকে এমনটা মঞ্জুর করে যে, যা তুমি হারিয়ে ফেলেছিলে তিনি তা ফিরিয়ে দেবেন, তবে পুনরায় দেওয়া এমনকি বর্ধিতই সেই উপকারের জন্য কৃতজ্ঞ হও। কেননা দেওয়ার চেয়ে ফিরিয়ে দেওয়া মহত্তর ব্যাপার, যেইভাবে আদৌ কিছুই না পাবার চেয়ে হারিয়ে ফেলা অধিক শোচনীয় ব্যাপার। তথাপি, কেউ যদি দ্বিতীয় অনুতাপের ঋণে ঋণী হয়ে থাকে, তাহলে তার আত্মা যেন সাথে সাথে নিরাশা দ্বারা উচ্ছিন্ন ও ভূপাতিত না হয়। পুনরায় পাপ করা বিরক্তিকর ব্যাপার হোক, কিন্তু পুনরায় অনুতাপ করা-ই যেন বিরক্তিকর ব্যাপার না হয়; এমন বিরক্তিকর যে একজনকে পুনরায় বিপদের সম্মুখীন করবে, কিন্তু এমন লজ্জাকর নয় যদি একজন পুনরায় মুক্ত হয়ে ওঠে। কেউই যেন এতে লজ্জাবোধ না করে। পুনঃপুনঃ অসুখের জন্য পুনঃপুনঃ ঔষধের দরকার। প্রভু তোমাকে যা দান করেন, তা অগ্রাহ্য না করায়ই তুমি প্রভুর কাছে তোমার কৃতজ্ঞতা দেখাবে। তুমি অপরাধ করেছ, কিন্তু এখনও পুনর্মিলিত হতে পার। তোমার এমন একজন আছেন যাঁকে তুমি তুষ্ট করতে পার, এমনকি এতে তিনি ইচ্ছুক।

৮। ক্ষমা সম্পর্কিত শাস্ত্রীয় নানা উদাহরণ

আর তুমি যদি এব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছ, তবে *আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন* (ক) বচনের অর্থ উদ্ঘাটন কর। এফেসীয়দের তিনি *পরিত্যক্ত ভালবাসা* (খ)

অভিযোগে অভিযুক্ত করেন, থিয়াতিরীয়দের তিনি *ব্যভিচার ও প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্য গ্রহণ* (গ) এর জন্য ভর্ৎসনা করেন, সার্দিসীয়দের তিনি *অসিদ্ধ কর্ম* (ঘ) অভিযোগে অভিযুক্ত করেন, পের্গামীয়দের তিনি জঘন্য বিষয় শেখানো বিষয়ে (ঙ) নিন্দা করেন, লাওদিকীয়দের তিনি তাদের ধনে আস্থা রাখার জন্য (চ) তিরস্কার করেন, তথাপি সকলকে তিনি অনুতাপ সংক্রান্ত একই সতর্কবাণী প্রদান করেন, যদিও সতর্কবাণীটা হুমকির সঙ্গে জড়িত। কিন্তু তিনি যদি অনুতপ্তকে ক্ষমা না করতেন তবে অনুতপ্ত-নয় এমন একজনের প্রতি তিনি কোন হুমকি উচ্চারণ করতেন না। ব্যাপারটা তখনই সন্দেহের বিষয় হত যদি তিনি ইতিমধ্যে অন্যত্র নিজের দয়ার প্রাচুর্য না দেখিয়ে থাকতেন। তিনি কি একথা বলেন না, *যে পড়বে সে পুনরুত্থান করবে, যাকে পথভ্রান্ত করা হয়েছে তাকে সৎপথে আনা হবে?* (ছ)। তিনিই সে-ই যিনি *দয়ায়ই প্রীত, বলিদানে নয়* (জ)। স্বর্গ ও সেই দূতেরা যাঁরা সেখানে রয়েছেন, তাঁরা মানুষের অনুতাপে আনন্দ করছেন (ঝ)। ওহে পাপী যে তুমি, উল্লসিত হও; তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, তোমার ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে কোথায় আনন্দ বিরাজ করবে। প্রভুর উপমাগুলোর সমস্ত বিষয়বস্তু আমাদের জন্য কী অর্থ বহন করে? ব্যাপারটা কি এ নয় যে, একটি স্ত্রীলোক একটা রুপোর টাকা হারিয়ে ফেলেছিল, সে সেটাকে খোঁজে ও খুঁজে পায়, এবং তার বান্ধবীদের নিজের আনন্দের ভাগী হতে আহ্বান করে? (ঞ)। পালকের একটা ছোট্ট মেষ পথভ্রষ্ট হয়, কিন্তু সেটার চেয়ে পাল যে বেশি প্রিয় ছিল তা নয়; সেটার জন্য যত্ন সহকারে অনুসন্ধান করা হয়; সবগুলোকে নয়, সেই একটাকেই বরং বাসনা করা হয়; অবশেষে সেটাকে পাওয়া যায়, ও পথভ্রষ্ট হবার ব্যাপারে সেটা যতই চেষ্টা করেছিল না কেন, তবু সেটাকে পালক কাঁধে করে ফিরিয়ে আনেন (ট)। তেমনি আমি সেই অতি দয়ালু পিতার বিষয়ে নীরব থাকব না যিনি নিজের অপব্যয়ী ছেলেকে বাড়িতে ডাকেন ও তার নিঃস্বতার পরে তাকে অনুতপ্ত অবস্থায় স্বচ্ছন্দেই গ্রহণ করেন, নধর বাছুরটা কাটেন ও নিজের আনন্দকে ভোজসভা দ্বারা অলঙ্কৃত করেন (ঠ)। তেমনটা হবে না কেন? যাকে হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি তাকে পেয়েছিলেন; যাকে নিয়ে লাভবান হয়েছিলেন, তাকে নিজের প্রিয়তমই বলে অনুভব করেছিলেন। সেই পিতা যে কে, সেবিষয়ে আমাদের কি বুঝতে হবে? অবশ্যই, তিনি ঈশ্বর; এমন কেউই নেই যে তেমনভাবে প্রকৃত পিতা, এমন

কেউই নেই যে তেমন সন্তানপ্রেমিক পিতা। অতএব তিনি তোমাকে, তাঁর আপন সন্তানকেই গ্রহণ করে নেবেন যদিও তুমি তাঁর কাছ থেকে যা পেয়েছিল সেইসব উড়িয়ে দিয়েছিল, যদিও তুমি নগ্ন অবস্থায় ফিরে এসেছিলে; হ্যাঁ, তোমাকে গ্রহণ করে নেবেন যেহেতু তুমি ফিরে এসেছিলে, এবং অন্য সেই সংযমী ছেলের চেয়ে তিনি তোমাতে আরও বেশি আনন্দিত হবেন; অবশ্যই, তুমি যদি সর্বান্তঃকরণে অনুতাপ কর, তুমি যদি তোমার নিজের ক্ষুধাকে তোমার পিতার মজুরদের প্রাচুর্যের সঙ্গে তুলনা কর, তুমি যদি সেই অশুচি শূকরদের পিছনে ফেলে রাখ, সেই পিতা অপমানিত হলেও যদি তুমি পুনরায় তাঁকে খোঁজ করতে করতে বল, 'আমি পাপ করেছি, আমি তোমার ছেলে নামের আর যোগ্য নই'। পাপস্বীকার পাপকে তত হালকা করে, ভণ্ডামি তা যত ভারী করে; কেননা পাপস্বীকার প্রায়শ্চিত্তের পরামর্শ, ভণ্ডামি দোষ-চেতনার পরামর্শ।

৯। দ্বিতীয় অনুতাপ সম্পর্কে

তবে, এই দ্বিতীয় ও শেষ অনুতাপের কর্মক্ষেত্র যতখানি সঙ্কীর্ণ, আমাদের পক্ষে এবিষয়ে প্রমাণ দেওয়া ততখানি শ্রমসাধ্য; তা এমন যাতে প্রমাণটা কেবল বিবেকেই ব্যক্ত না হয়ে বরং কোন না কোন কর্মে বাস্তবায়িত হয়। তেমন কর্ম প্রায়ই একটা গ্রীক শব্দে ব্যক্ত ও সাধারণত উচ্চারিত হয় তথা ἐξομολόγησις [এক্সোমলোগেসিস], ও সেই কর্ম দ্বারা আমরা প্রভুর কাছে আমাদের অপরাধ স্বীকার করি: তিনি যে সেগুলো সম্পর্কে অজ্ঞ তা অবশ্যই নয়, কিন্তু এজন্য যে, পাপস্বীকারে প্রায়শ্চিত্ত স্থির করা হয়, পাপস্বীকার থেকে অনুতাপ জন্ম নেয়, অনুতাপ দ্বারা ঈশ্বরকে প্রশমিত করা কয়।

আর এভাবে 'এক্সোমলোগেসিস' মানুষের অবনতি ও অবমাননার জন্য একটা ব্যবস্থা হয়ে ওঠে যা এমন আচরণ আদিষ্ট করে ঈশ্বরের দয়াই যার লক্ষ্য। পরন ও খাদ্যের দিক দিয়েও সেই 'এক্সোমলোগেসিস' অনুতপ্ত ব্যক্তিকে চটের কাপড় ও ছাইতে বসতে, দেহটাকে শোকে আচ্ছন্ন করতে, আত্মাকে দুঃখে লুটিয়ে দিতে, পাপ যাতে কৃত হয়েছিল তা কঠোর ব্যবস্থায় বশীভূত করতে আদেশ দেয়; উপরন্তু, আদেশ দেয়, সাধারণটা ছাড়া অন্য খাদ্য বা পানীয় বর্জন করতে কিন্তু পেটের খাতিরে নয় বটে কিন্তু আত্মারই খাতিরে; তথাপি প্রার্থনা ও উপবাস দ্বারা নিজেদের পুষ্ট করতে, ক্রন্দন করতে,

চোখের জল ফেলতে ও দিনরাত তোমার ঈশ্বর প্রভুর প্রতি হাহাকার করতে আদেশ দেয়। আরও, পুরোহিতদের পায়ে অবনত হতে, ঈশ্বরের প্রিয়জন সেই সাক্ষ্যমরদের প্রতি হাঁটুপাত করতে, ও অনুতাপের পক্ষসমর্থনের দূত হতে সকল ভাইকে আহ্বান করতে আদেশ দেয়। 'এক্সোমলোগেসিস' এসমস্তই সম্পাদন করে যেন অনুতাপকে উন্নত করা হয়, যেন বিপদের ভয়েতে ঈশ্বরকে সম্মান করা হয়, পাপীর বিপক্ষে নিজে দাঁড়িয়েও ঈশ্বরের অসন্তোষের স্থান নেয়, ও সাময়িক দেহসংযম দ্বারা অনন্ত দণ্ডকে বিফল না করলেও কিন্তু তা যেন সরিয়ে দেয়। অতএব, 'এক্সোমলোগেসিস' মানুষকে অবনমিত করতে করতে তাকে উন্নীত করে, ময়লায় আবৃত করতে করতে তাকে আরও পরিষ্কার করে তোলে, অভিযুক্ত করতে করতে তাকে দায়মুক্ত করে; দণ্ডিত করতে করতে তাকে ক্ষমাদান করে। তুমি নিজেকে যত কম রেহাই দেবে, ঈশ্বর তোমাকে তত বেশি মঞ্জুর করবেন।

১০। যারা এব্যবস্থা এড়ায় তাদের সম্পর্কে (১)

তথাপি যেহেতু উপরোল্লিখিত কর্ম সম্পাদনে লোকে নিজেদের একটা প্রকাশ্য দৃশ্য করে, সেজন্য বেশির ভাগ মানুষ একর্ম এড়ায় বা দিনের পর দিন তা স্থগিত করে। আমি মনে করি, ওরা পরিত্রাণের চেয়ে আত্মমর্যাদার জন্যই বেশি চিন্তিত, ঠিক তাদেরই মত যারা দেহের গোপন স্থানে কোন না কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকদের কাছে নিজেদের অবস্থা ব্যক্ত করতে এড়ায় ও এর ফলে নিজেদের লজ্জাবোধের সঙ্গে মরে। হ্যাঁ, অপমানিত প্রভুর কাছে প্রায়শ্চিত্ত করা লজ্জাবোধের পক্ষে অসহ্যই বৈকি, হারানো পরিত্রাণ ফিরে পাওয়াও লজ্জাকর। সত্যি, তোমার লজ্জাবোধে তুমি কেমন আদর্শবান; হ্যাঁ, পাপ করার সময়ে কপাল উচ্চ করা কিন্তু পাপ প্রত্যাখ্যান করার সময়ে লজ্জাবোধ। লজ্জাবোধ হারানোতে আমি যখন লাভবান, তখন সেই লজ্জাবোধ বিষয়ে আমার কিছু যায় আসে না, বিশেষভাবে এভিত্তিতে যে, কোন না কোন ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে লজ্জাবোধ নিজেই বলে, 'আমাকে শ্রদ্ধা করো না; [তোমার পক্ষে আমার দ্বারা মরার চেয়ে) তোমার দ্বারা মরা এ আমার পক্ষে ভাল।' যাই হোক, যে সময়ে লজ্জাবোধের বিপদ স্পষ্ট, (তেমন সময় যদি বা থাকে, তবে) সেসময়টা এ: যখন অপমানকারীদের

সাক্ষাতে হাস্যকর কথা উচ্চারিত হয়, যখন পরের ধ্বংসস্তূপের উপরে একজন নিজেকে উত্তোলন করে, যখন পদদলিতের উপরে একজন নিজেকে উন্নীত করে, তখনই লজ্জাবোধের বিপদ স্পষ্ট। কিন্তু যেখানে আমাদের এক ও একই প্রভু ও পিতা থেকে আগত এক ও একই আত্মা থাকায় এক ও একই প্রত্যাশা, আনন্দ, দুঃখ ও কষ্টভোগ বিরাজ করে, সেই ভাইদের ও সহদাসদের মধ্যে কেনই বা তুমি মনে কর, সেই ভাইয়েরা তোমার চেয়ে আলাদা কিছু? তোমার নিজের দুর্ভাগ্যের ভাগী যারা, কেন তাদের কাছ থেকে বিদ্রূপকারীদেরই কাছ থেকেই যেন পালিয়ে যাও? দেহটা একটামাত্র অঙ্গের কষ্টেও আনন্দ বোধ করতে পারে না [ক], দেহটা বরং একমন হয়ে সেই কষ্টে যোগ দেবে ও প্রতিকারের জন্য শ্রম করবে। দু'জনকে নিয়েই তো মণ্ডলী, কিন্তু মণ্ডলী হলেন স্বয়ং খ্রিষ্ট। তাই, যখন তুমি ভাইদের পায়ে লুটিয়ে পড়, তখন তুমি খ্রিষ্টকেই আঁকড়িয়ে ধরছ, খ্রিষ্টকেই অনুনয় করছ। তেমনিভাবে, যখন তারা তোমার উপর চোখের জল ফেলে, তখন খ্রিষ্টই কষ্টভোগ করছেন, খ্রিষ্টই পিতার কাছে করুণা প্রার্থনা করছেন; আর পুত্র যা যাচনা করেন, তা সহজেই লব্ধ। লজ্জাবোধের পুরস্কার সত্যি মহৎ, আর সেইসঙ্গে দোষত্রুটির গোপনীয়তাও অঙ্গীকৃত। উদাহরণ যোগে, আমরা যখন মানুষের অবগতি থেকে কিছুটা গোপন রাখি, তখন আমরা কি সেইমত তা ঈশ্বরের কাছ থেকেও গোপন রাখব? মানুষের বিচার ও ঈশ্বরের জানাটা সমকক্ষ করা হচ্ছে কি? প্রকাশ্যে ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার চেয়ে গোপনে দণ্ডিত হওয়াই কি ভাল? কিন্তু তুমি বলবে, "তবে সেই 'এক্সোমলোগেসিস' এর কাছে আসা তো দুর্বিপাক।" হ্যাঁ, কেননা অনর্থ দুর্বিপাক আনে, কিন্তু যেখানে অনুতাপ করা হয়, সেখানে দুর্বিপাক শেষ হয় যেহেতু তা পরিত্রাণদায়ী কিছু হয়ে ওঠে। কাটা হওয়া, ছেঁকা হওয়া ও কোন ঔষধজাতীয় গুঁড়ার তীক্ষ্ণতা দ্বারা ক্লিষ্ট হওয়া, এটাই দুর্বিপাক; তাসত্ত্বেও, কড়া হয়েও যা নিরাময় করে, তা চিকিৎসার উপকারের ফলে নিজের সেই তীব্রতাকে অব্যাহতি দেয় ও আসন্ন উপকারের খাতিরে বর্তমান ক্ষতকে সহনীয় করে তোলে।

১১। যারা এব্যবস্থা এড়ায় তাদের সম্পর্কে (২)

যা সম্পর্কে লোকে ততখানি ভাবে, সেই লজ্জাবোধ বাদে, তারা যে চুল-দাড়ি না কেটে, ময়লায় আবৃত হয়ে ও আনন্দবিহীন ভাবে চটের কাপড়ের রূঢ়তায় সময় কাটাতে, ছাইয়ের জঘন্যতায় ও উপবাসজনিত মুখের নিমগ্নতায় সময় কাটাতে বাধ্য, লোকে যখন তেমন দৈহিক অসুবিধা ভয় পায়, তখন কী বলব? তবে আমাদের কি এমনটাই মানায় যে, আমরা উজ্জল-লাল ও বেগুনি কাপড়েই আমাদের পাপের বিষয়ে মিনতি করব? তবে চুল বিভক্ত করার জন্য সুচ নিয়ে, দাঁত মাজার গুঁড়া নিয়ে, ও নখ পরিষ্কার করার জন্য লৌহ বা ব্রঞ্জ জাতীয় কোন একটা কাঁচি নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এসো। যা কিছু নকল উজ্জ্বলতার, যা কিছু লাল জাতীয় রঞ্জনতার, তা সে যত্ন সহকারে ঠোঁটে ও গালে লাগিয়ে দিক। আর শুধু তা নয়, কোন না কোন বাগান-বেষ্টিত বা সামুদ্রিক গোপন ছুটির যায়গায় সে বিলাসী স্নানাগারের অনুসন্ধান করুক, নিজের ব্যয় বাড়িয়ে দিক, নধর পাখির দুর্লভ সুখাদ্য সযত্নে বেছে নিক, নিজের পরিণত আঙুররস আরও বিশুদ্ধ করুক; আর যখন তার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তুমি কার্ জন্য তত ব্যয় করছ?' তখন সে এ উত্তর দিক, 'আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছি, আমি আনন্তকালীন বিনাশে বিপদাপন্ন, সেজন্য আমি এখন ঝুঁকিয়ে পড়ছি, নিজেকে অপচয় করছি ও নিপীড়ন করছি, যাঁকে আমি অপমানিত করেছি, যাতে সেই ঈশ্বরকে আমার সঙ্গে পুনর্মিলিত করতে পারি।'

তবে কেনই বা আত্মা ও দেহের বিরক্তিতে, এমনকি বিরক্তি শুধু নয়, সবরকম অপমান বহনেই ওরা ওদের তেমন বাসনার খাতিরে প্রশাসনিক চাকুরির খোঁজে ঘুরে বেড়ানো ও লড়াই করাটা অপমানজনক বা লজ্জাকরও বোধ করে না? পোশাকের কোন্ নিকৃষ্টতা ওরা ভান করে না? প্রাতঃকালীন ও রাত্রিকালীন অভিনন্দন জানাবার লক্ষ্যে ওরা কোন্ বারান্দা দখল করে থাকে না? হ্যাঁ, সেই মর্মে ওরা উচ্চ যেকোন ব্যক্তিত্বকে দেখা মাত্র প্রণতি জানায়, কোনও ভোজসভায় যোগ দেয় না, চিত্তবিনোদন ধরনের কোনও অনুষ্ঠানে অংশ নেয় না, বরং ব্যক্তিস্বাধীনতা ও উৎসবের আনন্দ থেকে ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজেদের বিরত রাখে; আর এসব কিছু ওরা করে কেবল এক বছরের ক্ষণস্থায়ী আনন্দের খাতিরে। প্রশাসনিক বা মন্ত্রী পদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা যা সহ্য করে, অনন্তত্ব

সঙ্কটাপন্ন হলে আমরা কি তেমন কিছু বহন করতে দ্বিধাবোধ করি? আমরা কি অপমানিত প্রভুর কাছে খাদ্যে ও পরনে আত্মসংযম নিবেদন করতে দেরি করব? বিজাতীয়েরা কাউকে অপমান না করা সত্ত্বেও তেমনটা করে থাকে। এরাই তারা যাদের কথা উল্লেখ করে শাস্ত্র বলে, *ধিক্ তাদের, যারা যেন লম্বা সুতো দিয়েই নিজেদের অপরাধ বাঁধে* (ক)।

১২। 'এক্সোমলোগেসিস' পালনের জন্য শেষ উপদেশ

তুমি যদি 'এক্সোমলোগেসিস' সম্পর্কে দ্বিধাবোধ করছ, তবে মনে মনে সেই জাহান্নামের কথা ভাব যার আগুন 'এক্সোমলোগেসিস' তোমার জন্য নিবিয়ে দেবে; দণ্ড যে কত বড়, তাও আগে ভাব যাতে প্রতিকার আপন করে নেওয়ার ব্যাপারে দ্বিধাবোধ না কর। আমরা অনন্ত আগুনের সেই ধনভাণ্ডার কেমন গণ্য করি, যখন সেটার ক্ষুদ্র চিমনি এমন শিখার বিস্ফোরণ জাগায় যে কাছাকাছির শহরগুলো ইতিমধ্যে বিলীন হয়ে গেছে বা সমরূপ ভাগ্যের দৈনন্দিন অপেক্ষায় রয়েছে? সবচেয়ে গর্বোদ্ধত পাহাড়-পর্বতও সেগুলোর অভ্যন্তর-জনিত আগুনের প্রসব-যন্ত্রণায় বিদীর্ণ হয়ে যায়; এবং সেই বিচার যে চিরকালীন সেটার প্রমাণ স্বরূপ, সেগুলো বিদীর্ণ হয়েও ও বিলুপ্ত হয়েও তবু কখনও নিঃশেষিত হয় না। কেইবা পাহাড়-পর্বতের তেমন অভ্যন্তরীণ যন্ত্রণাকে আসন্ন বিচারের হুমকি বলে গণ্য করবে না? সেই অগ্নিশিখা যে সেই ক্ষেপণাস্ত্র স্বরূপ যেগুলো অপরিমেয় কোন বৃহত্তম অগ্নেয় গর্ভ থেকে নিক্ষিপ্ত, কেইবা এবিষয়ে একমত হবে না?

অতএব, যেহেতু তুমি এ জান যে, প্রভুর বাপ্তিস্মের প্রথম প্রাকারের পর সেই 'এক্সোমলোগেসিস'-এ জাহান্নামের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় একটা সহায়ক তোমার জন্য বাকি রয়েছে, সেজন্য তুমি তোমার পরিত্রাণ কেন প্রত্যাখ্যান কর? যা তোমাকে নিরাময় করে, তার দিকে এগিয়ে যেতে কেন তুমি দেরি কর? বোবা সেই যুক্তিক্ষমতাহীন পশুরাও প্রয়োজনের সময়ে সেই ঔষধ চিনে নেয় যেগুলো ঐশ্বরিক ভাবে তাদের জন্য নিযুক্ত হয়েছে। তীরে বিদ্ধ হয়ে হরিণও এ জানে যে, লোহাটা ও সেটার সঙ্গে জড়িত সমস্ত কিছু জোরপূর্বক বের করার জন্য তাকে মারজোরাম ঘাস দিয়েই নিজেকে নিরাময় করতে হয়। যখন চড়ুই পাখি নিজের বাচ্চাগুলোকে অন্ধ করে, তখন সে জানে যে, সে

কেলিদোনিয়া ঘাস দিয়ে তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারবে। তবে পাপী মানুষ একথা জেনে যে, তার নিজের পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেই 'এক্সোমলোগেসিস' প্রভু দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছে, সে কি সেটারই পাশ কাটিয়ে চলবে যা বাবিলন-রাজাকে তাঁর নিজের রাজত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিল? (ক)। সেই রাজা ঈগলতুল্য কায়দায় তার নিজের নখ বাড়তে বাড়তে ও যুবসিংহতুল্য ভয়ঙ্করতায় তার নিজের চুল অমার্জিত রাখায় সাত বছর ব্যাপী নোংড়া অবস্থায় নিজের 'এক্সোমলোগেসিস' সাধনা ক'রেই তিনি প্রভুর কাছে দীর্ঘ সময় ধরে নিজের অনুতাপ বলিরূপে অর্পণ করেছিলেন। আহা, কেমন দুরবস্থা! যাঁর সামনে মানুষ কাঁপত, ঈশ্বর তাঁকে ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন। কিন্তু, অপরদিকে, যিনি ঈশ্বরের এককালীন দুঃখক্লিষ্ট জনগণকে তাদের আপন ঈশ্বরের কাছে যেতে দিতে অস্বীকার করেছিলেন ও তাদের ধাওয়া করার পর যুদ্ধে নেমেছিলেন, সেই মিশররাজ তত সতর্কতামূলক আঘাতের পর দু'ভাগে বিভক্ত সেই সাগরে, ফিরে আসা তরঙ্গের মধ্যেই মারা গেছিলেন, সেই যে সমুদ্র আগে কেবল সেই জনগণের পক্ষেই পার হতে দেওয়া হয়েছিল (খ); হ্যাঁ, সেই মিশররাজ অনুতাপকে ও তার অনুচারিণী 'এক্সোমলোগেসিস'-কে ফেলে দিয়েছিলেন।

আমার নিজের বিবেকের কর্তব্য কর্মের চেয়ে লেখনীর বিষয়টার প্রতিই বেশি মনোযোগ দেওয়ায় কেন আমি মানব পরিত্রাণের এই দুই তক্তাতেই যেন আরও বেশি কিছু যোগ করব? কেননা যা বিষয়ে মানবজাতির ও মানব অপরাধের প্রথম মাথা ও উৎস সেই আদমও 'এক্সোমলোগেসিস' দ্বারা তাঁর নিজের পরমদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে নীরব থাকেন না, সব দিক দিয়ে পাপী এই আমি, অনুতাপ করা ছাড়া অন্য কারণে সঞ্জাত নই এই আমি, সেই আমি সেবিষয়ে সহজে নীরব থাকতে পারি না।

---

১ (ক) তের্তুল্লিয়ানুস বিধর্মীদের কথা বলছেন; তিনি নিজেই তো বাপ্তিস্ম নেবার আগে বিধর্মী ছিলেন।

(খ) 'জগতের উপরে প্রায়ই আসন্ন ঝড়', সেকালের খ্রিষ্টিয়ানদের মত তের্তুল্লিয়ানুসও ধারণা করেন, জগতের শেষ দিন সন্নিকট।

২ (ক) হিব্রু ১:১; ১ পি ১:২০।

(খ) ঈশ্বর এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যেন অনুতাপের উদ্দেশে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বাপ্তিস্ম অনুগ্রহ ও পবিত্র আত্মার উদ্দেশে বাপ্তিস্মের পূর্বে অগ্রদূত হিসাবে আবির্ভূত হয়।

(গ) মথি ৩:২ দ্রঃ।

৩ (ক) লুক ২২:৬১ দ্রঃ।

(খ) আদি ২:৭ দ্রঃ।

(গ) তের্তুল্লিয়ানুসের ধারণা এ, যে মানুষ অপকর্ম সাধন করবে বলে সঙ্কল্পবদ্ধ, সে সেই মুহূর্তে আদালতের সামনে নির্দোষী, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে দোষী।

(ঘ) মোশির যে বিধান কৃত কর্মের উপর নির্ভর করত, খ্রিষ্ট সেই বিধানে ইচ্ছা বা সঙ্কল্প-যুক্ত পাপকর্মের নিষেধাজ্ঞাকে যোগ করেন (মথি ৫:২৭ ইত্যাদি পদ দ্রঃ)।

৪ (ক) এজে ১৮:২১; ৩:১১ দ্রঃ

(খ) ইশা ৪০:১৫; হো ১৩:৩; যেরে ১৯:১১ দ্রঃ।

(গ) সাম ১ দ্রঃ।

(ঘ) মথি ৩:১৩ দ্রঃ।

(ঙ) যোহন ১৪:৬ দ্রঃ।

৬ (ক) দ্বিঃবিঃ ৩২:২ দ্রঃ।

(খ) লুক ৮:১৭ দ্রঃ।

(গ) ১ যোহন ১:৫ দ্রঃ।

(ঘ) ‘মৃত্যুর প্রতীক’ অর্থাৎ পাপ।

(ঙ) মথি ৭:২৬-২৭ দ্রঃ।

৭ (ক) এককথায়, হে খ্রিষ্ট প্রভু, এমনটা কর যেন বাপ্তিস্ম নেওয়ার পর এই শিক্ষার্থীরা কখনও পাপ না করে।

(খ) ১ করি ৬:৩ দ্রঃ।

(গ) ‘বারান্দা’ অর্থাৎ সেই স্থান যেখানে অনুতাপ-ব্যবস্থা পালনকারীরা থাকত।

৮ (ক) প্রকাশ ২:৭।

(খ) প্রকাশ ২:৪ দ্রঃ।

(গ) প্রকাশ ২:২০ দ্রঃ।

(ঘ) প্রকাশ ৩:২ দ্রঃ।

(ঙ) প্রকাশ ২:১৪-১৫, পের্গামন মণ্ডলী দ্রঃ।

(চ) প্রকাশ ৩:১৭ দ্রঃ।

(ছ) যেরে ৮:৪ দ্রঃ।

(জ) হো ৬:৬ দ্রঃ।

(ঝ) লুক ১৭:৭, ১০ দ্রঃ।

(ঞ) লুক ১৫:৮-১০ দ্রঃ।

(ট) লুক ১৫:৩-৭ দ্রঃ।

(ঠ) লুক ১৫:১১-৩২।

১০ (ক) ১ করি ১২:২৬ দ্রঃ।

১১ (ক) ইশা ৫:১৮ দ্রঃ।

১২ (ক) দা ৪:২৫-৩৪ দ্রঃ।

(খ) যাত্রা ১৪:১৫-৩১ দ্রঃ।

প্রার্থনা প্রসঙ্গ

এই লেখায় তের্তুল্লিয়ানুস প্রভুর প্রার্থনা ব্যাখ্যা করার পর বাপ্তিস্মপ্রার্থীদের কাছে প্রার্থনা সংক্রান্ত নানা উপদেশমূলক বাণীও উপস্থাপন করেন।

তাঁর উপস্থাপিত ব্যাখ্যা থেকে (২-৯ অধ্যায় দ্রঃ) অনুমান করা যেতে পারে, সেকালে আফ্রিকায় (এবং হয় তো রোমেও) প্রচলিত প্রভুর প্রার্থনা মোটামুটি এরূপ ছিল :

Pater qui in cælis es,
হে স্বর্গস্থ পিতা,

Sanctificetur nomen tuum,
তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক,

Fiat voluntas tua in cælis et in terra,
তোমার ইচ্ছা স্বর্গে ও মর্তে পূর্ণ হোক,

Veniat regnum tuum.
তোমার রাজ্য আসুক।

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
আমাদের দৈনিক রুটি আজ আমাদের দাও ;

Dimitte nobis debita nostra (… quod remittere nos quoque profitemur debitoribus nostris)
আমাদের ঋণ ক্ষমা কর, (এর ব্যাখ্যায় : … আমরাও স্বীকার করি, আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করব),

Ne nos inducas in temptationem,
আমাদের প্রলোভনে চালিত ক'রো না,

Sed devehe nos a malo.
কিন্তু সেই ধূর্তজন থেকে আমাদের দূরে নিয়ে যাও।

প্রায় ৫০ বছর পরে, তাঁর সহনাগরিক সাধু চিপ্রিয়ানুসও 'প্রভুর প্রার্থনা' লেখায় প্রভুর প্রার্থনা ব্যাখ্যা করেন, যা তের্তুল্লিয়ানুসের উপস্থাপিত প্রভুর প্রার্থনা থেকে কিছুটা ভিন্ন :

Pater noster qui es in cælis,
হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা,

Sanctificetur nomen tuum,
তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক,

Adveniat regnum tuum,
তোমার রাজ্য আসুক,

Fiat voluntas tua in cælo et in terra.
তোমার ইচ্ছা স্বর্গে ও মর্তে পূর্ণ হোক।

Panem nostrum cottidianum da nobis hodie,
আমাদের দৈনিক রুটি আজ আমাদের দাও ;

Et dimitte nobis debita nostra,
এবং আমাদের ঋণ ক্ষমা কর,

sicut et nos remittimus debitoribus nostris,
যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করি ;

Et ne patiaris nos induci in temptationem,
আর আমরা প্রলোভনে চালিত হব তা হতে দিয়ো না,

Sed libera nos a malo. Amen
কিন্তু অনর্থ থেকে আমাদের নিস্তার কর। আমেন।

কেবল আনুমানিক ৪০০ খ্রিষ্টাব্দেই সাধু যেরোম প্রভুর প্রার্থনার একটা লাতিন অনুবাদ উপস্থাপন করেন যা মূল গ্রীক ভাষা অনুযায়ী।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯

১। প্রভুর শেখানো প্রার্থনা সম্পর্কে সার্বিক সূচনা

ঈশ্বরের আত্মা, ঈশ্বরের বাণী ও ঈশ্বরের যুক্তি যিনি (ক), যিনি নিজেই যুক্তির বাণী, বাণীর যুক্তি ও উভয়েরই আত্মা, আমাদের প্রভু সেই যিশুখ্রিষ্ট নূতন নিয়মের শিষ্যদের এই আমাদের জন্য প্রার্থনার এক নতুন রীতি স্থির করেছেন। কেননা এক্ষেত্রেও এমনটা প্রয়োজন ছিল যে, নতুন আঙুররস নতুন ভিস্তিতে রাখা হবে ও নতুন পোশাকে নতুন কাপড়ের তালি দিতে হবে (খ)। তাছাড়া, অতীতে যা হয়েছিল, তা হয় প্রায়ই পরিবর্তিত হয়েছিল, যেমন সেই পরিচ্ছেদন, না হয় তা সম্পূরণ করা হয়েছিল, যেমন বিধানের বাকি অংশ, না হয় তা পূর্ণতা লাভ করেছিল, যেমন সেই নবীদের বাণী; না হয় তা সিদ্ধিলাভ করেছিল, যেমন সেই খোদ বিশ্বাস। কেননা গোটা প্রাচীন ব্যবস্থাকে যা মুছিয়ে দিয়েছিল, সেই সুসমাচারকে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে ঈশ্বরের নতুন অনুগ্রহ সমস্ত কিছু মাংসময় অবস্থা থেকে আত্মিক অবস্থায় নবীকৃত করেছে; সেই সুসমাচারেই আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট ঈশ্বরের আত্মা বলে, ঈশ্বরের বাণী বলে ও ঈশ্বরের যুক্তি বলে স্বীকৃত হলেন; তথা তিনি সেই আত্মা যা দ্বারা তিনি পরাক্রমী ছিলেন, সেই বাণী যা তিনি শিখিয়ে দিলেন, সেই যুক্তি যার কারণে তিনি এলেন। এভাবে খ্রিষ্টের উপস্থাপিত প্রার্থনা তিন ভাগ দিয়ে গঠিত: উক্তিতে গঠিত, যা দ্বারা প্রার্থনাটা উচ্চারিত, আত্মায় গঠিত, যা দ্বারা প্রার্থনাটা তত প্রভাবশালী, যুক্তিতে গঠিত, যা দ্বারা প্রার্থনাটা শেখানো হয়। যোহনও নিজের শিষ্যদের প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন, কিন্তু যোহনের সবকিছু ছিল খ্রিষ্টের জন্য বুনিয়াদ স্বরূপ, ততদিন যতদিন না, (যেভাবে যোহন নিজে পূর্বঘোষণা করতেন, সেই অনুসারে যা উচিত ছিল তা সিদ্ধিলাভ করবে তথা খ্রিষ্ট উত্তরোত্তর বড় হবেন আর যোহন ছোট হবেন (গ)), সেই অগ্রদূতের গোটা কর্ম তাঁর নিজের আত্মা সহ প্রভুর কাছে পার হবে। সেজন্য যোহন যে কেমন কথা প্রয়োগ করে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন, তা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, যেহেতু পার্থিব বিষয় স্বর্গীয় বিষয়ের জন্য স্থান দিয়েছিল। যোহন বলেন, *পৃথিবী থেকে যে আসে, সে তো পার্থিব কথা বলে; স্বর্গ থেকে যিনি এখানে উপস্থিত, তিনি যা দেখেছেন, সেবিষয়েই কথা বলেন* (ঘ)। এবং খ্রিষ্ট প্রভুর যা, ফলত তাঁর যে প্রার্থনা-পদ্ধতিও, তাতে স্বর্গীয় নয় এমন কি আছে?

তাই, হে ধন্য শ্রোতাগণ [শিক্ষার্থীগণ], এসো, তাঁর স্বর্গীয় প্রজ্ঞার কথা ভাবি: প্রথমত, আমরা গোপন স্থানে প্রার্থনা করা সংক্রান্ত সেই আদেশ তুলে ধরব যা দ্বারা তিনি মানুষের বিশ্বাস দাবি করেছিলেন যাতে মানুষ এতে আস্থাবান থাকে যে, সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি ছাদের নিচেও বিদ্যমান ও গুপ্ত স্থান পর্যন্ত প্রসারিত; তিনি বিশ্বাসের বিনয়ও দাবি করছিলেন যাতে বিশ্বাস নিজের ভক্তি কেবল তাঁকেই অর্পণ করে যাঁর বিষয়ে সেটা বিশ্বাস করে যে, তিনি সর্বস্থানে শোনেন ও দেখেন (ঙ)।

পরবর্তী আদেশেও এমন প্রজ্ঞা ব্যক্ত হোক যা তখনও বিশ্বাস ও বিশ্বাসের বিনয় সংক্রান্ত, যখন আমরা এমনটা মনে করি না যে অগণন কথায় প্রভু অভিমুখে এগিয়ে যাওয়া দরকার হয়, কেননা আমরা এতে নিশ্চিত যে, তিনি নিজে থেকেই তাঁর আপনজনদের উপর দৃষ্টি রাখেন (চ)। তথাপি প্রার্থনাটার এই সংক্ষিপ্ততা (আর এটাই হোক প্রজ্ঞার তৃতীয় ধাপ) মহৎ ও সুখময় ব্যাখ্যার ভিত্তি দ্বারা সমর্থিত, ও অর্থে তা যেমন প্রসারী, কথায় তেমনি সংক্ষেপিত। কেননা, এই ধাপ প্রার্থনাটার বিশিষ্ট কর্তব্যকে তথা ঈশ্বরকে উপাসনা ও মানুষের জন্য যাচনাকে শুধু নয়, প্রভুর সমস্ত উপদেশ ও তাঁর শিক্ষার সমস্ত স্মৃতি-বাক্যও নিজেতে জড়িয়ে নিয়েছে, যাতে করে অবশেষে এমনটা দাঁড়ায় যে, সেই প্রার্থনার মধ্যে গোটা সুসমাচারের সারকথা অন্তর্ভুক্ত।

২। **প্রথম উক্তি** (মথি ৬:৯ ক; লুক ১১:২ ক)

প্রার্থনাটা ঈশ্বরের বিষয়ক সাক্ষ্য ও বিশ্বাসের পুরস্কার দিয়ে শুরু হয়; বাস্তবিকই আমরা বলি, '**হে স্বর্গস্থ পিতা**।' কেননা তাই ব'লে আমরা ঈশ্বরকেও অনুনয় করি ও সেইসঙ্গে বিশ্বাসও সমর্থন করি যা গুণে আমরা সেই সম্বোধন [তথা 'পিতা'] উচ্চারণ করি। শাস্ত্রে লেখা রয়েছে, *তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখল যারা, তাদের তিনি ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত হওয়ার অধিকার দিলেন* (ক)। তথাপি, আমাদের প্রভু আমাদের কাছে বারে বারে ঈশ্বরকে পিতা বলে ঘোষণা করলেন; এমনকি এবিষয়ে তিনি একটা আদেশ দিলেন, স্বর্গে আমাদের যে পিতা আছেন, তাঁকে ছাড়া আমরা যেন পৃথিবীতে অন্য কেউকে পিতা বলে সম্বোধন না করি (খ)। তাই সেইভাবে প্রার্থনা ক'রে আমরা আদেশটাও মান্য করছি। সুখী যারা নিজেদের পিতাকে চিনে নেয়। এটা সেই অভিযোগ

যা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে আনা হয় ও যা বিষয়ে ঐশআত্মা স্বর্গ ও পৃথিবীকে সাক্ষী রাখেন; তিনি বলেন, *আমি সন্তানদের জন্ম দিয়েছি, কিন্তু তারা আমাকে চেনেনি* (গ)। তাছাড়া, পিতা বলায় আমরা তাঁকে ঈশ্বরও বলে ডাকি। তেমন সম্বোধন একইসময় সন্তানসূলভ ভক্তি ও প্রতাপেরও সম্বোধন। একই প্রকারে, পিতাতে পুত্রকে আহ্বান করা হয়, *কেননা আমি এবং পিতা, আমরা এক* (ঘ)। আমাদের মাতা সেই মণ্ডলীও বাদ পড়ে না (ঙ), যেহেতু পিতা ও পুত্রতে সেই মাতাকে চিনে নেওয়া হয়, যে মাতা থেকে পিতা ও পুত্র নাম দু'টো উদ্গত। তাই একটামাত্র ও একই শব্দে বা কথায় আমরা তাঁর আপনজনদের (চ) সহ পিতাকেও সম্মান করি, সেই আদেশের কথাও স্মরণ করি, ও তাদের চিহ্নিত করি যারা তাদের নিজেদের পিতাকে ভুলে গেছে।

৩। **দ্বিতীয় উক্তি** (মথি ৬:৯ খ, লুক ১১:২ খ)

[সেসময়] 'পিতা ঈশ্বর' নামটা কারও কাছে প্রকাশিত হয়নি। এবিষয়ে ঈশ্বরকে প্রশ্ন রেখেছিলেন যিনি, সেই মোশিও ভিন্ন একটা নাম শুনেছিলেন (ক)। আমাদের কাছে পুত্রেই নামটা প্রকাশিত হয়েছে (খ), কেননা ইতিমধ্যে পুত্র আবির্ভূত হওয়ায় ঈশ্বরের নতুন নাম হলো 'পিতা'; তিনি নিজে বলেন, *আমি পিতার নামে এসেছি* (গ), আরও, *পিতা, তোমার নাম গৌরবান্বিত কর* (ঘ), এবং আরও স্পষ্ট ভাবে, *আমি সকল মানুষের কাছে তোমার নাম প্রকাশ করেছি* (ঙ)। অতএব আমরা প্রার্থনা করি যেন সেই নামের পবিত্রতা প্রকাশিত হয়। এ এমনটা মানায় না যে মানুষ ঈশ্বরের মঙ্গল কামনা করবে ঠিক যেন অন্য এমন একজন থাকত যার দ্বারা তাঁর মঙ্গল কামনা করা যেতে পারে, বা ঠিক যেন আমরা তাঁর মঙ্গল কামনা না করলে তাঁকে কষ্ট পেতে হবে। এ স্পষ্ট যে, সর্বক্ষেত্রে ঈশ্বরকে এমনটাই মানায় যে, তিনি সর্বস্থানে ও সর্বকালে ধন্য বলে ঘোষিত হবেন, তাঁর সেই সমস্ত উপকারের খাতিরে যা স্মরণ করা প্রতিটি মানুষের দেয় কর্তব্য। তাই এই উক্তি একটা 'ধন্য'-স্তুতিবাদের ভূমিকাও ধারণ করে (চ)। অন্যথা, তিনি যখন নিজে থেকে বাকি সকলকে পবিত্রিত করেন, তখন কবেই বা ঈশ্বরের নাম নিজেরই মধ্য দিয়ে পবিত্র ও পবিত্র বলে ঘোষিত হবার যোগ্য নয়? বস্তুত দূতগণ তাঁকে ঘিরে 'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র' বলায় কখনও ক্ষান্ত হন না (ছ)। অতএব, একই প্রকারে আমরা যারা দূত-অবস্থার

জন্য নিরূপিত, তেমন যোগ্যতা পেলে তবে সেই আমরাও এই পৃথিবীতে থাকতেই ঈশ্বরকে দেয় সেই স্বর্গীয় উক্তি শিখি ও ভাবী গৌরব সংক্রান্ত সেই দায়িত্ব-কর্তব্যও শিখি [জ]। ঈশ্বরের গৌরব সম্পর্কে আপাতত একথা যথেষ্ট।

অপর দিকে, আমরা যখন বলি '**তোমার নাম পবিত্রিত হোক**', তখন আমাদের নিজেদেরই যাচনা ক্ষেত্রে আমরা প্রার্থনা করি যেন, ঈশ্বরে যারা রয়েছি, সেই আমাদের মধ্যেই সেই নাম পবিত্রিত হয়, আবার অন্য সকলের মধ্যেও যেন তেমনটা হয় যাদের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ এখনও প্রতীক্ষায় রয়েছে [ঝ], যাতে সকল মানুষের জন্য, আমাদের শত্রুদেরও জন্য প্রার্থনা করায় [ঞ] আমরা এই আদেশও পালন করি। অতএব উক্তিটা অনির্দিষ্ট রেখে আমরা তোমার নাম 'আমাদের মধ্যে' না বলে বরং বলি, 'সকলের মধ্যে'ই পবিত্রিত হোক।

৪। **তৃতীয় উক্তি** (মথি ৬:১০ খ; লুক ১১:৩)

প্রার্থনাটার নমুনা অনুসরণ করে আমরা '**তোমার ইচ্ছা স্বর্গে ও মর্তে পূর্ণ হোক**'[ক] উক্তিটা যোগ করি; এ এমন নয় ঠিক যেন কোন না কোন প্রভাব ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হতে প্রতিরোধ করছিল ও আমরা তাঁর ইচ্ছার সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করছিলাম; বরং আমরা প্রার্থনা করি যেন তাঁর ইচ্ছা সকলের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে। কেননা 'মাংস' ও 'আত্মা' এর প্রতীকমূলক ব্যাখ্যা দ্বারা আমরা নিজেরাই সেই 'স্বর্গ' ও সেই 'পৃথিবী'। আর যদিও উক্তিটা সরল অর্থ অনুসারে ব্যাখ্যা করা হত তবু সেটার অর্থ একই হয়ে থাকত, অর্থাৎ, যাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা মর্তে আমাদের মধ্যেই পূর্ণ হয় তা যেন স্বর্গেও পূর্ণ হতে পারে। কিন্তু আমরা যেন তাঁর ব্যবস্থা অনুসারে এগিয়ে চলি, এ ছাড়া ঈশ্বর কীবা ইচ্ছা করেন? তাই আমরা যাচনা করি যেন তিনি তাঁর নিজের ইচ্ছার সমষ্টি ও তা পূর্ণ করার ক্ষমতা আমাদের যুগিয়ে দেন যাতে আমরা স্বর্গে ও মর্তেও পরিত্রাণ পেতে পারি; কেননা তাঁর ইচ্ছার সারাংশ হলো তাদেরই পরিত্রাণ যাদের তিনি নিজের দত্তক করেছেন। ঈশ্বরের সেই ইচ্ছাও রয়েছে যা প্রভু প্রচারে, কর্ম সম্পাদনে ও কষ্ট সহ্য করায় পূর্ণ করেছেন [খ], কেননা যখন তিনি নিজে ঘোষণা করলেন, তিনি নিজের ইচ্ছা নয়, পিতারই ইচ্ছা পালন করলেন, তখন যা তিনি করছিলেন সেই সবকিছু নিঃসন্দেহেই ছিল পিতার ইচ্ছা [গ];

আর আদর্শ হিসাবে তেমন কিছুই করতে আমাদের আহ্বান করা হচ্ছে যেন আমরাও প্রচার করি, কর্ম সম্পাদন করি ও মৃত্যু পর্যন্ত সহ্য করি। তেমন কিছু পূরণ করার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা একান্ত প্রয়োজন।

আরও, 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক' বলায় আমরা নিজেদেরও মঙ্গল কামনা করি, যেহেতু ঈশ্বরের ইচ্ছায় অমঙ্গলকর কিছুই নেই, যদিও নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে এক একজন কোন না কোন শাস্তির পাত্র হয়। তাই এই উক্তি দ্বারা আমরা আগে থেকেই কষ্ট সহ্য করতে নিজেদের উদ্দীপিত করি। যখন প্রভু তাঁর আসন্ন যন্ত্রণাভোগের সময়ে তাঁর নিজের মাংসেও মাংসের দুর্বলতা দেখাতে ইচ্ছা করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, *পিতা, আমা থেকে এই পানপাত্র দূর করে দাও*, এবং একথা স্মরণ করে বলে চলেছিলেন, *তথাপি আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক* (ঘ)। তিনি নিজে ছিলেন ঈশ্বরের ইচ্ছা ও তাঁর প্রতাপ (ঙ), কিন্তু তবু দেয় সহনশীলতা দেখাবার খাতিরে তিনি পিতার ইচ্ছার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন।

৫। **চতুর্থ উক্তি** (মথি ৬:১০ ক; লুক ১১:২ খ)

'তোমার রাজ্য আসুক' উক্তিটাও সেদিকে লক্ষ্য করে যা 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক' উক্তিটা লক্ষ করছিল, তথা 'আমাদের মধ্যে'। কেননা কবেই বা সেই ঈশ্বর রাজত্ব করেন না, যাঁর হাতে রয়েছে সকল রাজার হৃদয়? (ক)। কিন্তু আমরা মঙ্গল যা কিছু আমাদের জন্য কামনা করি, তাঁকেই উদ্দেশ করে তা কামনা করি, ও তাঁর উপরে তা-ই আরোপ করি যা তাঁর কাছে থেকে প্রত্যাশা করি। তাই প্রভুর রাজ্যের অভিব্যক্তি যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা ও আমাদের প্রতীক্ষা লক্ষ করে, তখন এ কেমন হতে পারে যে কেউ না কেউ দীর্ঘায়ুর জন্য প্রার্থনা করে, যখন আমরা যে রাজ্যের আগমনের জন্য প্রার্থনা করি, সেই ঈশ্বরের রাজ্য যুগান্তের দিকে ধাবিত? আমাদের কামনা এ, আমাদের রাজ্য শীঘ্রই আসুক, আমাদের দাসত্বকাল প্রসারিত হোক তা নয়। আর যদিও সেই প্রার্থনাতে এমনটা আদিষ্ট না হত যে, আমরা রাজ্যের আগমনের জন্য প্রার্থনা করব, তবু আমাদের প্রত্যাশার সিদ্ধির দিকে দ্রুত পদে চলতে আগ্রহী এই আমাদেরই ইচ্ছাকৃত ভাবে সেই উক্তি ধ্বনিত করা আবশ্যক হত। বেদির তলায় স্থিত সাক্ষ্যমরদের প্রাণ প্রভুর কাছে

অসন্তোষে চিৎকার করে বলে, *প্রভু, আর কতকাল তুমি পৃথিবীর অধিবাসীদের আমাদের রক্তের প্রতিফল দেবে না?* (খ)। কেননা অবশ্যই সেই প্রতিফল যুগান্ত দ্বারা নির্ধারিত। তাই আমরা যার খাতিরে কষ্টভোগ করছি, এমনকি যার খাতিরে প্রার্থনা করছি, যা খ্রিষ্টিয়ানদের আকাঙ্ক্ষা, বিধর্মীদের লজ্জা, দূতদের উল্লাস, হে প্রভু, তোমার সেই রাজ্য যত শীঘ্রই আসুক।

৬। **পঞ্চম উক্তি** (মথি ৬:১১; লুক ১১:৩)

আহা, ঐশপ্রজ্ঞা কতই না সুন্দরভাবে প্রার্থনাটার অনুক্রম বিন্যাস করেছে, যার জন্য স্বর্গীয় বিষয়ের পরে, অর্থাৎ ঈশ্বরের নামের পরে, ঈশ্বরের ইচ্ছার পরে ও ঈশ্বরের রাজ্যের পরে প্রার্থনাটা পার্থিব বিষয়ের জন্যও যাচনায় স্থান দেয়। কেননা প্রভু এই বিধি জারি করলেন, *প্রথমে রাজ্যের অন্বেষণ কর, তাহলে ওই সবকিছুও তোমাদের দেওয়া হবে* (ক), যদিও **আমাদের দৈনিক রুটি আজ আমাদের দাও** (খ) উক্তিটা আমাদের পক্ষে আধ্যাত্মিক ভাবেই বরং বোঝা উচিত, কেননা খ্রিষ্টই আমাদের রুটি, কেননা খ্রিষ্টই আমাদের জীবন, ও রুটি হলো জীবন। তিনি বলেন, *আমিই সেই জীবন-রুটি* (গ), এবং একটু উপরে বলেন, *রুটি হলো জীবনময় সেই ঈশ্বরের বাণী যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন* (ঘ); তারপর আমরাও এও পাই যে তাঁর দেহ রুটি বলে পরিগণিত: *এ আমার দেহ* (ঙ)। তাই 'দৈনিক রুটি' যাচনা করায় আমরা খ্রিষ্টে চিরস্থায়িত্ব ও তাঁর দেহ থেকে অবিচ্ছিন্নতা প্রার্থনা করি। কিন্তু যেহেতু এই উক্তি মাংসময় ভাবেও গ্রহণযোগ্য, সেজন্য সেই আধ্যাত্মিক নিয়মের জোরে উক্তিটা নিজের ধর্মীয় দিক দিয়ে ছাড়া মাংসময় ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়; কেননা প্রভু আজ্ঞা করেন যেন সেই রুটির জন্য প্রার্থনা করা হয় যে রুটি হলো বিশ্বস্তদের জন্য অনন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, যেহেতু *বিজাতীয়রাই বাকি সবকিছুর অন্বেষণ করে* (চ)। সমরূপ শিক্ষা তিনি উদাহরণ যোগে নির্দেশ করেন ও উপমা-কাহিনীতে বারে বারে সেবিষয়ে কথা বলেন, বস্তুত তিনি বলেন, *কোন পিতা কি ছেলেদের কাছ থেকে রুটি তুলে নিয়ে তা কুকুরদের দেবেন?* (ছ)। আরও, *কোন পিতা কি নিজের ছেলে রুটি চাইলে তাকে একটা পাথর দেবেন?* (জ)। কেননা এভাবে তিনি

দেখান, পিতা থেকে ছেলেরা কী প্রত্যাশা করে। কিন্তু রাত্রিকালে যে দরজায় ঘা দিচ্ছিল, সেও রুটি প্রার্থনা করছিল (ঝ)।

তাছাড়া তিনি যুক্তিসঙ্গত ভাবেই 'আজ দাও' উক্তি যোগ করলেন, যেহেতু তিনি আগে বলেছিলেন, *তোমরা যে কী খাবে, আগামীকালের জন্য সেবিষয়ে চিন্তিত হয়ো না* (ঞ)। একই প্রসঙ্গে তিনি সেই মানুষের উপমা-কাহিনীও উপযোগী করেছিলেন, সেই যে মানুষ আসন্ন ফলাদির জন্য গোলাঘর আরও বড় করবে ও নিরাপত্তার কাল প্রসারিত করবে বলে ভেবেছিল, কিন্তু সে সেই রাতেই মারা গেছিল (ট)।

৭। **ষষ্ঠ উক্তি** (মথি ৬:১২; লুক ১১:৪ ক)

ঈশ্বরের উদারতার কথা লক্ষ করার পর এটা সমীচীন ছিল যে, আমরা সেইভাবে তাঁর দয়ার কথাও তুলে ধরতাম। খাদ্য-সামগ্রী আমাদের কী কাজে আসবে যদি তাঁর চোখে আমরা সত্যিই বলিদানের জন্য নিরূপিত একটা ষাঁড় বলে পরিগণিত? (ক)। প্রভু তো জানতেন, কেবল তিনিই সেই একমাত্র নিরপরাধীজন; সেইজন্য তিনি এমনটা শিখিয়ে দেন যাতে আমরা '**আমাদের ঋণ ক্ষমা কর**'(খ) বলে প্রার্থনা করি। ক্ষমা প্রার্থনা হলো 'এক্সোমলোগেসিস'(গ) [তথা প্রকাশ্য দোষ স্বীকার], কেননা যে কেউ ক্ষমা প্রার্থনা করে সে নিজের দোষ স্বীকার করে। তেমনি ভাবে, অনুতাপও সেই ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে প্রদর্শিত যিনি পাপীর মৃত্যুর চেয়ে সেই অনুতাপকেই বেশি ইচ্ছা করেন। তাছাড়া, শাস্ত্রে ঋণ দোষের প্রতীক স্বরূপ, কেননা ঋণটা সমানভাবে বিচারের সঙ্গে সম্পর্কিত ও সেই বিচার দ্বারা দাবীকৃত; ঋণটা দাবির ন্যায্যতাও এড়ায় না, যদি না দাবিটা মাপ করা হয় ঠিক সেইভাবে যেভাবে সেই প্রভু উপমার সেই কর্মচারীর কাছে তার ঋণ ক্ষমা করেছিলেন (ঘ), কেননা গোটা উপমার তুলনাটা ঠিক তাই লক্ষ করছিল। বস্তুত সেই একই কর্মচারী প্রভুর দ্বারা মুক্ত হবার পর তার প্রতি যে ঋণী তাকে একইভাবে রেহাই দেয় না, এবং সেই ব্যাপারে প্রভুর সাক্ষাতে নিন্দিত হয়ে শেষ কড়ি পর্যন্ত শোধ করার জন্য, অর্থাৎ, প্রতিটি দোষ যতই ক্ষুদ্র হোক, তা শোধ না করা পর্যন্ত সেই কর্মচারী নির্যাতনকারীদের হাতে সমর্পিত হয়, হ্যাঁ, এই উপমা সেই উক্তির একই অর্থ বহন করে যা অনুসারে আমরাও স্বীকার করি, আমাদের প্রতি ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করব। বস্তুত

এই প্রার্থনার বিশেষত্ব অনুসারে তিনি বলেন, *ক্ষমা কর, তবে তোমাদেরও ক্ষমা করা হবে* (ঙ)। আর যখন পিতর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভাইকে সাতবার পর্যন্ত ক্ষমা মঞ্জুর করা উচিত কিনা, তখন তিনি বলেন, *না, কিন্তু সত্তরগুণ সাতবার পর্যন্ত* (চ), যাতে করে তিনি বিধানকে শ্রেয়তর ভাবে পুনর্গঠন করতে পারেন, কেননা আদিপুস্তকে প্রতিশোধ কাইনের বেলায় সাতবার, কিন্তু লামেখের বেলায় 'সত্তরগুণ সাতবার' বলে নির্ধারিত হয়েছিল (ছ)।

৮। **সপ্তম উক্তি** (মথি ৬:১৩; লুক ১১:৪ খ)

আমরা যেন সমস্ত দোষ ক্ষেত্রে শুধু ক্ষমা পাবার বিষয়ে নয়, কিন্তু এড়াবারও বিষয়ে অনুনয় করি, সেজন্য তেমন সংক্ষিপ্ত প্রার্থনার সম্পূর্ণতার খাতিরে তিনি এ উক্তি যোগ করলেন, '**আমাদের প্রলোভনে চালিত ক'রো না**', অর্থাৎ এমনটা দিয়ো না, আমরা প্রলোভনে চালিত হই, অবশ্যই তারই দ্বারা যেন চালিত না হই যে প্রলোভন দেখায়; কিন্তু দূরের কথাই এমনটা মনে হবে যে, প্রভু প্রলোভন দেখান, ঠিক যেন তিনি কারও বিশ্বাস সম্পর্কে অজ্ঞ, না হয় সেই বিশ্বাস উল্টিয়ে দিতে ব্যস্ত। দুর্বলতা ও শঠতা দিয়াবলেরই। কেননা ঈশ্বর আব্রাহামকেও নিজের ছেলেকে বলি দিতে আজ্ঞা করেছিলেন, প্রলোভনের খাতিরে নয়, বরং তাঁর বিশ্বাস সত্য বলে প্রমাণিত করার জন্য, যাতে তিনি তাঁর দ্বারা তাঁর সেই আদেশেরই জন্য একটা উদাহরণ দিতে পারেন, যে আদেশ তিনি বারে বারে আজ্ঞা করার কথা, তথা মানুষ যেন ঈশ্বরের প্রতি আসক্তির চেয়ে অন্য কোন আসক্তিতে আবদ্ধ হতে অঙ্গীকার না করে (ক)। তিনি নিজে দিয়াবল দ্বারা প্রলোভনে পরীক্ষিত হয়ে দেখালেন, প্রলোভন ক্ষেত্রে কে মাতোব্বারি করে ও সেটাকে জাগায়। এই পদ তিনি পরবর্তী পদ দ্বারা সত্য বলে প্রমাণিত করেন; তিনি বলেন, *প্রার্থনা কর যেন প্রলোভনে পরীক্ষিত না হও* (খ); অথচ প্রভুকে একা ফেলে রাখায় তাঁরা প্রলোভনে পরীক্ষিত হয়েছিলেন, কেননা প্রার্থনার চেয়ে তাঁরা নিদ্রায়ই বেশি সময় দিয়েছিলেন। অতএব, শেষ উক্তি 'আমাদের প্রলোভনে চালিত ক'রো না' উক্তির সঙ্গে সংগতি রাখে ও সেটার অর্থ ব্যাখ্যা করে, কারণ সেই অর্থ হলো, '**কিন্তু সেই ধূর্তজন থেকে আমাদের দূরে নিয়ে যাও।**'

৯। প্রার্থনাটার সারকথা

তত অল্প কথার সারসংক্ষেপে নবীদের, সুসমাচারের ও প্রেরিতদূতদের কতগুলো বাণী, প্রভুর কতগুলো উপদেশ, উদাহরণ ও উপমা উদ্ধৃত, কতগুলো কর্মও একই সাথে সম্পন্ন: 'পিতাতে' ঈশ্বরকে সম্মান, 'নামে' বিশ্বাস-স্বীকৃতি, 'ইচ্ছায়' বাধ্যতা অর্পণ, 'রাজ্যে' প্রত্যাশার স্মৃতি, 'রুটিতে' জীবনকে যাচনা, ঋণের 'ক্ষমা' প্রার্থনায় সমস্ত ঋণের স্বীকৃতি, রক্ষা যাচনায় প্রলোভনের বিষয়ে উদ্বেগ। এতে বিস্ময়কর কী আছে? কেবল ঈশ্বরই শেখাতে পারছিলেন তিনি কী ভাবে ইচ্ছা করছিলেন তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হবে। অতএব তাঁর দ্বারা স্থিরীকৃত ও চালিত প্রার্থনার ভক্তিময় রীতি যখন ঐশমুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছিল, সেসময়েও, পুত্র যা শিখিয়েছিলেন তা পিতার কাছে সুপারিশ স্বরূপ তাঁর আপন আত্মা দ্বারা স্বশক্তিতে স্বর্গে আরোহণ করে।

১০। প্রভুর প্রার্থনা ও আমাদের শুভকামনা

তথাপি, মানব প্রয়োজন যিনি আগে থেকেও দেখেন, যেহেতু সেই প্রভু প্রার্থনার মানদণ্ড সম্প্রদান করার পর *যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হবে* (ক) বলেছিলেন, আর যেহেতু এমন কতগুলো যাচনা রয়েছে যা এক একজনের অবস্থা-পরিস্থিতি অনুযায়ী, সেজন্য কেমন যেন ভিত্তি স্বরূপ হয়ে সেই বৈধ ও রীতিসম্মত [প্রভুর] প্রার্থনাই সর্বপ্রথমে উচ্চারণ করার পর আমাদের অতিরিক্ত কামনা, প্রভুর আজ্ঞাবলি স্মরণে রেখে, যাচনা সংক্রান্ত বাহ্যিক একটা কাঠামো গেঁথে তোলার অধিকার রাখে (খ)।

১১। পিতার কাছে প্রার্থনাকালে যা যা বর্জনীয়, সেসম্পর্কে

আমরা প্রভুর আজ্ঞাবলি থেকে যত দূরে আছি সেই অনুসারে যেন তাঁর কান থেকে তত দূরে না থাকি, সেজন্য তাঁর আজ্ঞাবলির স্মৃতি আমাদের প্রার্থনার জন্য স্বর্গ অভিমুখে একটা পথ প্রস্তুত করে। তেমন আজ্ঞাগুলোর প্রধান আজ্ঞা হলো, যেকোন অমিল বা অপরাধ আমাদের ভাইদের সঙ্গে বানিয়েছি, তা মিটিয়ে না দেওয়ার আগে যেন প্রভুর বেদির কাছে আরোহণ না করি (ক)। কেননা বিনা শান্তিতে ঈশ্বরের শান্তির কাছে এগিয়ে যাওয়া কেমন ব্যাপার? ঋণ ক্ষমা না করে ঋণক্ষমার কাছে যাওয়াও কেমন ব্যাপার?

যখন আদি থেকেই সমস্ত ক্রোধ আমাদের কাছে নিষিদ্ধ, তখন ভাইয়ের প্রতি যে ক্রুদ্ধ, সে কেমন করে পিতাকে প্রশমিত করবে? সেই যোসেফ যখন পিতাকে আনাবার সঙ্কল্পে নিজের ভাইদের বিদায় দিয়েছিলেন, তখন তিনিও বলেছিলেন, *পথে ক্রুদ্ধ হয়ো না* (খ), অর্থাৎ তিনি আমাদেরই সতর্ক করেছিলেন, কেননা অন্যত্র আমাদের শিক্ষা-প্রণালী 'পথ' বলে অভিহিত (গ); তাই যখন প্রার্থনার পথে পদার্পণ করি তখন যেন অন্তরে ক্রোধ রেখে পিতার কাছে না যাই। তারপর প্রভু বিধান প্রসারিত করতে গিয়ে স্পষ্টভাবেই ক্রোধ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞাটা নরহত্যা সংক্রান্ত আজ্ঞার পর পরে যুক্ত করেন (ঘ)। একটামাত্র খারাপ কথা দ্বারাও তিনি ক্রোধ ব্যক্ত করার অনুমতি দেন না। আর যদি ক্রুদ্ধ হতেই হয়, তবে, প্রেরিতদূতের সাবধানবাণী অনুসারে, যেন সূর্যাস্তের পরে ক্রোধ রাখা না হয় (ঙ)। কিন্তু ভাইয়ের সঙ্গে সন্তোষজনক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন অস্বীকার করতে করতে প্রার্থনা ছাড়া একদিন কাটানো, না হয় ক্রোধে নিষ্ঠাবান থেকে প্রার্থনাটা হারানো, এ কেমন দুঃসাহসী ব্যাপার?

১২। প্রার্থনাকালে মনের অবস্থা সম্পর্কে

কেবল ক্রোধ থেকে নয়, কিন্তু মনের যেকোন বিরক্তিকর অবস্থা থেকেই সেই প্রার্থনার মনোভাব মুক্ত হওয়া চাই, সেই যে প্রার্থনা এমন মানবাত্মা থেকে উচ্চারিত, যে মানবাত্মা সেই পবিত্র আত্মারই অনুরূপ যাঁর কাছে প্রার্থনাটা প্রেরিত। কেননা দূষিত কোন আত্মা পবিত্র আত্মার কাছে স্বীকৃতি পেতে পারে না (ক), যেইভাবে বিষণ্ন কোন আত্মাও আনন্দময় কোন আত্মা দ্বারা, বাঁধা কোন আত্মাও মুক্ত কোন আত্মা দ্বারা স্বীকৃতি পেতে পারে না। কেউই নিজের বিরোধীকে নিজের ঘরে স্থান দেয় না, কেউই নিজের সঙ্গীকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রবেশাধিকার দেয় না।

১৩। হাত ধোয়া সম্পর্কে

ধৌত হাতে কিন্তু নোংড়া আত্মায় প্রার্থনায় যোগ দেওয়া কেমন যুক্তি, যখন আমাদের হাতের পক্ষে আধ্যাত্মিক শুচিতা আবশ্যকীয় যাতে সেই হাত মিথ্যা, নরহত্যা, নিষ্ঠুরতা, বিষপ্রয়োগ, প্রতিমাপূজা থেকে ও সেই অন্য যত কালিমা থেকে শুচি অবস্থায় (ক)

উত্তোলিত হতে পারে যা আত্মায় জন্ম নিয়ে সেই হাত দ্বারাই সাধিত? এগুলোই প্রকৃত শুচিতা, সেগুলো নয় যেগুলো বিষয়ে বেশির ভাগ মানুষ কুসংস্কারের জোরে সতর্ক, তথা প্রতিটি প্রার্থনার আগে হাত-পা ধোয়া যদিও সবেমাত্র সর্বাঙ্গীন স্নান করা হয়ে থাকে। যখন আমি বিচক্ষণতা সহকারে তেমন রীতি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুসন্ধান করছিলাম ও সেটার যুক্তির বিষয়ে খোঁজ করছিলাম, তখন এতে নিশ্চিত হলাম যে, সেই রীতি পিলাতের সেই আচরণ স্মরণ করায় যখন তিনি হাত ধুয়ে প্রভুকে সমর্পণ করেছিলেন (খ)। আমরা কিন্তু প্রভুর কাছে প্রার্থনাই করি, তাঁকে সমর্পণ করি না; না, তাঁকে সমর্পণ করেছিলেন যিনি, আমরা বরং তাঁর সেই আচরণের বিপরীতে দাঁড়িয়ে সেক্ষেত্রে আদৌ হাত ধুই না। অবশ্যই, যদি মানব যোগাযোগের ফলে আমাদের হাত এমন ভাবে দূষিত হয়ে থাকে যার জন্য তা ধোয়া বিবেকের ব্যাপার, তবে সেই পরিস্থিতি বাদে আমাদের সেই হাত যথেষ্ট পরিষ্কার যা আমাদের গোটা দেহ সহ একবার চিরকালের মত খ্রিষ্টে ধৌত করেছি।

১৪। এব্যাপারে ইহুদীদের আচরণ

যদিও ইস্রায়েল প্রত্যহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধুয়ে থাকে, তবু সে কখনও শুচি নয়। কমপক্ষে তার হাত দু'টো অনুক্ষণ অশুচি, নবীদের ও স্বয়ং প্রভুর রক্তে রঞ্জিত; আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে ওরা বংশগত সূত্রে নিজেদের পিতাদের অপরাধে অপরাধী হওয়ায় প্রভুর কাছে সেই হাত দু'টো উত্তোলন করতেও সাহস পায় না (ক), এই ভয়ে যে, কোন না কোন ইশাইয়া চিৎকার করবেন (খ) বা খ্রিষ্ট একেবারে কেঁপে উঠবেন। তথাপি আমরা হাত উত্তোলন করি তা শুধু নয়, প্রসারিতও করি, ও প্রভুর যন্ত্রণাভোগ অনুকরণ করে প্রার্থনাকালেও খ্রিষ্টকে স্বীকার করি (গ)।

১৫। আলোয়ান খোলা সম্পর্কে

কিন্তু, যেহেতু আমরা অসার নিয়মপালন সংক্রান্ত বিশেষ একটা দিক চিহ্নিত করেছি, সেজন্য এমনটা বিরক্তিকর হবে না যে, সেইমত সেই অন্যান্য বিষয়ও চিহ্নিত করব যেগুলো বিষয়েও অসারতা প্রমাণিত হতে পারে; অর্থাৎ, সেই বিষয়গুলো হয়

প্রভুর, না হয় প্রেরিতদূতদের কোন আদেশের অধিকারসূত্রেই পালিত কিনা। কেননা তেমন বিষয়গুলো ধর্ম সংক্রান্ত নয়, কুসংস্কারই সংক্রান্ত; সেগুলো নকল, বাধ্যবাধকতাজনিত ও যুক্তিক্ষমতা-বিশিষ্ট ধর্মানুষ্ঠানের চেয়ে অদ্ভুত অনুষ্ঠানই সংক্রান্ত; এবং সেগুলোকে এজন্যও সংযমের অধীন করা দরকার যে, সেগুলো আমাদের বিজাতীয়দের একই পর্যায়ে রাখে। যেমন, সেই রীতি যা অনুসারে কেউ না কেউ আলোয়ান খুলেই প্রার্থনা করে; বস্তুত জাতিগুলোই তাদের প্রতিমার সামনে তেমনটা করে। আর যদি তেমনটা করা দরকার হত, তবে প্রার্থনার জন্য উপযুক্ত পোশাক সম্পর্কে শিক্ষাদান করেন যাঁরা, সেই প্রেরিতদূতেরা অবশ্যই সেই কথা উল্লেখ করতেন, যদি না এমন একজন রয়েছে যে মনে করে, পল প্রার্থনার জোরেই আলোয়ানটা কার্পোসের কাছে রেখে গেছিলেন (ক)। বাবিলন-রাজার অগ্নিচুল্লিতে পায়জামা ও পাগড়ি পরা অবস্থায় (খ) সেই তিন সাধুর প্রার্থনাকে স্পষ্ট ভাবে শুনেছিলেন যিনি, সেই ঈশ্বর আলোয়ান-পরা প্রার্থীদের শোনেন না বৈকি।

১৬। প্রার্থনার পরে বসা

আরও, প্রার্থনা যথাযথভাবে শেষ হবার পর, কেউ না কেউ যে রীতিমত বসে, সেসম্পর্কে আমি কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না, কেবল সেটাই পাচ্ছি যেটা বাচ্চাদেরই উপযোগী। তবে কীবা হত, যাঁর লেখা সাধারণত 'পালক' বলে পরিচিত, যদি সেই হের্মাস (ক) প্রার্থনা ক'রে খাটের উপরে না বসে অন্য কিছু করতেন (খ); তবে আমরা কি এ মেনে নেব যে, সেই বসাটাও অবশ্যপালনীয় রীতি? অবশ্যই না। কেননা সেটা সাধারণ একটা বর্ণনা; তাই যখন লেখাটা বলে, 'আমি [হের্মাস] প্রার্থনা ক'রে আমার খাটের উপরে বসেছিলাম'(গ), তখন সেটা বর্ণনা-শৈলী সংক্রান্ত ব্যাপার, সেটা নিয়মপালন সংক্রান্ত নমুনা নয়। নইলে এমনটা হত যে, কোথাও প্রার্থনা করব না, সেইখানে মাত্র করব যেখানে একটা খাট রয়েছে। এমনকি, যে কেউ চেয়ারে বা চৌকিতে বসত, সে সেই লেখার বিপরীতে কাজ করত। আরও, যেহেতু নিজেদের পুতুলদের পূজা করার পর বিজাতীয়রা আসন নিয়ে তেমনটা করে থাকে, সেজন্য এক্ষেত্রেও সেই রীতি আমাদের মধ্যে নিন্দার বিষয় হবার যোগ্য, কারণ তা প্রতিমাপূজাতে পালিত। এব্যাপারে

অশ্রদ্ধা-অভিযোগও যুক্ত রয়েছে; এটা এমন বিষয় যে, বিজাতীয়দের যদি বোধ থাকত তবে ওরা নিজেরাও তা বুঝতে পারত। এক দিকে, যাঁকে তুমি সকলের চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা ও মান্য কর, যখন তাঁর চোখের সামনে বা একেবারে চোখে চোখে বসা অশ্রদ্ধার ব্যাপার বলে গণ্য, তখন, অন্য দিকে, মহত্তর কারণে প্রার্থনার দূত দাঁড়িয়ে থাকতেই (ঘ) জীবনময় ঈশ্বরের চোখের সামনে বসে থাকা কি সবচেয়ে ধর্মবিরুদ্ধ কাজ বলে গণ্য হবে না? অবশ্যই, যদি না এমনটা হয় যে, আমরা আসলে ঈশ্বরকে বোঝাতে চাই যে, প্রার্থনাটা আমাদের পরিশ্রান্ত করে ফেলেছে।

১৭। উত্তোলিত হাত

কিন্তু, ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনাকে তখনই আমরা আরও বেশি গ্রহণীয় করি, যখন বিনয় ও বিনম্রতা সহ, হাত দু'টো বেশি উত্তোলিত না রেখে বরং সঙ্গত ও সমুচিত ভাবে উত্তোলিত রেখে, ও আমাদের মুখমণ্ডলও দুঃসাহসের সঙ্গে খাড়া না রেখে প্রার্থনা করি। কেননা সেই যে কর-আদায়কারী মিনতি নিবেদনে শুধু নয়, মুখমণ্ডলেও বিনম্র ও হতাশ হয়ে প্রার্থনা করেছিল, নির্লজ্জ ফরিশীর চেয়ে সে-ই ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে বিদায় নিয়েছিল (ক)।

তেমনি ভাবে আমাদের কণ্ঠের স্বরও নমিত হওয়া চাই; অন্যথা, যদি আওয়াজের জোরেই আমাদের কথা শোনা হয়, তবে আমাদের কেমন বড় কণ্ঠনালিই বা দরকার হবে? কিন্তু ঈশ্বর কণ্ঠের নয়, হৃদয়েরই শ্রোতা (খ), যেইভাবে তিনি সেই হৃদয়ও পরীক্ষা করেন। 'পিথিয়া' দৈববক্তার অপদূত বলে (গ), 'আমি বোবাকে বুঝি ও বাক্‌শক্তিবিহীনকে স্পষ্টই শুনতে পাই।'(ঘ) ঈশ্বরের কান শব্দের অপেক্ষায় রয়েছে কি? তবে কেমন করে যোনার মিনতি অতিকায় মাছের পেটের গভীরতা থেকে, সেই বিরাট পশুর অন্ত্ররাজির মধ্য থেকে স্বর্গ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পারল? (ঙ)। জোর গলায় প্রার্থনা করে যারা, প্রতিবেশীকে বিরক্ত করা বাদে তারা কোন্ মহত্তর সুবিধা পাবে? এমনকি, নিজেদের যাচনা এভাবে প্রকাশ্য করায়, সবার মাঝে প্রার্থনা করার চেয়ে ওরা এমনটা কীবা কম করছে?

১৮। শান্তি চুম্বন

ইতিমধ্যে অন্য একটা রীতি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। উপবাস পালন করছে যারা তারা ভাইদের সঙ্গে প্রার্থনা করার পর, যা প্রার্থনার সীল স্বরূপ, সেই শান্তি-চুম্বন দেওয়া থেকে বিরত থাকে। কিন্তু, উপবাসকারীর প্রার্থনা যখন মহত্তর গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে আরোহণ করে, সেসময়ের চেয়ে কোন্ সময়েই বা ভাইদের সঙ্গে শান্তি-বিনিময় যোগ্যতর ভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে, যাতে করে তারা নিজেরাও আমাদের ধর্মক্রিয়ায় সহভাগিতা করতে পারে ও তার ফলে নিজ নিজ ভাইদের সঙ্গে নিজের শান্তি বিনিময় করায় প্রশমিত হতে পারে? কোন্ প্রার্থনা সিদ্ধ যদি সেই প্রার্থনা পবিত্র চুম্বন থেকে বিযুক্ত? (ক)। প্রভুর সেবাকর্ম যারা সম্পাদন করে থাকে, তাদের মধ্যে এমন কাকেই বা শান্তি বাধাগ্রস্ত করে? যে যজ্ঞ থেকে মানুষ শান্তি ছাড়া বিদায় নেয়, সেটা কোন্ ধরনের যজ্ঞ? আমাদের প্রার্থনা যাই হোক না কেন (খ), তা সেই আদেশ-পালনের চেয়ে শ্রেয়তর হবে না, সেই যে আদেশ অনুসারে আমাদের উপবাস গোপন রাখতে আমাদের নির্দেশ করা হয় (গ), কেননা চুম্বন থেকে বিরত থাকায় এটাই দাঁড়ায় যে, আমরা উপবাস পালন করছি। কিন্তু যদিও এব্যাপারে কোন যুক্তি থাকত, তবু তুমি যেন এই আদেশ ক্ষেত্রে অপরাধী না হও, সেজন্য তুমি হয় তো তোমার সেই শান্তি-চুম্বন পরে, নিজের ঘরেও, দিতে পার যেখানে তোমার উপবাস সম্পূর্ণ রূপে গোপন রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু যেখানে তুমি তোমার উপবাস-পালন গোপন রাখতে পার, সেই স্থান যেইখানে হোক না কেন, সেখানে তোমার উচিত আদেশটা স্মরণ করা; এভাবেই তুমি ধর্মবিধিটা বাইরে ও প্রথামত নিজের ঘরেও পূরণ করতে পারবে। আর ঠিক এইভাবে সেই পাস্কাদিবসত্রয়ে যখন ধর্মীয় উপবাস-পালন সার্বিক ও কেমন যেন প্রকাশ্য, তখনও, সকলের সঙ্গে মিলে যাই করি না কেন, তা গোপন রাখার বিষয়ে কিছুই মনে না ক'রে আমরা সেই চুম্বন-বিনিময় করে থাকি।

১৯। 'প্রহরা' সম্পর্কে

একই প্রকারে, 'প্রহরার'(ক) দিনগুলো সম্পর্কে অধিকাংশ লোক মনে করে, সেই যজ্ঞীয় প্রার্থনায় (খ) উপস্থিত থাকা তাদের উচিত নয়, কারণ 'প্রহরা'টা প্রভুর দেহ গ্রহণ

করার পরে সমাপন করা উচিত (গ)। তবে, এউখারিস্তিয়া কি ঈশ্বরের উদ্দেশে অর্পিত সেবাকর্ম বাতিল করে, নাকি সেই সেবাকর্মকে আরও শক্ত বন্ধনে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত করে? বরং তুমি ঈশ্বরের বেদির ধারে দাঁড়ালে (ঘ) তোমার 'প্রহরা' কি আরও বেশি গম্ভীর হবে না? প্রভুর দেহ গৃহীত ও সংরক্ষিত (ঙ) হলে উভয় দিকটাই তথা যজ্ঞে অংশগ্রহণ ও বিধি পূরণ দু'টোই পালিত। যখন 'প্রহরা' সামরিক আদর্শ থেকে নিজের নাম পেয়ে থাকে (কেননা আমরা ঈশ্বরের সৈন্য বৈকি), তখন সেনানিবাসে কোনও আনন্দগান ও কোনও শোকের গানও সৈন্যের 'প্রহরা' বাতিল করে না, কেননা আনন্দ আরও বেশি স্বচ্ছন্দে, শোক আরও বেশি সাবধানে শৃঙ্খলাকে পালন করাবে।

২০। নারী-পোশাক সম্পর্কে

তথাপি, নারী-পোশাক সম্পর্কে বিধিপালনের বিভিন্নতা বিষয়টা, সামান্যতম মানুষ এই আমাদের, এমনভাবে আলোচনা করতে বাধ্য করে যাতে আমরা, হয় তো নির্লজ্জভাবে, পবিত্রতম প্রেরিতদূতের পরেই (ক) বিষয়টা আলোচনা করি; কিন্তু তবু এটাই নির্লজ্জার ব্যাপার হবে না, যদি প্রেরিতদূত অনুসারেই আলোচনাটা চালাই। পোশাক ও অলঙ্কার সংক্রান্ত শালীনতার কথা বলতে গিয়ে পিতরেরও বিধিনিয়ম (খ) স্পষ্ট, কেননা তিনি পলের মত একই আত্মার অধিকারী হওয়ায় একই ভাষা প্রয়োগ ক'রে কাপড়ের গৌরব, সোনার গর্ব ও চুলের বেশ্যাসুলভ কায়দা নিষেধ করেন।

২১। কুমারীদের সম্পর্কে

কিন্তু, যে বিষয় সমস্ত মণ্ডলীগুলোতে এলোমেলো ভাবে পালিত, অর্থাৎ কুমারীদের মাথা ঢেকে রাখা উচিত কিনা, সেবিষয় অবশ্যই আলোচনাযোগ্য। কেননা যারা কুমারীদের মাথা সংক্রান্ত নিয়ম থেকে মুক্ত করে, এমনটা মনে হচ্ছে তারা এবিষয়ের উপর নির্ভর করে যে, প্রেরিতদূত এক্ষেত্রে 'কুমারী' শব্দটা উল্লেখ না ক'রে বরং স্ত্রীলোকদেরই বিষয়ে নির্ধারণ করেছিলেন তারা মাথা ঢেকে রাখবে (ক); তিনি সাধারণ ভাবে লিঙ্গ লক্ষ করছিলেন না নইলে তিনি বলতেন 'নারী', তিনি বরং 'স্ত্রীলোক' বলায় [অর্থাৎ পরিণত মহিলা] সেই লিঙ্গের শ্রেণিই লক্ষ করছিলেন; কেননা তিনি যদি

‘স্ত্রীলোক’ বলায় লিঙ্গকেই চিহ্নিত করতেন, তবে তিনি নিজের নিষেধাজ্ঞা সকল নারীদের জন্য নির্বিশেষেই কার্যকর করতেন; কিন্তু লিঙ্গের একটা শ্রেণিই উল্লেখ করার ব্যাপারে নীরব থাকায় তিনি অপর শ্রেণিটা আলাদা রাখেন। কেননা উপরোল্লিখিত সেই লোকেরা নাকি বলে, তিনি কুমারীদের কথাও বিশেষ উল্লেখে উল্লেখ করতে পারতেন, অথবা এমনিই ‘নারী’ সমষ্টিগত অর্থবাহক শব্দ ব্যবহার করতে পারতেন।

২২। উপরোল্লিখিত বিষয় সংক্রান্ত সমাধান

যারা তেমন বিষয়ে সম্মতি দেয়, তাদের শব্দটার প্রকৃতি সম্পর্কে ভাবা উচিত পবিত্র শাস্ত্রের প্রথম লেখাগুলোতে ‘স্ত্রীলোক’ এর অর্থ কি। তাতে তারা দেখতে পায় শব্দটা হলো লিঙ্গের নাম, লিঙ্গের কোন একটা শ্রেণি নয়; অর্থাৎ, যখন হবা তখনও কোন পুরুষকে জানেননি, তখন ঈশ্বর তাঁকে স্ত্রীলোক ও নারী (ক) বলে চিহ্নিত করেছিলেন কিনা: লিঙ্গের সাধারণ অর্থ অনুযায়ী ‘নারী’, লিঙ্গের শ্রেণি অনুযায়ী ‘স্ত্রীলোক’। সুতরাং, যে সময় সেই দু’জন তখনও বিবাহিত ছিলেন না, যেহেতু সেসময় হবাকে ‘স্ত্রীলোক’ শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল, সেজন্য সেই শব্দ কুমারী ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য সাধারণ শব্দ ছিল। এটাও বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে সেই প্রেরিতদূত যিনি অবশ্যই সেই একই আত্মা দ্বারা চালিত ছিলেন যাঁর দ্বারা সমস্ত পবিত্র শাস্ত্র যেমন, আদিপুস্তকও তেমন রচিত হয়েছিল, সেই প্রেরিতদূত ‘স্ত্রীলোক’(খ) লেখায় সেই একই শব্দ ব্যবহার করেছিলেন যা অবিবাহিতা হবার উদাহরণ দ্বারা একটি কুমারীর জন্য ব্যবহার্য।

বস্তুতপক্ষে অন্য যত পদও এক্ষেত্রে একমত। কেননা, অন্যত্র তথা যেখানে বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা করেন (গ) তিনি সেখানে যেইভাবে করেন, তিনি যে সেইভাবে হবাকে কুমারী বলে চিহ্নিত করেননি, এদ্বারাও তিনি যথেষ্ট দেখান যে, তাঁর সেই কথা সমস্ত স্ত্রীলোককে চিহ্নিত ক’রে ও গোটা লিঙ্গ চিহ্নিত ক’রে বলা হয়েছে; এও দেখান যে, তিনি তাঁকে আদৌ চিহ্নিত না করার ফলে কুমারী ও অন্য কারোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা যিনি অন্যত্র, তথা সেখানে যেখানে পার্থক্যটা দাবীকৃত, পার্থক্য রাখায় সচেতন হয়ে (তাছাড়া, তিনি এক একটা জাতকে নিজ নিজ উপযুক্ত নাম দ্বারা চিহ্নিত করায়ই তা করেন (ঘ)), তিনি এক একটাকে উল্লেখ না করায় যেখানে কোন পার্থক্য রাখেন না,

সেখানে ইচ্ছা করেন যেন কোন পার্থক্য রাখা না হয়। এবং এবিষয়ে আর কী না বলব, যখন তিনি যে ভাষায় পত্র লিখতেন, সেই গ্রীক ভাষায় 'নারী' এর বদলে 'স্ত্রীলোক', তথা θηλείας [থেলেইয়াস] এর বদলে γυναῖκας [গুনাইকাস] শব্দটাই সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত? অতএব, সেই শব্দ যার ব্যাখ্যা তা-ই চিহ্নিত করে যা 'নারী' চিহ্নিত করে, যখন সেই শব্দ লিঙ্গের নামের বদলে প্রায়ই ব্যবহৃত, তখন তিনি γυναῖκα [গুনাইকা] বলায় লিঙ্গকেই চিহ্নিত করেছেন; কিন্তু লিঙ্গে কুমারীও বিদ্যমান।

কিন্তু তাঁর উক্তি স্পষ্ট; তিনি বলেন, *যেকোন স্ত্রীলোক প্রার্থনাকালে কিংবা নবীয় বাণী দেওয়ার সময়ে মাথা ঢেকে রাখে না, সে তার নিজের মাথা অসম্মান করে* (ঙ)। সেই 'যেকোন স্ত্রীলোক' কী, যদি না যেকোন বয়সের, যেকোন শ্রেণির, যেকোন অবস্থার স্ত্রীলোক? 'যেকোন' বলায় তিনি নারীত্ব থেকে কিছুই বাদ দিচ্ছেন না, যেইভাবে মাথা ঢেকে না রাখার ব্যাপারে পুরুসত্ব থেকে কিছুই বাদ দিচ্ছেন না; কেননা তিনি এক্ষেত্রে এমনিই '*যেকোন পুরুষ*'(চ) বলেন। সুতরাং, যেমন পুরুষলিঙ্গ ক্ষেত্রে 'পুরুষ' উল্লেখে যুবকেরও পক্ষে মাথা ঢেকে রাখা নিষিদ্ধ, তেমনি নারী ক্ষেত্রে 'স্ত্রীলোক' উল্লেখে কুমারীও মাথা ঢেকে রাখতে বাধ্য। একই প্রকারে এক এক লিঙ্গে যুব বয়স বয়োজ্যেষ্ঠদের নিয়ম পালন করুক; অন্যথা, কুমারীরা নিজের প্রকৃত শব্দ অনুযায়ী উল্লিখিত না হওয়ায় তারা যদি মাথা ঢেকে না রাখে, তবে কুমারীরাও মাথা ঢেকে রাখুক। পুরুষ ও যুবক ভিন্ন হোক যদি স্ত্রীলোক ও কুমারীও ভিন্ন।

এমনকি তিনি বলেন যে, *স্বর্গদূতদের কারণেই* (ছ) স্ত্রীলোকদের মাথা ঢেকে রাখতে হবে, কারণ মানব-কন্যাদের কারণেই সেই দূতেরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল (জ)। তবে কেই বা এ সমর্থন করবে যে, কেবল স্ত্রীলোকেরাই, অর্থাৎ ইতিমধ্যে বিবাহিত হয়েছিল ও কুমারীত্ব হারিয়েছিল যারা, তারাই দূতদের কামুকতার পাত্র ছিল, যদি না কুমারী যারা তারা সৌন্দর্যে উৎকৃষ্ট হতে ও প্রেমিকদের পেতে অক্ষম ছিল? তা হয় না; তাই এসো, দেখি, দূতেরা যাদের প্রতি আসক্ত ছিল, তারা কেবল কুমারীই ছিল কিনা, কারণ শাস্ত্রে *মানব-কন্যারা* (ঝ) সেইভাবে বলে থাকে যেভাবে মানব-বধূ বা নারী নির্বিশেষেই বলতে পারত। তেমনি, যখন শাস্ত্রে বলে, *তাদের ওরা নিজেদের বধূ বলে নিল* (ঞ), তখন শাস্ত্র এভিত্তিতেই তাই করে বলে যে, অবশ্যই তারাই বধূ বলে চিহ্নিত

যারা বধূ নাম-বিহীন। কিন্তু যারা বধূ নাম-বিহীন ছিল না, তাদের সম্পর্কে শাস্ত্র অন্যভাবে কথা বলত; সুতরাং, যারা চিহ্নিত তারা যেমন বিধবত্বও-বিহীন তেমনি কুমারীত্বও বিহীন। তাই, লিঙ্গ সাধারণ ভাবেই চিহ্নিত করায় পল 'কন্যাদের' ও জাতকে একজাতিতে মিলিত করলেন। আরও, যখন তিনি বলেন যে, যে প্রকৃতি স্ত্রীলোকদের জন্য চুল আবরণ ও অলঙ্কার বলে নির্দিষ্ট করেছে, সেই প্রকৃতি নিজেই (ট) যখন শেখায় যে মাথা ঢেকে রাখা স্ত্রীলোকদের কর্তব্য, তখন সেই একই আবরণ ও একই সম্মান কি কুমারীদের জন্যও নির্দিষ্ট হয়নি? যখন স্ত্রীলোকের পক্ষে মাথা মুণ্ডন করা লজ্জাকর ব্যাপার, তখন কুমারীর পক্ষেও ঠিক তাই। অতএব, যার পক্ষে মাথা সংক্রান্ত বিধি এক ও একই, তার কাছে মাথা সংক্রান্ত এক ও একই নিয়ম-পালনও দাবীকৃত, এবং তা এমন যা সেই কুমারীদের পক্ষেও প্রযোজ্য বাল্যকাল যাদের রক্ষা করে, কেননা আদি থেকে একটা কুমারী 'নারী' বলে চিহ্নিত হয়েছিল। এক কথায়, ইস্রায়েল পর্যন্তই এ রীতি পালন করে থাকে, কিন্তু ইস্রায়েল যদি পালন নাও করত, তবে প্রসারিত ও বর্ধিত আমাদের সেই বিধান নিজের জন্য তেমন সংযোগ সমর্থন করত; কুমারীদের পক্ষে মাথা ঢেকে রাখার বাধ্যবাধকতাও সমর্থন করত। আমাদের ব্যবস্থা ক্রমে, যে বয়স নিজের লিঙ্গের বিষয়ে অজ্ঞ, সেই বয়স সরলতার স্ব-অধিকার রক্ষা করুক। কেননা যখন আদম ও হবার জ্ঞান পাবার সেই সময় এসেছিল, তখন দু'জনে সাথে সাথে তা-ই ঢেকে রাখলেন যা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। যাই হোক, এ নিশ্চিত বিষয় যে, যাদের বাল্যকালে এখনও যৌবনকালের পরিবর্তন হয়নি, সেই সম্পর্কে তাদের বয়সের পক্ষে প্রকৃতির প্রতি যেমন, তেমনি শৃঙ্খলারও প্রতি নিজ কর্তব্য মনে রাখা উচিত, কেননা তারা তাদের অঙ্গ ক্ষেত্রে ও তাদের ভূমিকা ক্ষেত্রে, উভয় ক্ষেত্রেই 'স্ত্রীলোক' পর্যায় উন্নীত। এমন কেউ নেই যে বিবাহযোগ্যা হলে তখনও 'কুমারী', কেননা তার মধ্যে বয়সই ইতিমধ্যে তার আপন স্বামীর সঙ্গে তথা কালেরই সঙ্গে বিবাহ-আবদ্ধ হয়েছে।

কিন্তু কোন না কোন কুমারী ঈশ্বরের কাছে নিজেকে আজীবন নিবেদন করেছে। সে সেসময় থেকে নিজের চুলের কায়দা পাল্টায় ও নিজের পোশাক 'স্ত্রীলোক' উপযোগী পোশাকে বদলায়। ফলে সে তাতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ রাখুক ও কুমারী উপযোগী গোটা ভূমিকা পালন করুক; ঈশ্বরের খাতিরে সে যা গুপ্ত রাখে, সে তা

সম্পূর্ণরূপেই আবৃত রাখুক। ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের মধ্যে যা সাধন করে, তা কেবল ঈশ্বরেরই জ্ঞানের কাছে সঁপে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য, পাছে, ঈশ্বরের কাছ থেকে যে পুরস্কার প্রত্যাশা করি তা মানুষের কাছ থেকেই পাই। যা তুমি মানুষের সামনে আবৃত রাখ, তা কেন ঈশ্বরের সামনে অনাবৃত কর? তুমি কি গির্জায় এর চেয়ে প্রকাশ্যেই বেশি শালীন হবে? যখন তোমার আত্মনিবেদন ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও তা তুমি গ্রহণ করেছ, তখন, প্রেরিতদূত বলেন, কেন এমন দম্ভ কর ঠিক যেন তা পাওনি? (ঠ)। তোমার আত্মপ্রদর্শনীতে কেন তুমি অন্যদের বিচার কর? তুমি তোমার দম্ভ দ্বারা কি অন্যদের ভালোর দিকে আহ্বান করছ? না; বরং দম্ভ করায় তুমি নিজেই যা তোমার তা হারাবার ঝুকি নিচ্ছ ও অন্যদেরও একই বিপদে চালনা করছ। দম্ভের প্রতি আসক্তি দ্বারা যা ধারণ করা হয়, তা সহজে ধ্বংস হয়ে যায়। হে কুমারী, তুমি প্রকৃত কুমারী হলে তবে মাথা ঢেকে রাখ, কারণ তোমার লজ্জাই করার কথা। তুমি প্রকৃত কুমারী হলে তবে বহু চোখ তোমার দিকে তাকাবে এমনটা সহ্য করো না; তোমার মুখমণ্ডলে কেউই বিস্মিত না হোক; তোমার মিথ্যাচরণ কেউই উপলব্ধি না করুক (ড)। তোমার মাথা ঢেকে রাখলে তবে তুমি যে বিবাহিতা তা ভান করায় ভালই করছ; এমনকি, এমনটা মনে হয় না যে তুমি মিথ্যাচরণ করছ, যেহেতু তুমি খ্রিষ্টের সঙ্গে বিবাহিতা বটে। তাঁরই কাছে তুমি তোমার দেহ সঁপে দিয়েছ, তোমার স্বামীর প্রতি দাবীকৃত আচরণ অনুসারেই আচরণ কর। যখন তিনি অন্যদের বধূদের বেলায় ইচ্ছা করেন তারা মাথা ঢেকে রাখবে, তখন নিজেরটার বেলায় অবশ্যই তেমনটা বেশি ইচ্ছা করেন।

কিন্তু প্রতিটি মানুষ এমনটা মনে করবে না যে, তার পূর্বসূরীদের প্রতিষ্ঠানসমূহ উলট পালট হবার যোগ্য। অনেকে নিজেদের বিচার ও সেটার সংগতি আলাদা রীতি-নীতির হাতে সঁপে দেয়। মাথা ঢেকে রাখা ক্ষেত্রে কুমারীদের বাধ্য করতে নেই, কিন্তু যারা স্বেচ্ছায় তা করে, তা করতে তাদেরও নিষেধ করা উচিত নয়। আর যারা নিজেদের কুমারী বলে অস্বীকার করতে পারে না, তারাও নিজেদের সুখ্যাতি সম্পর্কে এতে খুশি হোক যে ঈশ্বরের কাছে তাদের বিবেক নিরাপদ (ঢ)।

তথাপি যারা বাক্‌বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ, তাদের বিষয়ে আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতা অনুসারে আমি স্থিরতার সঙ্গে বলতে ও সপ্রমাণ করতে পারি যে, যেদিনে তারা

পুরুষদেহের প্রথম চুম্বনে বা হাতের স্পর্শে কেঁপে উঠেছিল, সেদিন থেকে তাদের মাথা ঢেকে রাখতে হবে; কেননা তাদের মধ্যে সবকিছুই ইতিমধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ তথা পরিণতি দ্বারা তাদের বয়স, বয়স দ্বারা তাদের দেহ, সচেতনতা দ্বারা তাদের আত্মা, সেই চুম্বনের অভিজ্ঞতা দ্বারা তাদের শালীনতা, প্রতীক্ষা দ্বারা তাদের প্রত্যাশা, ইচ্ছা দ্বারা তাদের মন। সেই রেবেকার আদর্শই আমাদের জন্য যথেষ্ট হোক যিনি, দূর থেকে বরকে তাঁকে দেখানো হলে তাঁর সঙ্গে বিবাহই যেন করেছেন বলে মাথা ঢেকে নিয়েছিলেন (ণ)।

২৩। হাঁটুপাত সম্পর্কে

হাঁটুপাত ক্ষেত্রেও প্রার্থনা নানা ধরনের নিয়ম-পালন সাপেক্ষ, কেননা কেউ না কেউ রয়েছে যারা সাব্বাৎ দিনে হাঁটুপাত থেকে বিরত থাকে; আর যেহেতু এ মতভেদ মণ্ডলীগুলোর কাছে অধিক নিন্দনীয় ব্যাপার স্বরূপ, সেজন্য প্রভু নিজের অনুগ্রহ প্রদান করবেন, যাতে ওরা হয় নিজেদের অভিমত ছাড়ে, না হয় পরের অসুবিধা না ঘটিয়েই তা পালন করে থাকে। তথাপি আমরা, যেভাবে আমাদের কাছে বিষয়টা সম্প্রদান করা হয়েছে, সেই অনুসারে কেবল প্রভুর পুনরুত্থানের দিনে যে হাঁটুপাত থেকে বিরত থাকব শুধু তা নয়, যেকোন প্রকার উৎকণ্ঠামূলক আচরণ ও কর্ম থেকেও আমাদের বিরত থাকা উচিত; এমনকি আমাদের ব্যবসাও স্থগিত করতে হবে পাছে *দিয়াবলকে সুযোগ দিই* (ক)। তেমনি পঞ্চাশত্তমী কালেও, যে কাল আমরা একই গম্ভীর উল্লাস দ্বারা পৃথক রাখি। কিন্তু এমন কে আছে যে প্রতিদিন ঈশ্বরের সামনে প্রণিপাত করতে দ্বিধা করবে, কমপক্ষে সেই প্রথম প্রার্থনায় যা দ্বারা আমরা দিনের আলোতে প্রবেশ করি? অধিকন্তু, উপোস ও প্রহরার দিনগুলোতে হাঁটুপাত ছাড়া ও বিনম্রতাসূচক বাকি যা চিহ্ন তা ছাড়া কোন প্রার্থনা করা উচিত নয়; কেননা সেকালে আমরা প্রার্থনা করি শুধু নয়, কিন্তু আমাদের প্রভু ঈশ্বরের কাছে মিনতি জানাই ও প্রায়শ্চিত্ত অর্পণ করি। প্রার্থনাকাল সম্পর্কে, সেই *সর্বকালে* ও *সর্বস্থানে* (খ) প্রার্থনা করা ছাড়া আদৌ কিছুই স্থির করা হয়নি।

২৪। প্রার্থনার স্থান সম্পর্কে

কিন্তু, যখন প্রকাশ্যে প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ, তখন কী ভাবে সর্বস্থানে প্রার্থনা করব? 'সর্বস্থানে'(ক) বলতে প্রেরিতদূত সেই সমস্ত স্থান বুঝান যা সুযোগ বা এমনকি প্রয়োজনও সুবিধাজনক করেছে; কেননা প্রেরিতদূতেরা যা করেছিলেন, অর্থাৎ তাঁরা যে কারাগারে *বন্দিদের কর্ণগোচরে প্রার্থনা করছিলেন ও ঈশ্বরের স্তুতিগান করছিলেন* (খ) তা কখনও এমনটা বিবেচিত হয়নি যা সেই বিধির বিপরীত; এবং পল যে জাহাজে সকলের সাক্ষাতে এউখারিস্তিয়া সম্পাদন করেছিলেন (গ), তাও এখনও বিধির বিপরীত আচরণ বলে বিবেচিত হয়নি।

২৫। প্রার্থনাকাল সম্পর্কে

তথাপি, কালের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নির্দিষ্ট কয়েকটা ঘটিকা সংক্রান্ত বাহ্যিক পালন অলাভজনক হবে না; বলতে চাই, সেই সাধারণ ঘটিকাগুলো যা দিনের সময়কাল চিহ্নিত করে, অর্থাৎ সেই সকাল ন'টা, দুপুর বারো'টা ও বিকেল তিনটে যা সম্পর্কে শাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই অন্যান্য ঘটিকার চেয়ে সেগুলোই ছিল সবচেয়ে গাম্ভীর্যমণ্ডিত।

সম্মিলিত শিষ্যদের মধ্যে পবিত্র আত্মা প্রথমবার *সকাল ন'টায়* (ক) সঞ্চারিত হয়েছিলেন। পিতর যেদিন সেই ক্ষুদ্র পাত্রে সার্বিক জনসমাবেশের দর্শন পেয়েছিলেন, সেদিন তিনি প্রার্থনা করার খাতিরে *দুপুর বারোটায়ই* (খ) বাড়ির উচ্চতর অংশে গিয়ে উঠেছিলেন। একই প্রেরিতদূত যোহনের সঙ্গে *বিকেল তিনটায়* (গ) মন্দিরে প্রবেশ করছিলেন; সেসময় তিনি সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত (ঘ) মানুষকে সুস্থতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যদিও এসমস্ত কিছু এমনিই, পালনযোগ্য কোন বিধি-নিয়ম ছাড়াই দাঁড়ায়, তবু নির্দিষ্ট এমন কয়েকটা প্রাথমিক নিয়ম স্থির করা উপকারী হতে পারে যা প্রার্থনা সংক্রান্ত সতর্কবাণীতে কঠোরতা যোগ দিতে পারে ও একটা বিধানই যেন সেই নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনের জন্য ব্যবসা থেকে আমাদের ছিন্ন করে; যাতে করে, আমরা যেমন পড়ি যে দানিয়েলও (ঙ), অবশ্যই ইস্রায়েলের নিয়মবিধি অনুসারে, এসমস্ত পালন করেছিলেন, তেমনি আমরা যেন দিনে কমপক্ষে দু' তিনবারের চেয়ে কম প্রার্থনা না করি, যেহেতু

পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিন ব্যক্তিত্বের প্রতি উপাসনা আমাদের দেয়। অবশ্যই, এসমস্ত কিছু সেই নিয়মিত প্রার্থনার বাড়তি হিসাবে যা আলো ও রাত্রি প্রবেশকালে বিনা সতর্কবাণীতে আমাদের দেয় (চ)।

কিন্তু এটাও সমীচীন যে, প্রার্থনা না করার আগে যেন বিশ্বাসীরা খাদ্য না নেয় ও স্নানাগারে না যায়; কেননা আত্মার সঞ্জীবনী ও পুষ্টিকরণ মাংসের সঞ্জীবনী ও পুষ্টিকরণের আগে পালনীয়, কেননা স্বর্গীয় বিষয়গুগুলো পার্থিব বিষয়গুলোর উপর প্রাধান্য পায়।

২৬। ভাইদের বিদায়কাল সম্পর্কে

যে ভাই তোমার বাড়িতে প্রবেশ করেছে, প্রার্থনা না করে তাকে বিদায় দেবে না। শাস্ত্রে বলে, *তুমি একটা ভাইকে দেখেছ, তুমি তোমার প্রভুকেই দেখেছ* (ক), বিশেষভাবে তখনই যখন সেই ভাই বিদেশী, কেননা সে একটা স্বর্গদূতও হতে পারে। আরও, যখন তুমিই ভাইদের দ্বারা গৃহীত, তখন স্বর্গীয় সঞ্জীবনীর আগে পার্থিব সঞ্জীবনী নেবে না, কেননা তোমার বিশ্বাস সাথে সাথেই বিচারিত হবে (খ)। অন্যথা, কেমন করে আদেশ অনুসারে তুমি *এই গৃহে শান্তি বিরাজ করুক* (গ) বলবে যদি না তাদের সঙ্গে পরস্পর শান্তি বিনিময় কর যারা সেই গৃহে রয়েছে?

২৭। একটা সামসঙ্গীত যোগ করা সম্পর্কে

যারা প্রার্থনা ক্ষেত্রে অধিক অধ্যবসায়ী, তারা সাধারণত প্রার্থনাগুলোতে ‘আল্লেলুইয়া’ ও সেই ধরনের সামগীতি (ক) যোগ করে, যার শেষাংশে উপস্থিত সবাই নানা ধুয়ো উচ্চারণ করে উত্তর দেয়। এবং যেকোন কর্মক্রিয়া ঈশ্বরের গৌরবার্থে ও তাঁর সম্মানার্থে তাঁর কাছে উত্তম বলি হিসাবে নধর প্রার্থনাকেই নিবেদন করে, তেমন কর্মক্রিয়াও উৎকৃষ্ঠ।

২৮। আধ্যাত্মিক বলি হিসাবে প্রার্থনা

কেননা এটাই [তথা প্রার্থনাই] সেই আধ্যাত্মিক বলি যা প্রাচীন যত বলিদান বাতিল করে দিয়েছে। ঈশ্বর বলেছিলেন, *তোমাদের অসংখ্য যজ্ঞবলিতে আমার কী? ভেড়ার আহুতির প্রতি আমার আর রুচি নেই, এবং বাছুরের চর্বি ও বৃষ ও ছাগের রক্তে আমি প্রীত নই! তোমাদের হাত থেকে কেইবা তেমন দাবি রেখেছে?* (ক)। তবে ঈশ্বর যা দাবি করেন, তা সুসমাচার শেখায়; তিনি বলেন, *এমন ক্ষণ আসছে, যখন প্রকৃত উপাসকেরা আত্মা ও সত্যের শরণেই পিতাকে উপাসনা করবে; কেননা ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ; তাই পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন* (খ)।

আমরাই তো সেই প্রকৃত উপাসক ও প্রকৃত যাজক, যারা আত্মার শরণে প্রার্থনা ক'রে আত্মার শরণে প্রার্থনা-বলি উৎসর্গ করি—এমন বলি যা ঈশ্বরের কাছে উপযুক্ত ও গ্রহণীয়, সেই যে বলি তিনি দাবি করেছিলেন ও নিজেই ব্যবস্থা করলেন।

এই বলি, যা সমস্ত হৃদয় দিয়ে নিবেদিত, বিশ্বাসে পুষ্ট, সত্যে সংরক্ষিত, নিষ্কলঙ্কতায় ত্রুটিহীন, শুচিতায় নির্মল, ভ্রাতৃপ্রেমে মাল্যভূষিত, সৎকর্মের শোভাযাত্রায় সামসঙ্গীত ও বন্দনাগানের মধ্যে ঈশ্বরের বেদিপ্রান্তে আমাদের উপনীত করা প্রয়োজন; এই বলিই ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের জন্য সবকিছু অর্জন করবে (গ)।

২৯। প্রার্থনার প্রভাব

কেননা যিনি সেই প্রার্থনা দাবি করেন, সেই ঈশ্বর আত্মা ও সত্য থেকে উৎসারিত এমন প্রার্থনার কাছে কীবা দিতে অস্বীকার করবেন? তেমন প্রার্থনার কার্যকারিতা বিষয়ে আমরা কতগুলোই না সাক্ষ্যবাণী পড়ি, শুনি ও বিশ্বাস করি! প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন প্রার্থনা আগুন, পশু ও অনাহার থেকে মুক্তি দিত (ক), অথচ খ্রিষ্ট থেকে নিজের প্রাণশক্তি তখনও পায়নি। সেটার চেয়ে খ্রিষ্টীয় প্রার্থনার কর্মক্ষেত্র কতই না উদার! এ প্রার্থনা *আগুনের মাঝে* শিশিরদানকারী সেই দূতকে দাঁড় করায় না, *সিংহের মুখও* বন্ধ করে না, ক্ষুধার্তের কাছেও সামান্যতম মধ্যাহ্ন খাবার পৌঁছিয়ে দেয় না (খ), নিজের হয়ে কোন অনুগ্রহ দ্বারাও দুঃখযন্ত্রণার কোন অনুভূতি দূরে রাখে না, কিন্তু যন্ত্রণাভুক্ত, দুঃখার্ত ও শোকার্তকে সে সহিষ্ণুতায় দীক্ষিত করে, সাহস দানে অনুগ্রহ প্রসারিত করে, যাতে করে ঈশ্বরের নামের

খাতিরে যা বিষয়ে যন্ত্রণাভোগ করছে তা বুঝে, বিশ্বাস জানতে পারে ঈশ্বরের কাছ থেকে সে কী প্রতিদান পেতে যাচ্ছে।

কিন্তু প্রাচীনকালে প্রার্থনা আঘাত হানত, শত্রুসেনাকে ছত্রভঙ্গ করত, জলবর্ষণের উপকারিতা রোধ করত (গ)। এবার কিন্তু ধর্মময়তা-প্রার্থনা ঈশ্বরের সমস্ত ক্রোধ দূর করে দেয়, শত্রুদের পক্ষে রাত্রিজাগরণ করে, *নির্যাতকের জন্য মিনতি জানায়* (ঘ)। যে প্রার্থনা স্বর্গীয় আগুনও যোগাতে পেরেছিল, সেই প্রার্থনা যে স্বর্গীয় জল আদায় করতে পারে, এতে বিস্ময়কর কী আছে? কেবল প্রার্থনাই সেই বস্তু যা ঈশ্বরকে পরাভূত করে; কিন্তু খ্রিষ্ট এমনটা চাইলেন না যে, সেটা অমঙ্গলের লক্ষ্যে ব্যবহৃত হবে, বরং মঙ্গলের লক্ষ্যেই তিনি প্রার্থনাকে সমস্ত শক্তিতে ভূষিত করলেন। এজন্য এ প্রার্থনা শুধু এ কাজই করতে জানে, তথা পরলোকগতদের আত্মাকে মৃত্যুপথ থেকে ফিরিয়ে ডাকা, দুর্বলকে সুস্থির করা, অসুস্থকে সারিয়ে তোলা, অপদূতগ্রস্তকে মুক্ত করা, কারাগারের দরজা খুলে দেওয়া, নিরপরাধীর শেকল উন্মোচিত করা। তাছাড়া সে অপরাধ মুছিয়ে দেয়, প্রলোভন দূর করে দেয়, নির্যাতন শেষ করে দেয়, ভগ্নপ্রাণকে সান্ত্বনা দান করে, উদারমনাকে প্রেরণা দান করে, যাত্রীকে চালিত করে, তরঙ্গমালা প্রশমিত করে, দস্যুকে বিহ্বল করে, গরিবের জন্য খাদ্য যোগায়, ধনীকে চালনা করে, পতিতকে পায়ে দাঁড় করায়, পতনোন্মুখকে সুস্থির করে তোলে, দণ্ডায়মানকে দৃঢ়তা দান করে। প্রার্থনা হলো বিশ্বাসের প্রাচীর: সবদিক থেকে আমাদের লক্ষ করে যে শত্রু, তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ও তীর স্বরূপ।

অতএব, আমরা যেন কখনও নিরস্ত্র অবস্থায় না চলি। এসো, দিনমানে প্রহরা, রাত্রিবেলায় জাগরণীর কথা স্মরণ করি। এসো, প্রার্থনার অস্ত্রাদি দ্বারা আমাদের সেনাপতির নিশান রক্ষা করি, প্রার্থনারত অবস্থায় স্বর্গদূতের সেনাদলের প্রতীক্ষায় থাকি। সকল স্বর্গদূতও প্রার্থনা করেন, প্রতিটি সৃষ্টজীব প্রার্থনা করে; হাঁটুপাত করে মেষ ও বন্য পশু প্রার্থনা করে, এবং ঘেরি ও আস্তানা থেকে বের হতে হতে নিষ্ক্রিয় নয় এমন মুখে নিজ নিজ কায়দা অনুসারে শ্বাস স্পন্দিত করতে করতে স্বর্গের দিকে তাকায়। এমনকি পাখিরাও ভোরে জেগে উঠে স্বর্গের দিকে উড়তে থাকে, ক্রুশের আকারে হাতের বদলে ডানা প্রসারিত করে, ও এমন কিছু বলে যা মনে হয় ঠিক প্রার্থনাই যেন। তবে প্রার্থনা

সংক্রান্ত কর্তব্য প্রসঙ্গে এর চেয়ে বলার আর কিবা রয়েছে? হ্যাঁ, সেই প্রভু নিজেও প্রার্থনা করলেন, যাঁর সম্মান ও পরাক্রম নিবেদিত হোক যুগযুগ ধরে।

---

১ (ক) তের্তুল্লিয়ানুস খ্রিষ্টকে 'ঈশ্বরের আত্মা, ঈশ্বরের বাণী ও ঈশ্বরের যুক্তি' বলে চিহ্নিত করেন।

১। যখন তিনি খ্রিষ্টকে 'ঈশ্বরের আত্মা' বলে অভিহিত করেন, তখন এর মানে এ নয় যে তিনি ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে পবিত্র আত্মার কথা জানতেন না।

২। তিনি খ্রিষ্টকে 'ঈশ্বরের বাণী ও ঈশ্বরের যুক্তি' বলেও অভিহিত করেন, কেননা তিনি জানতেন যে, 'λόγος' (লোগোস) গ্রীক শব্দটা (যোহন ১:১) শুধু একটামাত্র শব্দে অনুবাদ করা যায় না যেহেতু সেই গ্রীক শব্দ 'বাণী' শুধু নয়, সেইসঙ্গে 'যুক্তি'ও বোঝায়। এমনকি, পদের পরবর্তী অংশে তিনি এধারণার উপর জোর দেবার জন্য বলে চলেন, খ্রিষ্ট 'নিজেই যুক্তির বাণী, বাণীর যুক্তি ও উভয়েরই আত্মা।'

(খ) মথি ৯:১৬-১৭ দ্রঃ।

(গ) যোহন ৩:৩০।

(ঘ) যোহন ৩:৩১-৩২ দ্রঃ।

(ঙ) মথি ৬:৬; ৭:৭; মার্ক ১১:২২; লুক ২১:২২ দ্রঃ।

(চ) মথি ৬:৭ দ্রঃ।

২ (ক) যোহন ১:১২ দ্রঃ।

(খ) মথি ২৩:৯ দ্রঃ।

(গ) ইশা ১:২ দ্রঃ।

(ঘ) যোহন ১০:৩০ দ্রঃ।

(ঙ) 'আমাদের মাতা সেই মণ্ডলীও বাদ পড়ে না' : মণ্ডলী যে আমাদের মাতা (গা ৪:২৬ দ্রঃ), সেবিষয়ে খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বে সম্ভবত এটাই সর্বপ্রথম উল্লেখ। সকলের স্বীকৃতি, এটা তের্তুল্লিয়ানুসের আশ্চর্যজনক ও অপ্রত্যাশিত ব্যাখ্যা।

(চ) 'তাঁর আপনজন' : পুত্র ও মণ্ডলী হলেন পিতার সেই আপনজন।

৩ (ক) যাত্রা ৩:১৩-১৬ অনুসারে, মোশির প্রশ্নে ঈশ্বর বলেছিলেন, 'আমি সেই আছি যিনি আছেন।' নামটা 'পিতা' থেকে ভিন্ন নাম, সেই যে নাম শুধু প্রভু যিশুর দ্বারা জানা হল। ইস্রায়েলীয়রা যে ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকত তা অনস্বীকার্য, কিন্তু তের্তুল্লিয়ানুস বলতে চান, যিশুর আগমনের আগে ঈশ্বর নিজের মুখে কাউকে নিজের 'পিতা' নামটা প্রকাশ করেননি।

(খ) মথি ১১:২৭ দ্রঃ।

(গ) যোহন ৫:৪৩।

(ঘ) যোহন ১২:২৮।

(ঙ) যোহন ১৭:৬।

(চ) তের্তুল্লিয়ানুস বলতে চান, 'তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক' উক্তি উচ্চারণে যেহেতু আমরা ঈশ্বরের সমস্ত উপকারের খাতিরে তাঁকে 'ধন্য' বলি, সেজন্য উক্তিটা 'ধন্য'-স্তুতিবাদেও পরিণত হয়।

(ছ) ইশা ৬:৩; প্রকাশ ৪:৮ দ্রঃ।

(জ) আমরা যখন 'দূত-অবস্থার জন্য নিরূপিত', তখন যেন স্বর্গদূতদের অনুকরণে এপৃথিবীতে থাকতেই ঈশ্বরের উপাসনা করি ও সেইসঙ্গে তাঁর ইচ্ছা পালন করি। যেমন, উদাহরণযোগে, সাম ১০৩:২৩-২৪ স্বগদূতদের বিষয়ে বল, 'মহাশক্তিধর যারা, তাঁর বাণীর স্বর শোনামাত্র **তাঁর আদেশ মেনে চল যারা**, তাঁর সেই সকল দূত, প্রভুকে বল ধন্য; তাঁর সেবাকর্মী যারা, **তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ কর যারা**, তাঁর সেই সকল বাহিনী, প্রভুকে বল ধন্য')।

(ঝ) ইশা ৩০:১৮ দ্রঃ।

(ঞ) ১ তি ২:১ দ্রঃ।

৪ (ক) মথি ৬:১০-এ আমরা পাই 'তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক', কিন্তু তের্তুল্লিয়ানুস 'তোমার ইচ্ছা স্বর্গে ও মর্তে পূর্ণ হোক, তোমার রাজ্য আসুক' উপস্থাপন করেন; তিনি সম্ভবত লুক ১১:২ পালন করছিলেন তথা, 'তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক, তোমার রাজ্য আসুক।'
আরও, 'তোমার ইচ্ছা স্বর্গে ও মর্তে পূর্ণ হোক' উক্তিটা আজকালে প্রচলিত 'তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক' উক্তি থেকে ভিন্ন। তের্তুল্লিয়ানুসের প্রায় সমসাময়িক সাধু চিপ্রিয়ানুসও নিজের 'প্রভুর প্রার্থনা' লেখায় সংক্ষিপ্ত বচনটা উপস্থাপন করেন। এবিষয়ে তের্তুল্লিয়ানুসের প্রায় দু'শ বছর পরে সাধু আগস্তিন বলেন যে, তাঁর অঞ্চলেও 'তোমার ইচ্ছা স্বর্গে ও মর্তে পূর্ণ হোক' বচনটি খুব প্রচলিত ছিল। তার মানে, সেকালে উক্তি দু'টোই প্রচলিত ছিল।

(খ) যোহন ৪:৩৪; ৫:৩০ দ্রঃ।

(গ) যোহন ৬:৩৮ দ্রঃ।

(ঘ) লুক ২২:৪২ দ্রঃ।

(ঙ) পরবর্তী গ্রীক ও লাতিন ব্যাখ্যাতারাও পুত্রকে পিতার ইচ্ছা ও প্রতাপ বলে অভিহিত করবেন।

৫ (ক) প্রবচন ২১:১ দ্রঃ।

(খ) প্রকাশ ৬:৯-১০ দ্রঃ।

৬ (ক) মথি ৬:৩৩ দ্রঃ।

(খ) মথি ৬:১১ দ্রঃ।

(গ) যোহন ৬:৩৫ দ্রঃ।

(ঘ) যোহন ৬:৩৩ দ্রঃ।

(ঙ) মথি ২৬:২৬ দ্রঃ।

(চ) মথি ৬:৩২ দ্রঃ।

(ছ) মথি ১৫:২৬ দ্রঃ।

(জ) মথি ৭:৯ দ্রঃ।

(ঝ) লুক ১১:৫-৯।

(ঞ) মথি ৬:৩৪ দ্রঃ।

(ট) লুক ১২:১৬-২০।

৭ (ক) অর্থাৎ, আমাদের কী লাভ যদি আমাদের শুধু মোটা-সোটা করার জন্যই খাদ্য দেওয়া হয়?

(খ) মথি ৬:১২ দ্রঃ।

(গ) 'এক্সোমলোগেসিস' সম্পর্কে উপরে 'অনুতাপ প্রসঙ্গ' ৯ অধ্যায় দ্রঃ।

(ঘ) মথি ১৮:২৩-৩৫ দ্রঃ।

(ঙ) লুক ৬:৩৭।

(চ) মথি ১৮:২২।

(ছ) আদি ৪:২৪।

৮ (ক) দ্বিঃবিঃ ১৩:৭-১২; মথি ১০:৩৭; লুক ১৪:২৬ দ্রঃ।

(খ) মথি ২৬:৪১ দ্রঃ।

১০ (ক) লুক ১১:৯।

(খ) এক কথায়, প্রভুর প্রার্থনা সবসময় প্রাধান্য পাবে; সেটার পরে আমাদের নিজস্ব আবেদনও নিবেদন করা যাবে, এমন আবেদন যা প্রভুর মন অনুযায়ী আবেদন।

১১ (ক) মথি ৫:২২-২৩ দ্রঃ।

(খ) আদি ৪৫:২৪ দ্রঃ।

(গ) প্রেরিত ৯:২ দ্রঃ।

(ঘ) মথি ৫:২১-২২ দ্রঃ।

(ঙ) এফে ৪:২৬ দ্রঃ।

১২ (ক) এফে ৪:৩০ দ্রঃ।

১৩ (ক) ১ তি ২:৮ দ্রঃ।

(খ) মথি ২৭:২৪ দ্রঃ।

১৪ (ক) ইহুদীরা 'হাত দু'টো উত্তোলন করতেও সাহস পায় না', তের্তুল্লিয়ানুস কোন্ ভিত্তিতে তা বলেন আমরা জানি না। বাস্তবিকই ইহুদী ঐতিহ্য অনুসারে, (১) হাত উত্তোলন করে প্রার্থী ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করে; (২) হাত উত্তোলন করায় প্রার্থী নিজের আত্মোৎসর্গ বোঝায় (সাম ১৪১:২ দ্রঃ); (৩) পরের হয়ে প্রার্থনা করে প্রার্থী হাত তুলে রেখে স্বর্গে আসীন ঈশ্বরকেই ধরতে চায়, এবং প্রার্থনা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে আঁকড়ে ধরে থাকে, যেইভাবে মোশি করেছিলেন (যাত্রা ১৭:১১-১২ দ্রঃ)।

(খ) ইশা ২:১৫ দ্রঃ।

(গ) 'আমরা হাত উত্তোলন করি তা শুধু নয়, প্রসারিতও করি।' তাই আমরা উপরের টীকায় (১৪ ক) একথাও যোগ দিতে পারি যে, হাত উত্তোলিত ও প্রসারিত করাটা খ্রিষ্টিয়ানদের প্রার্থনাকে বিশিষ্টতম এক চিহ্নে চিহ্নিত করে, কেননা, তের্তুল্লিয়ানুসের ব্যাখ্যা অনুসারে, এভাবে 'আমরা প্রভুর যন্ত্রণাভোগ অনুকরণ করে প্রার্থনাকালেও খ্রিষ্টকে স্বীকার করি।' তাছাড়া তিনি ২৯ অধ্যায়ে বলেন, পাখিরাও 'ক্রুশের আকারে হাতের বদলে ডানা প্রসারিত করে।' তাই ক্রুশের আকারে হাত উত্তোলিত ও প্রসারিত করে আমরা ক্রুশবিদ্ধ প্রভুর অনুকরণ করি, নিজেরাই জীবন্ত ক্রুশের চিহ্ন রূপে দাঁড়াই।

১৫ (ক) ১ তি ৪:১৩ দ্রঃ।

(খ) দা ৩:২১ দ্রঃ।

১৬ (ক) হের্মাস ছিলেন সেই পিউসের ভাই যিনি আনুমানিক ১৪০ থেকে ১৫৫ পর্যন্ত রোমের বিশপ ছিলেন। হের্মাস গ্রীক ভাষায় একটা পুস্তক লিখেছিলেন যার নাম 'পালক' (যা প্রৈরিতিক পিতৃগণ-এ অন্তর্ভুক্ত)। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে পুস্তকটা এত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল

যে, কোন না কোন মণ্ডলীর কাছে বাইবেলের কানুন অনুযায়ী পুস্তক অর্থাৎ প্রামাণিক পুস্তক বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় শতাব্দীতে পুস্তকটা অপ্রামাণিক বলে স্বীকৃত হয়েছিল।

(খ) হের্মাস ২৫:১।

(গ) হের্মাস ২৫:১।

(ঘ) তোবিত ১২:১২; প্রকাশ ৮:৩-৪।

১৭ (ক) লুক ১৮:৯-১৪।

(খ) 'ঈশ্বর কণ্ঠের নয়, হৃদয়েরই শ্রোতা', এই সুন্দর উক্তি সাধু চিপ্রিয়ানুস লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা'-তেও (৪ অধ্যায়) উল্লিখিত।

(গ) (প্রাচীন গ্রীক লেখক) হেরদোতস ১:৪৭ দ্রঃ।

(ঘ) পারস্যদের প্রভাব অধিক বৃদ্ধিশীল ছিল বিধায় লিদিয়ার রাজা ক্রেসোস নানা দৈববক্তাদের কাছে দৈববাণী অনুসন্ধান করেছিলেন। প্রাচীন লেখক হেরদোতস নিজের লেখায় (১:৪৭ দ্রঃ) বর্ণনা করেন, দেল্ফি শহরের মন্দিরের আপল্লোস দেবের পিথিয়া নামক মহাযাজিকা ৫ পংক্তি বিশিষ্ট দৈববাণী উচ্চারণ করেছিল। তের্তুল্লিয়ানুসের উদ্ধৃত বাক্যটা তথা 'আমি বোবাকে বুঝি ও বাক্‌শক্তিবিহীনকে স্পষ্টই শুনতে পাই' সেই দৈববাণীর তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তি উল্লেখ করে।

(ঙ) যোনা ২:১১ দ্রঃ।

১৮ (ক) তের্তুল্লিয়ানুস বলতে চান, আমাদের উপবাসের সময়ে শান্তি-চুম্বন আমাদের ভাইবোনদের এমন আশীর্বাদ দান করে যা তাদের ও আমাদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে। যাই হোক, পাঠ্য অস্পষ্ট।

(খ) এমনটা ধরে নিতে হবে, আগেকার প্রশ্ন দু'টোতে কে যেন একজন আপত্তিকর উত্তর দিল; তেমন উত্তরেই তের্তুল্লিয়ানুস প্রতিবাদ করে বলছেন, 'আমাদের প্রার্থনা যাই হোক না কেন, ইত্যাদি।'

(গ) মথি ৬:১৬-১৮।

১৯ (ক) 'প্রহরা' এমন শব্দ যা সেকালের সামরিক ভাষা থেকে আগত; বস্তুত তের্তুল্লিয়ানুস নিজে স্বীকার করেন, খ্রিষ্টিয়ানেরা এমন সৈন্য যারা নিজ নিজ প্রহরা-স্থানে নিযুক্ত। প্রহরা-দিবস বুধবার ও শুক্রবার, ও সেই দিনগুলোতে গোটা দিন বা অর্ধেক দিন ধরে উপবাস পালন করা হত। উপবাস বেলা তিনটায় শেষ হত। প্রহরা-প্রথা প্রথম বারের মত হের্মাসের পালক নামক পুস্তকে উল্লিখিত (পালক ৫৪:১ দ্রঃ - যা প্রেরিতিক পিতৃগণ-এ অন্তর্ভুক্ত লেখা)।

(খ) 'যজ্ঞীয় প্রার্থনা': এখানে তের্তুল্লিয়ানুস উপবাস ও এউখারিস্তিয়ার দিকে অঙুলি নির্দেশ করছেন; খোদ প্রার্থনাই যজ্ঞ বলে পরিগণিত ছিল।

(গ) অর্থাৎ, প্রতিটি 'প্রহরা' এউখারিস্তিয়া-অনুষ্ঠান দ্বারা শেষ হত।

(ঘ) অর্থাৎ, সেই 'সহভাগিতা-ভোজনপাট' (বা কমুনিয়ন-টেবিল) যার উপরে এউখারিস্তিয়ার উপাদানসমূহ রাখা রয়েছে। সেসময় গির্জাঘরে পাথর-নির্মিত কোন বেদি ছিল না।

(ঙ) 'প্রভুর দেহ সংরক্ষিত' ; এ একটা প্রমাণ যে সেসময়ও পবিত্রিত রুটি সংরক্ষাণ করা হত।

২০ (ক) ১ করি ৯:৫; ১ তি ২:৯ দ্রঃ।

(খ) ১ পিতর ৩:১-৬।

২১ (ক) ১ করি ১১:৫।

২২ (ক) আদি ২:২২, ২৩ দ্রঃ।

(খ) ১ করি ১১:৫ দ্রঃ।

(গ) ১ করি ৭:১, ৪ দ্রঃ।

(ঘ) ১ করি ৭:২৫ ... দ্রঃ।

(ঙ) ১ করি ১১:৫।

(চ) ১ করি ১১:৪।

(ছ) ১ করি ১১:১০ দ্রঃ।

(জ) আদি ৬:২ দ্রঃ।

(ঝ) আদি ৬:২। গ্রীক ও প্রাচীন লাতিন (ফলে তের্তুল্লিয়ানুসেরও) পাঠ্যে পদটা এরূপ: 'ঈশ্বরের দূতেরা দেখলেন, মানব-কন্যারা সুন্দরী ছিল', ইত্যাদি। এই অনুবাদের ভিত্তিতে সেসময়ে এই ধারণা প্রচলিত হতে লাগল যে, এমন দূত ছিল যারা কামলালসা দ্বারা প্রভাবান্বিত ও তেমন কামলালসা দ্বারা নারীদেরও প্রভাবান্বিত করতে পারত। সেই আদিকালের মিলনের ফলেই দৈত্যদের আবির্ভাব হয়েছিল। তাছাড়া এধারণাও প্রচলিত ছিল যে, অপদূত ও মন্দাত্মাগুলোও সেইভাবে আবির্ভূত হয়েছিল।

(ঞ) আদি ৬:৫ দ্রঃ।

(ট) ১ করি ১১:১৪।

(ঠ) ১ করি ৪:৭।

(ড) 'মিথ্যাচরণ' এই অর্থে যে, তারা অবিবাহিতা হলেও লোকে তাদের ঢকে রাখা মাথা দেখে মনে করে, তারা বিবাহিতা।

(ঢ) পুরো বাক্যটা অস্পষ্ট।

(ণ) আদি ২৪:৬৪-৬৫।

২৩ (ক) এফে ৪:২৭ দ্রঃ।

(খ) ১ তি ২:৮।

২৪ (ক) ১ তি ২:৮

(খ) প্রেরিত ১৬:২৫ দ্রঃ।

(গ) প্রেরিত ২৭:৩৫ দ্রঃ।

২৫ (ক) প্রেরিত ২:১৫ দ্রঃ।

(খ) প্রেরিত ১০:৯ দ্রঃ।

(গ) প্রেরিত ৩:১ দ্রঃ।

(ঘ) 'পক্ষাঘাতগ্রস্ত': প্রেরিত ৩:২ অনুসারে লোকটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত নয়, 'মাতৃগর্ভ থেকে খোঁড়া'-ই ছিল।

(ঙ) দা ৬:১০ দ্রঃ।

(চ) অর্থাৎ, সকাল ও সন্ধ্যার প্রার্থনা সবসময়ই আবশ্যপালনীয়, কিন্তু সকাল ন'টা, দুপুর বারো'টা ও বিকেল তিনটের প্রার্থনা স্বেচ্ছাক্রিয়।

২৬ (ক) 'তুমি একটা ভাইকে দেখেছ, তুমি তোমার প্রভুকেই দেখেছ' বাক্যটা অপ্রামাণিক কোন একটা লেখা থেকে উদ্ধৃত; কিন্তু মনে হচ্ছে তের্তুল্লিয়ানুস বাক্যটা পবিত্র শাস্ত্রের অনুপ্রাণিত বাক্য বলে গণ্য করছেন। অথচ বাক্যটা যে কোথা থেকে আসে, তা বলা সম্ভব নয়। তের্তুল্লিয়ানুসের সমকালীন আলেক্সান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্টও বাক্যটা উল্লেখ করেন। সম্ভবত বাক্যটা 'আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ' (মথি ২৫:৪০) এর ব্যাখ্যামূলক বাক্য।

(খ) হিব্রু ১৩:২ দ্রঃ।

(গ) লুক ১০:৫ দ্রঃ।

২৭ (ক) সম্ভবত প্রকাশ ১৯:১ ইত্যাদি ধরনের জয়ধ্বনি নির্দেশিত।

২৮ (ক) ইশা ১:১১,১২ দ্রঃ।

(খ) যোহন ৪:২৩, ২৪ দ্রঃ।

(গ) লক্ষণীয় বিষয় যে, আধ্যাত্মিক বলির গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে তের্তুল্লিয়ানুস সেই একই গুণাবলি উল্লেখ করেন যা ষাঁড়, ভেড়া ইত্যাদি বলিকে চিহ্নিত করত।

২৯ (ক) দা ৩:৯২,৯৩; ৬:২২, ২৩; ১৪:৩৭; ১ রাজা ১৭:১৫ দ্রঃ।

(খ) দা ৩:৯২; হিব্রু ১১:৩৩; ২ রাজা ৪:৪২-৪৪ দ্রঃ।

(গ) যাত্রা ৭; ১৭:১৩; দ্বিঃবিঃ ১১:১৭ দ্রঃ।

(ঘ) মথি ৫:৪৪ দ্রঃ।